আশা-চপলা।

নবীন নবন্যাস।

প্রথম খণ্ড।

এ সংসারে আশাপারে কে যাইতে পারে ?
যে পারে সে ভালবাসে আশা-চপলারে ॥

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

Calcutta:
PRINTED BY D. C. DASS AND COMPANY,
"CORINTHIAN" PRESS, 33, NEW CHINA BAZAR.
PUBLISHED BY
WOOMA CHURN DASS.

1884.

মূল্য চারি আনা। Price 4 Annas.

আশা-চপলা।

উপক্রম।

আশার পারে কে কবে যেতে পেরেছে? ত্রিভুবনমধ্যে কেহই না। ছোট কথায় বোল্‌তে গেলে অনেক হয়ে পড়ে; সুতরাং স্থূল স্থূল কথায় উদাহরণ দিবার প্রয়াস পেতে হোচ্ছে। পাঠক মহাশয় স্মরণ করুন, বহুকোটীশ্বর পৃথিবীতে সম্রাট হবার ইচ্ছা করেন; সম্রাট আবার ইন্দ্রত্ব লাভের আশা রাখেন; ইন্দ্র ব্রহ্মপদ বাঞ্ছা করেন; ব্রহ্মা শিবপদ প্রাপ্তির অভিলাষী; শিব আবার হরিপদ লাভ কর্‌বার আশা করেন। এইরূপে আশার পারে কেহই যেতে পারেন না। এই জন্যই লোকে কুহকিনী আশাকে বৈতরণী নদী বলে।

মানুষ আশার দাস। জগতের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেরই আশা আছে। মানুষজাতি শ্রেষ্ঠ বোলেই আগে মানুষকে আসরে নামান গেল। কার কিসে আশা, সেগুলির উদাহরণে পরিচয়।

আশা-চপলা।

প্রথম প্রবাহ।

মানুষ।

"সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।"

পঞ্চতন্ত্র।

মানুষ জগদীশ্বরের শেষ সৃষ্টি। ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হয়েও আপন কার্য্য-কারণাত্মিকা গুণময়ী মায়ায় এই চরাচর বিশ্বসংসার সৃজন করেছেন। আর্য্য-জাতির পুরাণে প্রথম নরসৃষ্টি মনু। সেই মনু থেকে মানব, মনুষ্য অথবা মানুষ। মুসলমানদিগের আদিপুরুষ সৃষ্টি আদম। আদমের বংশধরেরা আদমী। খৃষ্টানদের আদিপুরুষও আদম অথবা অ্যাডাম। ইহা হইতেই মানুষ। ইহার ইংরাজী কথা "ম্যান"। হিন্দু ও মুসলমানের বাক্যের ব্যুৎপত্তি যথার্থ ধাতুগত। কিন্তু খৃষ্টানদিগের আডাম হতে ম্যান, এ কথার ধাতু খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ মানবদেহ পঞ্চভূতে গঠিত। মানুষ আকারে একরূপ হইলেও দেখিতে নানা প্রকার। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক, বক্ষ, উদর প্রভৃতি সমরূপ। (বিকলাঙ্গের কথা ধর্ত্তব্য নহে) কিন্তু আকারগত ও বর্ণগত অনেক তারতম্য লক্ষিত হয়। পৃথিবীতে ন্যূনাধিক এক শত বিংশতি কোটি নরনারীর বাস। ইহার মধ্যে এসিয়া খণ্ডে অন্যূন ৭০ কোটি; অবশিষ্ট ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও সামু-

ফ্রিকা খণ্ডে প্রায় ৫০ কোটি। এসিয়াবাসিগণের মধ্যে ভারতে অন্যূন পঞ্চ-বিংশতি কোটি। সকল স্থানের মানুষ একরূপ হওয়া দূরে থাকুক, একাবয়বের দুই জন মানুষ প্রায়ই ধরাধামে নয়নগোচর হয় না। এই ব্যতিক্রম ব্যতীত খর্ব্বাকার ও দীর্ঘাকার অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণের লিখন প্রমাণে সত্যযুগের মানুষ একবিংশতি হস্ত পরিমিত; ত্রেতাযুগের, মানুষ চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত; দ্বাপর যুগের মানুষ সপ্ত হস্ত পরিমিত ছিল। বর্ত্তমান কলিযুগের মানুষ সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত। আকারগত এইরূপ ইতরবিশেষ বিদ্যমান। তদ্ব্যতীত কেহ গৌরবর্ণ, কেহ পিঙ্গলবর্ণ, কেহ শ্বেতবর্ণ, কেহ শ্যামবর্ণ, কেহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কেহ বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

এই ত মানুষের গঠন প্রকৃতি। তাহাদের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। যে চিত্রখানি প্রদর্শিত হইল, সেখানি মানুষের। সকল মানুষই যে এক রকম, তাহা হইতে পারে না। সকল মানুষের কার্য্যই যে, এক প্রকার, তাহাও কখনও হইতে পারে না। কতক মানুষ সংসারাশ্রমী; কতক মানুষ বনবাসী; কতক মানুষ তীর্থাশ্রমী; কতক মানুষ জটাধারী; কতক মানুষ বানপ্রস্থ; কতক মানুষ যতি; কতক মানুষ ব্রহ্মচারী; কতক মানুষ আর কিছু।

মানুষ নানা বেশে নানা কার্য্যে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। সকল মানুষেরই হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে। জনকতক লোক নাস্তিক। ডাকের কথা আছে, মানুষকে চিনিতে পারা যায় না। লোকপরম্পরায় একটী প্রবাদ আছে, "যার মাথায় কাল চুল, তাকে চেনা ভার।"

দ্বিতীয় প্রবাহ।

বড়মানুষ।

"বসামি পদ্মোৎপল শঙ্খমধ্যে,
বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ।
নারায়ণে চৈব বসৌ ধরায়াং,
বসামি নিত্যোৎসব-মন্দিরেষু॥"

লক্ষ্মীচরিত্র।

জগতে ছোট বড় অনেক রকম মানুষ আছে। ইহার মধ্যে বড় মানুষের মান অধিক। বড় মানুষ কি? মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ কেহ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, বড় মানুষ স্বর্গীয় পদার্থ। ইহারা সৎকার্য্য করেন, পরোপকার করেন, পূজাপার্ব্বণে নাচতামাসা দেন, পুষ্করিণী কাটিয়া দেন, দুঃখী লোককে অন্নবস্ত্র দান করেন, কত কি ভাল ভাল কাজে মাথা দেন, সুতরাং তাহারাই বড় মানুষ, সুতরাং তাঁহারাই স্বর্গীয় পদার্থ। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। বড় মানুষের কথাটী ছোট মানুষকে একটু ব্যবস্থা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। বড় মানে বৃহৎ; বৃহৎ মানে প্রকাণ্ড; প্রকাণ্ড মানে বিরাট; ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হিসাবে বড় মানুষ শব্দে বৃহৎ মানুষ, প্রকাণ্ড মানুষ, অথবা বিরাট মানুষ বুঝিতে হইবে না। কিম্বা তালগাছ বা শালগাছের ন্যায় উচ্চ মানুষ অনুমান করিতে হইবে না। বড় মানুষ আমাদেরই মত সাড়ে তিন হাত উচ্চ।

বড় লোক এবং বড় মানুষে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। ঐহিক অথবা পারমার্থিক যে কোন বিষয়ে অকপটে নিরত থাকিয়া সমাজমধ্যে প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম লাভ করিতে পারিলে বড় লোক হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বড় মানুষ হইতে পারা যায় না। বড় মানুষের একটা এক চেটে খেতাব আছে। টাকা না থাকিলে সে খেতাবের অধিকারী হইবার উপায় নাই। ধার্ম্মিক লোককে লোকে বড় লোক বলিতে পারে; কিন্তু কদাচ তাঁহাকে

বড় মানুষ বলিবে না। বস্তুতঃ সংসারক্ষেত্রে সংসার-নীতিশাস্ত্রানুসারে তিনি বড়মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কেবল ধার্ম্মিকের উদাহরণ প্রদর্শন করা গেল; দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রভৃতি অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর লোকেও চলিত কথায় বড় লোক; বড় মানুষ নামের অযোগ্য।

বড় মানুষ লক্ষ্মীর দাস। বড় মানুষ দেশের অলঙ্কার। দেশে বড় মানুষ না থাকিলে পুকুর হয় না, পাতকূয়া হয় না, রাস্তা হয় না, দেবালয় হয় না, সদাব্রত হয় না, অতিথিশালা হয় না, স্কুল হয় না, হাসপাতাল হয় না, মরা লোকের শ্রাদ্ধশান্তিতে ঘটা হয় না, পুত্রকন্যার বিবাহে সমারোহ হয় না; যাত্রা, পাঁচালী, খেমটা নাচ, বাই নাচ, থিয়েটর ইত্যাদিতে আমোদ হয় না, সুতরাং বড় মানুষে আমাদের দরকার আছে। বড় মানুষ দুইভাগে বিভক্ত। কুমড়াবড়ী দিবার সময় বঁটীর দোষে দুই খণ্ড যেমন ছোট বড় হইয়া পড়ে, সেই বিভাগ বিধাতার নির্ব্বন্ধে ঠিক এই প্রকার। এক দল কাজে লাগে, অপর দল কুড়ে। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এক জন আফিংচি বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে আফিং খাইয়া চক্ষু বুজিয়া ঝুম্ হইয়া গীতের সুরে কহিয়াছিলেন, সংসার একটী বৃক্ষ, মায়া তাহার বোঁটা; সেই বোঁটায় যে সকল ফল ফলে, তাহারা মানুষ। মানুষের মধ্যে আম, জাম, জামরুল, মাখাল, শিমূল, নারিকেল ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ফল আছে। তাহার মধ্যে বড় মানুষেরা কাঁটাল। সব কাঁটাল সময়ে পাকিতে পায় না। ছুঁড়ী বুড়ী গৃহিণী ঠাকুরাণীদিগের উৎপাতে এচোঁড়েরা অকালে আমাদিগের জঠরস্থ হয়। পবনের উপদ্রবে কাঁটালের তাদৃশ অনিষ্ট হয় না বটে, কিন্তু বৈশাখের তপনদেব রোষে কিম্বা পরিতোষে অনেক মুচি শুষ্ক করিয়া ঝরাইয়া দেন। যেগুলি বড় হয়, বৃক্ষস্বামীরা কাঁটার বেড়া দিয়া সেগুলিকে রক্ষা করেন। যাহারা উচ্চ ডালে ফলে, যোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুরদিগের ন্যায় তাহারা আপনা আপনি রক্ষা পায়। তাহা না হইলে পাকিতে পাকিতেই শেয়ালে খায়। সে সকল শেয়াল বনে থাকে না; বড় মানুষের ঘরে থাকে। তাহাদের নাম অথবা উপাধি নায়েব, দেওয়ান, কারকুন, মুহুরি, সরকার, মোক্তার এবং মোসায়েব। শেয়ালের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া যে সকল পাকা কাঁটাল

ঘুরে ধায়, ছোট ছোট মাছির দল ভন্ ভন্ করিয়া তাহাদের শান্তি নষ্ট করে। মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায়, খবরের কাগজের দায়, বাংলা পুস্তকের ছাপার দায়, স্কুলের দায়, হাঁসপাতালের দায়, জলাশয়ের দায়, লাইব্রেরির দায়, সভার দায়, ইত্যাদি ভন্ ভন্ শব্দ। কিন্তু মাছিরা শেয়ালের চেয়ে ভাল। তাহারা কোষ চায় না, একটু একটু রস চায়। পাকা কাঁটাল এক রকমে নিরাপদ। সাপে খায় না। গদিতে বসিয়া যে সকল কাঁটাল দিবারজনীর ত্রিশ দণ্ড কাল—কোথাও বা অধিক কোথাও বা অল্প,—কোথাও বা পূর্ণ ষাট দণ্ড পক্ষবিশিষ্ট সময়-পক্ষীর অমর্য্যাদা করেন, তাহাদের নড়িবার সামর্থ্য থাকে না। ভাল কাঁটালেরা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এমন কাঁটাল অনেক আছেন, তাঁহারা শুদ্ধ উৎকলী অথবা বেহারী বেহারাদিগের একান্ত অধীন। বেহারা যে কার্য্য করিয়া না দিবে, তাঁহাদিগের সে কার্য্য নিজের দ্বারা কখনই হইবে না। বেহারা কাপড় ছাড়াইয়া লইবে, কাপড় পরাইয়া দিবে, তোষাখানা, রসুই খানা, এবং গিন্নিখানার দেওয়ানী করিবে, কোথাও কোথাও নির্লজ্জ কাঁটালের অনুগত সবষ্টিচিউট্। এক একটী কাঁটাল,—পল্লীগ্রামে কিরূপ, জানা নাই, কলিকাতার কাঁটাল গাড়ী করিয়া গঙ্গাস্নানে যান। অভিষেকের পরে ঝাড়া আধ ঘণ্টা অসাড় কাষ্ঠ অথবা প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় আজানুলম্বিত বাহু হইয়া পৌষের জীবের ন্যায় কাঁপিতে থাকেন। ললাট হইতে ভ্রূ, ভ্রূ হইতে নেত্র, নেত্র হইতে কপোল, কপোল হইতে গ্রীবা, গ্রীবা হইতে বক্ষ, বক্ষ হইতে উদর, উদর হইতে উরু, জানু ও চরণতল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বারিশীকরে ঘন ঘন সিক্ত হয়। ঠিক যেন এক একটী জল-মানুষ ওরফে জল-কাঁটাল। কেহ কেহ খাজা, কেহ কেহ নেয়ো। বেহারা যতক্ষণে মস্তক ও গাত্র মার্জ্জন করিয়া না দিবে, ততক্ষণ কাঁটাল শুষ্ক হইতে পারিবেন না। খাজা কাঁটালেরা আবার আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, সর্ব্বসংহারিণী ভাববিলাসিনীর দুয়ারে উঠিতে বসিতে "ঝণ্টাঘাত" সহ্য করিতে নিশাকালে অনেক কাঁটাল বিলক্ষণ মজবুত। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কহিয়া গিয়াছেন; বাপ মরা ছোট ছোট বড় মানুষ (আমাদের এচোঁড়) প্রথমে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কান্নে খেকো ঘুড়ীর মত আকাশপথে ঘুরিতে

থাকে। লট্‌কাইয়া অথবা লাট খাইয়া ভূমে পড়িলে, দেওয়ানজীর কূট্‌ কচালে খতিয়ানের গোঁজা মিলন ধরিতে হয়। সে সকল কাঁটাল প্রায়ই পাকিতে পায় না। যদি কেহ কিলাইয়া পাকায়, যদি কেহ নুন মাখাইয়া পাকায়, (সেই নুন কিছু অধিক পরিমাণে আঁতুড়ে দিলেই ভাল হইত) তাহা হইলে বড় বড় ওয়েলাব, বড় বড় ব্রাউইহাম, বড় বড় ফিটন, বড় বড় ব্র্যাণ্ডি এবং বড় বড় বাইজীর চরণতলে অকালে তাহাদের ধন, জন, যৌবনের পর্য্যবসান হয়। আরও অনেক কথা বলিতে বাকী রহিল, লাইবেলের আইনের মস্তকে কবার্পণ করিয়া অগত্যা আমরা অবসরান্তরের জন্য সেগুলি সঞ্চয়ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিলাম। আশারাম ঢেঁকীর মত আজকার কালে যাঁহারা অধিক আহার করিতে পারেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে উদর পূরিয়া এই গাছের কাঁচা কাটাল কিম্বা শিয়ানের উচ্ছিষ্ট অনুচ্ছিষ্ট পাকা কাঁটাল ভক্ষণ করিবার স্বাধীনতা গ্রহণ করুন।

তৃতীয় প্রবাহ।

মেয়ে মানুষ।

মেয়ে মানুষ সংসারের লক্ষ্মী!—লক্ষ্মীনারায়ণের কথোপকথনে জগন্মাতা পদ্মালয়া স্বয়ং কহিয়াছেন:—

"যথোপদিষ্ট গুরুভক্তিযুক্তা।
পত্যুর্ব্বচনা ক্রমতে চ নিত্যং॥
নিত্যঞ্চ ভুংক্তে পতিভুক্ত শেষং।
তস্যাঃশরীরে নিয়তং বসামি॥"

লক্ষ্মীচরিত্র।

ইহার অর্থ এই যে, শাস্ত্রে যেরূপ গুরুভক্তির উপদেশ আছে, তাদৃশ ভক্তিযুক্তা যে স্ত্রী, সর্ব্বদা পতির বাক্য প্রতিপালন করেন; এমন যে স্ত্রী,

নিত্য পতির ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন, এমন যে স্ত্রী, সেই সুলক্ষণা স্ত্রীর শরীরে সর্ব্বদা আমি বাস করি।

সংসারে মেয়েমানুষ না থাকিলে বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত এই মনোহর বিশ্ব-সংসার বিজন অরণ্যের ন্যায় শোভাশূন্য দেখাইত। বড় মানুষপ্রবাহে যে আফিংচির কথা বলা হইয়াছে, সেই আফিংচি মেয়েমানুষ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, মেয়েমানুষ কি ফল? আপনাপনি আবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, লোকে বলে, কলা গাছ। সে ত গেল গাছের কথা, ফলের নাম হইল কৈ? যদি বলা যায়, কলা; তাহাও সকল প্রকারে ঠিক হয় না। খাটাইলে এক প্রকারে এই অর্থ খাটিতে পারে যে, মেয়েমানুষ কলা কি জন্য? কেন না, অর্থাৎ বানরে খায়। এ সিদ্ধান্তে আফিংচি সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি বলেন, মেয়েমানুষ নারিকেল ফল। করকচি নারিকেল উপকারী। ডাব নারিকেল স্নিগ্ধকর। ঝুনো নারিকেলের গুণ অন্য প্রকার। ডাবের চারি উপকরণ। জল, শাঁস, মালা, এবং ছোবড়া। জলের শৈত্যগুণ; সংসারতাপে তপ্ত হইয়া একটু ডাবের জল খাও, তৎক্ষণাৎ শীতল হইবে। শাঁস খাও, দুটী গুণ পাইবে। জল ও শাঁস উভয়ই মেয়েমানুষের স্নেহ-মমতা। মালা মেয়েমানুষের লেখাপড়া। ইহা সর্ব্বদাই আধখানা। ছোবড়া মেয়েমানুষের রূপ। ইহা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। ডাব পুরাতন হইলেই ঝুনো হয়। ঝুনো নারিকেলের জল ঝাল, শাঁসে শীঘ্র দন্ত প্রবেশ করে না। কিন্তু অনেক কাজে লাগে। ইহাতে নারিকেল লাড়ু, রসকরা, ছাবা, চন্দ্রপুলী ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। আস্বাদনে অথবা অসময়ে তরকারিতে দিতে। নারিকেল তৈলে মস্তিষ্ক শীতল হয়। ঝুনো নারিকেলের শাঁসে অম্ল রোগ ভাল হয়; শূল রোগ আরাম হয়; আরও অনেক উপকারে আইসে। বৃদ্ধ মেয়েমানুষ সৎপরামর্শ দেয়, আদরযত্নও জানে; কিন্তু দলের কেহ কেহ অত্যন্ত কুৎসিত কার্য্যে প্রতিনিধিত্ব করে।

পুরুষ-মানুষের ন্যায় মেয়েমানুষ নানা প্রকার। কেহ কেহ সংসার উজ্জ্বল করে, কেহ কেহ এক কালে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখে। মেয়েমানুষ একটী ছোট কথা, চলিত কথায় ইহাঁকে যে নামেই ডাকুক্ না, আমাদিগের মতে তাঁহার নাম স্ত্রীজাতি। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, পুরুষ অপেক্ষা

স্ত্রীলোকের আহার দ্বিগুণ, বুদ্ধি চতুর্গুণ, ব্যবসা ছয় গুণ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি আট গুণ বেশী। কে জানে সত্য মিথ্যা, লজ্জার খাতিরেই হউক, ভক্তির খাতিরেই হউক, স্নেহের খাতিরেই হউক, কিম্বা আত্মাবমাননার খাতিরেই হউক, স্ত্রীজাতি সর্ব্বদা দেখাইয়া থাকে, পুরুষ অপেক্ষা অনেক ছোট। যাহারা প্রবলা, অহঙ্কারবশে তাহারা যাহাই কেন করুক না, সময়ে প্রকৃতির প্রকৃতি বজায় রাখিতে হয়। বিশ্বাসঘাতক পুরুষদলে অনেক অপমান করে, কিন্তু লক্ষ্মীস্বরূপিণী সংসারের স্ত্রী সে অপমানকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য প্রসন্ন বদনে সম্পাদন করেন। আমি মানুষ, নারীজাতির সমস্ত গুণ স্মরণ করিয়া হাসি কাঁদি, কিন্তু ভক্তিভাবে পূজা করি। কবি তুলসীদাস কহিয়াছেন ঃ—

"চল্না ভালা না কোশকা,
দুহিতা ভালা না এক্।
মাংনা ভালা না বাপ্কা,
যব প্রভু রাখে টেক্॥"

যদি প্রয়োজন হয়, আমরা বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দিব। এক ক্রোশ পথ চলিও না, একটী কন্যারও পিতা হইও না, বিধাতার প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে পিতার কাছেও কিছু ভিক্ষা করিও না।

৩। একবার হরি হরি বলো। আমরা বঙ্গবাসী, কত দিনের বঙ্গদেশ, তাহা আমাদের মনে পড়ে না। কাপুরুষ রাজা লক্ষ্মণ সেন সপ্তদশ অশ্বারোহী-সহচর যবন বখ্তিয়ার খিলিজির আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়াই পান বাটা খাইতে খাইতে খিড়্কি দরজা দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। গণকের মুখে শাস্ত্রের কথা তাহার শুনা ছিল, একদিন তুরস্ক দেশের তুর্ক জাতি বঙ্গ রাজ্যের রাজা হইবে। সেই ভণিত বাক্য প্রমাণে ভীরু লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন।—কোথায়? নিত্য নিবাসময় জগৎপ্রতিপালক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নীলাচল ক্ষেত্রে। আজি ছয় শত একাশী বৎসর হইল, বঙ্গদেশে যবনের অধিকার। অভাগা আমরা, ছয় শত একাশী বৎসর পরাধীন।

আমাদের কন্যারা কি আমাদিগের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে না? দুঃসাহসে এ কথা কে বলিতে পারে? জগতের সঙ্গে প্রকৃতির সৃষ্টি; প্রকৃতির নাম জগৎ। প্রকৃতি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি হইত না, সৃষ্টি থাকিত না। সেই কারণে ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবেরা যে কোন জ্ঞানেই হউক্, সতীসাধ্বী প্রকৃতিদেবীকে জননী বলিয়া থাকেন। প্রকৃতি আমার জননী, প্রকৃতি আমার সহধর্ম্মিণী; প্রকৃতি আমার কন্যা।

আবার সংসারের ছোট কথা। পশ্চিম প্রদেশে হিন্দুস্থানীরা অবশিষ্ট চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজপুতনার ক্ষত্রিয়েরা বিবাহের ব্যয় বাহুল্য ভয়ে কন্যা জন্মিলে সূতিকা ঘরে মারিয়া ফেলে। দেশের রাজা, অথবা বিদেশের রাজা কেহই সে পাপ নিবারণ করিতে পারেন না। কত গোপনে সে সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, আকাশনন্দিনী কল্পনাসতীর সঙ্গে অহরহ আকাশপথে পরিভ্রমণ করিয়াও আমরা তাহার নিরাকরণ করিতে অসমর্থ। আকাশে থাকেন দেবতা। পর্ব্বতে থাকেন গন্ধর্ব। পর্ব্বতে থাকেন মহাকাল মহাদেব। সাগরে থাকেন পরাৎপর নারায়ণ। তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির মর্য্যাদা জানেন। বৈকুণ্ঠপতি রমানাথ লোকরমা রমাদেবীকে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করেন। শ্মশানপতি পশুপতি মহাদেব উলঙ্গিনী নৃত্যকালী ভদ্রকালীকে বক্ষে ধারণ করেন, আমরা তুচ্ছানুতুচ্ছ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র কীটানুকীট মানুষ; আমরা প্রকৃতির মর্য্যাদা জানি না।

বলা হইল, হিন্দুস্থানী লোকেরা সূতিকাগারে দুহিতা হনন করে। পারে বলিয়া করে। লোকপরম্পরানুসারে জাতিতে তাহারা খোট্টা। খোট্টাদের রাগ বেশী, মান বেশী, বল বেশী। আর কিছুই বেশী না। মান বেশী কেন? যবনের অধিকারের পূর্ব্বে খোট্টা এদেশের রাজা ছিল। আজিও যেমন বঙ্গের পাতি নেড়ে আপনাদিগকে বাদসাহের জাতি বলিয়া গর্ব্ব করে, সাবেক রাজার জাতি বলিয়া তেমনি খোট্টাদেরও মনে মনে মান বেশী। কাল সাগরের ঢেউ ফিরিয়াছে, আর আমরা খোট্টাদিগকে নিন্দা করিতে পারি না। দায়ে পড়িয়া আমাদিগকেও হয় ত কোন দিন না কোন দিন স্নেহপুত্তলী কন্যাগুলিকে বিবাহের পূর্ব্বে বিষ খাওয়াইয়া কিম্বা গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে!

আমরা এখনও ততদূর হই নাই। আমাদিগের দুরন্ত স্বার্থপর সমাজ, দেশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, কুলের কলঙ্ক। অর্থলুব্ধ সমাজ যাহা মনে আইসে, তাহাই করে। কোন বন্ধন মানে না, রাজদণ্ড, সমাজ দণ্ড, কিছুই গ্রাহ্য করে না, ইচ্ছাসাগরে সাঁতার দিয়া দিয়া ভাসিয়া যায়। পাঠক মহাশয়! পাঠিকা ঠাকুরাণি! তোমরা যদি কেহ কখন গঙ্গাসাগরে গিয়া থাক, অবশ্যই ঢেউ খাইয়াছ। ঢেউ খাইলে পাপ যায়, পুণ্য হয়, পুণ্য যায়, পাপ হয়, তথাপি সেই পাপপুণ্যের বিনিময়ের এক দিন বিচার আছে।

কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলেম।—খোট্টাদের দৃষ্টান্তে আমরা মেয়ে মারিতে পারিব না। মেয়ে মানুষ জগতের শোভা, মেয়ে মানুষ সৃষ্টিকর্ত্রী। ভ্রান্ত লোকেরা ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। কিন্তু কে সে ব্রহ্মা? যাঁহার নাভিতে পদ্মফুলের আকারে এক মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার নাম বিধাতা। কিন্তু কে সে ব্রহ্মা? তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? মুনি যাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন, আমি যাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলি, তিনি একটী সামান্য ক্ষুদ্র সৃষ্ট বস্তু মাত্র। আমরা বলি, ব্রহ্মা আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। আমরা অনেক পুত্রকন্যা সৃজন করিয়াছি; এ বড় হাসির কথা। ভ্রম! ভ্রম!! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!! পুরাণ শাস্ত্র মানিতে হয় বলিয়া শির নত করিয়া আমরা বলি, সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা।

কিন্তু না ত। ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন আছেন। সপ্তর্ষি। কে তাঁহারা? শাস্ত্র তাঁহাদিগের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্র দেখিলে আমার হাসি পায়। নারদ ব্রহ্মার পুত্র, এমন শাস্ত্রও আমরা দেখিয়াছি। যে শাস্ত্রে ব্রহ্মার উৎপত্তির পূর্ব্বেও নারদের উৎপত্তি হইয়াছিল, নারদ তখনও বলেন, তিনি কালিকার ছেলে। কশ্যপ আমাদের আদি পুরুষ। বিশ্বাস হয় না। অনেকেই আমাদের আদি পুরুষ বলিয়া দাবী করেন। সত্যযুগে স্বয়ম্ভু মনু, কলিযুগে বৈবস্বত মনু। মনু মানুষের আদি পুরুষ। ব্যাকরণে যে ধাতু আছে, সেই ধাতু প্রমাণে মনুবংশোদ্ভব মানব, মনুষ্য, অথবা মানুষ। জননী প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির গর্ভে আবার নূতন নূতন পুরুষপ্রকৃতির জন্ম হয়। দক্ষ রাজার সাতাশ কন্যার পতি চন্দ্র ছাড়া অনেকগুলি মুনি-ঋষির পত্নী। তাঁহারাই প্রকৃতি। দক্ষকন্যার সমষ্টি ষষ্টি।

আমির কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলেম। কন্যাকে আমরা বধ করিতে পারিব না। কন্যা আমাদিগকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে না, ভট্টাচার্য্যেরা এ কথা বলেন। যখন কন্যাকে আমরা পুত্রী বলি, তখন কেন সে কথার সমন্বয় থাকিবে? যে এ কথা বলে, সে একটী ঘাস-ভোজী, রজকবস্ত্রবাহী গাধা। যত কথাই বলি, আঁতুড়ে আমরা কন্যা মারিতে পারিব না।

কন্যাদায় এখন আমাদের মহাদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহ দিবার সময় ভদ্রাসন পর্য্যন্ত আহুতি দিলেও নিষ্কৃতি লাভ দুর্লভ!

একজন মহামুনি বলিয়া গিয়াছেন,—

"নিত্য পালনীয়া কন্যা,
শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ॥"

কন্যাকে যত্নে পালন করিবে, কন্যাকে যত্নে শিক্ষা দান করিবে।

এই ত সংসারের নীতি। আমাদের গৃহিণীরা এখনও বলেন, ব্রত করিলে ব্রতমত বর পায়। কথা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, যমপুকুর ও সেঁজুতির ব্রত তাহার সাক্ষী। মেয়েরা কার্ত্তিক মাসের প্রাতঃকালে উলঙ্গ হইয়া শিশিরে ভিজিয়া অন্ধকারে বাগানে বাগানে ফুল তুলিয়া আনে। ডাল ভাঙ্গিয়া, পাতা ভাঙ্গিয়া ফুল অন্বেষণ করে, দেখিতে পায় না। ভ্রমর, মৌমাছী; যেমন দেখিতে পায়, তাহারা তখন তেমন দেখিতে পায় না। তাহাদের মুখে তখন দুগ্ধের গন্ধ; যেতে হয় যায়, ব্রত করিতে হয়, পূজা করিতে হয়, জানে। যত্নবশী ফুল আনিতে হয় আনিব, জানে, ফুল কম হইলে ব্রত পচিয়া যাইবে জানে। কিন্তু কেন, তাহা জানে না, কোঁচড় ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনে। কেহ উলঙ্গ, কেহ আঙিছা পরা। ওষ্ঠের উভয় পার্শ্বে নিদ্রার উচ্ছিষ্ট লালা।———মাতৃস্তন পান করিতে করিতে অধর ওষ্ঠের উভয় পার্শ্বে যে তরল পদার্থ গড়াইয়া পড়ে, তাহাতে একটু একটু দাগ হয়, কপোলে সেই দাগ থাকে। সেই দাগ কণ্ঠ বাহিয়া উরসে পড়ে। পাঠক! সে তরুণ বালিকামূর্ত্তি এখনও কি দেখিয়াছ? সেই বালিকা আপন মাতার গৃহপ্রাঙ্গণে চতুষ্কোণ পুষ্করিণী খনন করিয়া চারি কোণে ধান, মান, কলা

কচু রোপণ করে। ভট্টাচার্য্য নাই, আপনারাই যজমান, আপনারাই পুরুত। যমপুকুর পূজার মন্ত্র এই,—

"হিংচে কলমী লালা করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষী শুকের বিল,
সোণার কৌটা রূপার খিল॥"

এই ব্রতের পর সেঁজুতি। আমাদের কন্যারা কাপড় পরিতে শিখিলে সাঁজ সেঁজুতির ব্রত করে। এই ব্রতে সতীনের উপর হিংসা করিতে শিখিতে হয়। সতীন কাহাকে বলে জানে না। পতি কাহাকে বলে, জানে না। তবু কে যেন শিখাইয়া দিয়াছে, হৃদয়ে কি যেন আঘাত লাগিয়াছে, বালিকা বালা, তথাপি সেই সতীনের হিংসা মনে মনে যেন জ্বলিয়া উঠে। কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটের বেঙ্গল থিয়েটর, ন্যাসনেল থিয়েটরে, ষ্টার থিয়েটরে সতী, সীতা, সাবিত্রীদেবীর অভিনয় হয়।

কাহারা সেই সকল সতীর কার্য্য অভিনয় করে, স্পষ্ট উদাহরণ ক্ষেত্রে সেগুলির যথার্থ চিত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

বলা হয়েছে, মেয়ে মানুষ নারকেল ফল; কিন্তু তা বোলে সব নয়। তাদের মধ্যে কটু কষায় কদর্য্য ফল অনেক আছে। মন ভাঙ্গা, ঘর ভাঙ্গা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নীদিগকে পর করা, আপনা আপনি ঝগড়া করা, বাতাসে দড়ী দিয়ে নির্দ্দোষ লোকের নিন্দা করা, পুরুষকে গাধা বানান, অথবা বানর নাচান সেই জঘন্য দলের প্রিয় কার্য্য। উপযুক্ত অবসরে পাঠক মহাশয় সেই সকল প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর ছবি দেখতে পাবেন; এখন এ বর্ণনার অসময়। সকল কার্য্যেরই সময় আছে, সকল বিষয়েরই অবসর প্রয়োজন, প্রাতঃকালে দুই প্রহরের কার্য্য, দিবা দ্বিপ্রহরে সায়হ্ন কার্য্য, সন্ধ্যাকালে নিশীথের কার্য্য এবং নিশীথকালে উষার কার্য্য স্বভাবের বিরুদ্ধ। তাহাতে রসভঙ্গ হয়, অতএব উপযুক্ত অবসরে প্রস্তাবিত ছবিগুলি চিত্র করিবার বাসনা রহিল।

চতুর্থ প্রবাহ।

ছোট মানুষ।

"কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে।
*　　*　　*　　*
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত ; শুন সবে, না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি :
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব সংসারে।"

বীরাঙ্গনা।

ছোট মানুষ ছোট ফল। প্রায়ই তারা কাঁটালের অনুগত। কাঁটালেরা মনে করে, ছোট ছোট ফলেরা সকলেই কাঁটালের ক্রীতদাস। কেন না, তারা ছোট। মূর্খ পাঠক যেন এমন মনে না করেন যে, ছোট মানুষ বলা গেল বোলে শ্রীকৃষ্ণের বামন অবতার, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ অথবা মণ্টি-কৃষ্টের কল্পিত পিপীলিকাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ সিদ্ধান্ত কোরে নিতে হবে। ফল কথা তা নয়। মানুষ যেমন, তেমনই আছে, তফাৎ এই যে, ধনে ছোট, মানে ছোট, গণনায় ছোট, আর সমাজের মধ্যে আধিপত্যে ছোট। কাঁটালেরা মুটে মজুরের মাথায় চড়েন, ভারবাহীদের কাঁধে উঠেন, ছোট ফল গাছ তলায় পোড়ে গড়াগড়ি খায়।

চার প্রবাহে চার প্রকার মানুষের অল্প অল্প পরিচয় দেওয়া গেল ; এই চার প্রকারের মধ্যেই মিষ্ট, টক, তিক্ত, ঝাল, পানসে, বিস্বাদ ইত্যাদি সকল প্রকার বিশেষণ কোন যান, বেছে নিতে গেলে মামলা মকদ্দমা, দলাদলির ঘোট, ধড়িবাজী, জুয়াচুরি, শান্তিভঙ্গ, ধর্ম্মের দুর্দ্দশা, নীতির

অপমান ইত্যাদি সকল দলের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে, ফলতঃ ঐগুলি অনেক মানুষের প্রিয় কার্য্য। পাঠক মহাশয় ত্রৈরাশিক অথবা ভগ্নাংশ বিবেচনা কোরে যদি কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করেন, আর সেই কষ্টের সঙ্গে আমাদের যদি ক্ষমা করেন, তা হোলে বিনীতভাবে আমরা বোল্‌তে পারি, দলের ভিতর চোর হয়, ডাকাইত হয়, লম্পট হয়, মালিনী হয়, উকীল হয়, ঘটক হয়, ডাক্তার হয়, ভট্টাচার্য্য হয়, পাদরি হয়, সব হয়।

দর্পণে যেমন মুখ দেখা, ব্যবহারে তেমনি মানুষের ছায়া দেখা। আমরা সংসারের ব্যবহারকে একখানি বৃহৎ দর্পণ বোলে পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে যেন কোন গিরিগাত্রে সেই দর্পণখানি ঝুলাইয়াছি। সেই দর্পণে যখন তখন আমরা দেখিতে পাই, ক্ষণে ক্ষণে রকমওয়ারি ছায়া পড়ে। একটু বিলম্ব আছে। অকস্মাৎ পিতামহী ঠাকুরাণীর একটী নিশাগল্প স্মরণ হলো। ছায়া দেখাবার অগ্রে সেই চমৎকার গল্পটী পাঠক মহাশয়কে উপঢৌকন না দিয়া থাকা গেল না।

এক ভিকারী নিত্য নিত্য এক নগরে ভিক্ষা কোরে বেড়াত। এক দিন উষা বিগমের কিঞ্চিৎ পরে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, পথে একটী নদী, নদীর দক্ষিণ পারে সহর। একটী তক্তার সেতু বাহিয়া এপার থেকে ওপারে গতিবিধি কোর্‌তে হয়। সেতুর দক্ষিণ ধারে এক জন জটাধারী সন্ন্যাসী বোসে ছিল, ভিকারীকে দেখে সেই সন্ন্যাসী ঈষৎ ঈষৎ হাস্য কোল্লে। ভিকারী মনে মনে বিরক্ত হয়ে আপনা আপনি মনে মনে বিড় বিড় কোরে কি বোকে কটমট চক্ষে সন্ন্যাসীর দিকে একবার চাইলে। মুখে একটী বাক্য উচ্চারিত হলো, "অযাত্রা!"

সন্ন্যাসীর চক্ষে জল এলো, ভিকারী চলে গেল। সময় কারো হাত ধরা নয়। সূর্য্যদেব উদয় হলেন, পৃথিবীকে একবার সোণার অলঙ্কারে আবার রূপার অলঙ্কারে সাজালেন, আকাশের মাঝখানে উঠে প্রচণ্ড তাপে পৃথিবীকে পুড়ালেন। কিন্তু অহঙ্কার কতক্ষণ থাকে? যে যত উচ্চে উঠ্‌তে পারে, উঠুক, চরম সীমায় উপস্থিত হোলেই পতন আছে। সূর্য্যদেবে আর যুবতীর স্তনে বিজ্ঞানের এই দৃষ্টান্তটী প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

মহাকবি কালিদাস আদিরসের কবি, তিনি কেবল যুবতীর স্তনকে এই

উত্থানপতনের দৃষ্টান্তস্থলে প্রদর্শন কোরে গিয়েছেন, সূর্য্যের কথা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গর্ভে ছিল, সময়ে সুপ্রকাশ।

বেলা দুই প্রহর অতীত।—প্রখরপ্রতাপ প্রভাকর মধ্য গগনে আরোহণ কোরে প্রখর রশ্মিজালে জগৎসংসারকে সদার্প সন্তাপিত কচ্ছিলেন, এখন আর সে সাধ্য না। বল-চক্র ফিরে গেল, অরুণ একটু অবসন্ন হয়ে পোড়্লেন, আরোহী দেবতাও মাতালের মত পশ্চিমে একটু একটু চল্লেন। সাদা কথায় সূর্য্যের ঢলকান বলে।

অপরাহ্ণ। ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত ভিকারী দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। নিত্য ভিক্ষা কে দেয়? কেহ বলে সঞ্চিত ধন নাই; কেহ বলে চোর; কেহ বলে নিত্য ভিক্ষা দিতে অপারক, গলাধাক্কা দিতে কেহ দরওয়ানকে হুকুম দেয়, কোন দয়ালু এক কড়া কড়ী দান করেন, যাঁহার অধিক দয়া, তাঁহার উচ্চ দান এক মুষ্টি তণ্ডুল।

এ ভিকারীর অদৃষ্টে সেদিন সে সৌভাগ্য ঘটে উঠ্লো না। অনেক জায়গাতেই বঞ্চিত হতে হলো। ক্ষুধা উপবোধ মানে না, পিপাসা নিশ্বাস পড়িতে দেয় না, দুদিকে টানাটানি করে। হা দুর্ভাগ্য! তোমার মর্ম্ম কে বুঝে? এক কড়া কড়িতে আর এক মুষ্টি তণ্ডুলে যাহার জীবন, সে অভাগার ভিক্ষা মেলে না! জীবন যেন মানুষের দান, জীবন যেন মানুষে হরণ কোত্তে পারে, সংসারের ঠিক এমনি ভাব।

উপবাসে কি মানুষ মরে? উপবাস করে কে? রহস্য পাঠক! তুমি ভিকারীকে ভিক্ষা দিলে না, ভিকারী উপবাসী থাক্লো, কার কি তাতে? তোমার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের জীব সৃষ্টি নয়, তুমি আহার দিবে বোলে সৃষ্টিকর্ত্তার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি নয়, তবে কার কি? ভিকারী উপবাসী থাকুক।

সকালে ভাস্কর একবার রক্তবর্ণ হয়েছিলেন, পুনর্ব্বার রক্তবর্ণ। পাটে বস্‌বার সময় উপস্থিত। উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত, উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা কে যেন সোণা দিয়ে মুড়ে দিল। প্রভাতে সোণা থেকে রূপা হয়, সে স্বর্ণকার জগৎবাসীর বহুরূপির বহুরূপী; কিন্তু সায়ংকালে সোণাকে রূপা কর্ব্বার কোন স্বর্ণকার পাওয়া যায় না। নিশাচর পশুপক্ষীদল বিদ্রোহী হয়ে তপনদেবকে তাড়াবার জন্যে ঘোরতর ষড়যন্ত্র করে। সূর্য্য রক্তবর্ণ:

তিনি তখন কাহারও উপর প্রভুত্ব রাখতে পারেন না, নিজেই শ্রান্ত, ক্লান্ত অবসাঙ্গ, কাজেই নিশাচরের প্রাদুর্ভাব। সন্ধ্যাকালে কাক ডাকে, ঊষাকালে কাক ডাকে, একবার সখা, একবার শত্রু; কাকেরা ঘরে যাবার জন্যে ঝটপট্ শব্দে পক্ষ সঞ্চালন কোরে কা কা রবে উড়ে গেল। সূর্য্যের সারথী, সূর্য্যের ঘোড়া, সূর্য্যের বিশ্বভ্রমণকারী রথখানি নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হলো, মানুষের চক্ষু সেটী কিছু মাত্র অনুভব কোর্ত্তে পাল্লে না, সূর্য্যদেব পাটে বোস্‌লেন।

সন্ধ্যা। আশ্চর্য্য! এই না দিগ্‌দাহ হচ্ছিল, এই না প্রচণ্ডতাপে পৃথিবী জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল, কোথায় সে আগুন? অস্তশৈলের উচ্চ শিখরে ভগবান ভাস্কর দেব সমস্ত রাত্রের মত লুকালেন। চক্ষুগোচরে দর্শন কোর্ত্তে না পেয়েও ভক্তবৃন্দ "জবাকুসুম সঙ্কাশং" ইতি মন্ত্রে সূর্য্যদেবের উপাসনা কোল্লেন। নীলাকাশে দুটী চারিটী নক্ষত্র।

ভিকারী ফিরে গেল। সম্মুখে সেই সেতু, সেতুপার্শ্বে সেই সন্ন্যাসী। ঊষাকালে যে সন্ন্যাসী হাস্য করিয়াছিলেন, তখন সেই সন্ন্যাসীর চক্ষে জল। ভিকারী নিকটস্থ হোলে সন্ন্যাসী একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টে তার মুখপানে চেয়ে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। নিশ্বাসে এই ভাব ব্যক্ত হলো, তুমি কিসের ভিকারী?

উত্তর দিল চক্ষের জল, জলের প্রশ্নের উত্তর দিল সন্ন্যাসীর হাসি। বাঙ্গালি পাঠক পাঠিকা! এ প্রশ্নের এ উত্তরের নিগূঢ় মর্ম্ম কিছু বুঝ্‌তে পাল্লে কি? না ত! গূঢ় মর্ম্ম। যে সন্ন্যাসী রোদন কচ্ছিলেন, তিনি হাস্‌লেন; যে ভিকারী নগরের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ কোরে হতাশে নিরাশ্বাসে ফিরে এলো, সে ভিকারী স্তম্ভিত, এ বিপরীত ভাবের মর্ম্ম কি?

জটাধারী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, অযাত্রার ফল কি ফলেছে?

ভিকারী উত্তর দিল, কচ্ছপে যেমন ফল ফলে, প্রভাতে তোমার মুখ দেখে আমার তেমনি ফল ফলেছে।

"সে কিরূপ?"

"তোমায় বোলে কি হবে?"

"তব?"

"কেহই ভিক্ষা দিল না। অনেক বড় মানুষ, অনেক গৃহস্থ মানুষ, আমাকে দয়া কোরে নিত্য নিত্য কিছু কিছু ভিক্ষা দিত, আজি আর কেঁউ না।"

সন্ন্যাসী আবার হাস্য কোল্লেন। ধীর মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন,—উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেউ না?"

"না।"

যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা কোরে সেতুপথবিহারী সন্ন্যাসী হাকিমি স্বরে অনুমতি দিলেন, তুমি আবার যাও।

কাকুতি মিনতি কোরে ভিকারী নিবেদন কোল্লে, আবার গেলেই প্রাণ যাবে! সব ঘরেই আমি তিরস্কার লাভ কোরে বঞ্চিত হয়ে ফিরেছি।

"তুমি আবার যাও। আমি তোমাকে একটী ফল দিচ্চি, এই ফলটী হাতে কোরে সহরে তুমি আবার যাও।"

সন্ন্যাসী একটী ফল দিলেন, উপবাসী ভিকারী সেই ফলটী হাতে কোরে আগে যে সব ঘরে ফিরে ছিল, পর দিন প্রাতে সেই সব ঘরে আবার গেল।

সেখানে কি? বাঘ, ভল্লুক, শৃগাল, কুকুর, শূকর, বানর, পেঁচা, ইঁদুর, মণ্ডূক, ঝিঁঝি আর চামচিকা ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাটিনের পোষাক, সাটিনের গদি, সাটিনের টানা-পাখা, রাশি রাশি মোসাহেব, ডজন্ ডজন্ বাগ্রবক্তের আধার, গেঁউড় পাঁচালির আদ্য শ্রাদ্ধসভা, কিছুই নেই, সমস্তই ফক্কিকার! এক বিড়াল লাঙ্গূল গুটিয়ে দুগ্ধ পিপাসায় বানরের পদতলে লুণ্ঠিত হচ্চে, এক কুকুর একখানি হাড়ের অনুরোধে স্বক্কণি লেহন কোরে গর্দভের মুখপানে চেয়ে আছে, গাধার খুরের আঘাতে পুনঃপুন বিতাড়িত হোচ্চে, আরস্বুল্লা, টিকটীকী, মশা, মাকড়সা, ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, মজলিসে আর কিছুই নাই। একটু আগে যেখানে ঝাড় লণ্ঠনে বাতি জল্‌ছিল, সেখানে তখন অমাবস্যা-রজনী অপেক্ষাও অধিক অন্ধকার।

সন্ন্যাসীদত্ত ফলহস্ত ভিকারী তত বড় নগরে একটীও মানুষ দেখ্‌তে পেলে না। তবে কি দেখ্‌তে পেলে? রাশি রাশি ঘৃণিত জন্তু। হাতে একটী সন্ন্যাসীদত্ত ক্ষুদ্র ফল।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। যে দিন চাঁদ থাকে, সেদিন নক্ষত্র কিছু কম দেখা যায়। নক্ষত্রেরা চাঁদকে বড় ভালবাসে। দক্ষরাজা চাঁদকে সাতাইশটী কন্যা দান করেছিলেন, সেই কন্যারা আকাশের আর পঞ্জিকার সাতাইশ নক্ষত্র। তা ছাড়া আরও অসংখ্য নক্ষত্র সুনীল গগনক্ষেত্রে বিরাজমান। মেয়ে কি পুরুষ, কে জানে, তথাপি তাদের নাম তারা। কথায় চাঁদের নাম তারাপতি। সুধাকর অনেক স্ত্রী নিয়ে আকাশে বিহার করেন, তথাপি পৃথিবীর জলে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। কেন জান? চাঁদকে দেখে জলে কুমুদিনী ভাসে, কুমুদিনী হাসে। অসংখ্য স্ত্রী সত্ত্বেও চাঁদ বড় লম্পট।

ভিকারীকে দেখে সন্ন্যাসী একবার হাসলেন, একবার কাঁদলেন। ভিকারী দেখলে, সংসারে সব জন্তু; কেবল সেই সন্ন্যাসী এক জন মানুষ। ভক্তিভরে প্রণাম কোরে সাশ্রুনয়নে নিবেদন কোল্লে, ঠাকুর! তোমার ফলের গুণ আমি বুঝেছি। বিধাতার সৃষ্টিতে জন্তু বেশী, মানুষ কম। আমি শরণাগত; দয়া করিয়া আমারে উদ্ধার কর।

সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান। [illegible] ভিকারী সজলনয়নে দণ্ডায়মান।

নদীর জলে আকাশের ছায়া পড়েছে। আধখানি চাঁদ জলের ভিতর তরঙ্গিত হয়ে বাতাসের হিল্লোলে তালে তালে নৃত্য কোচ্চে। বোধ হয় করতালি দিবার শক্তি নাই, সেই দুঃখে নিস্তব্ধ। নক্ষত্রমালা প্রিয়তম শশধরকে পরিবেষ্টন কোরে বিরহদুঃখে জলতলে ঝাঁপ দিয়েছে। পতি কাছে, তবে বিরহ কেন? কুমুদিনীর হিংসায় সুধাকর জলে ঝাঁপ দেন, কুমুদিনীর প্রেমে তারকামালার ঈর্ষা হয়। এ কি সহমরণ? চন্দ্র জলে ঝাঁপ দেন, হতে পারে কুমুদিনীর প্রণয়ে, কিন্তু সত্য কি তাই? না ত! কুমুদিনীর অনেক বন্ধু আছে। চন্দ্রকে দেখিয়া কুমুদিনী হাসে কেন? কুমুদিনী জানে; চন্দ্রের সঙ্গে নক্ষত্রেরা জলে ঝাঁপ দেয় কেন? নক্ষত্রেরা জানে। কোথায় বিরহ, কোথায় ভালবাসা, কিছুই বুঝা গেল না।

রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী কখন চলে গেছেন। নিরাশ ভিকারী এখন ঘরে যাবে। নিরাশ্রয় ভিকারীর ঘর কোথায়?

ভিকারীর ঘর সংসার; কিন্তু ফলের প্রভাবে সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্যে ভিকারী জেনেছে, পৃথিবীতে মানুষ কম।—কম কেন, মানুষ নাই, কেবল জন্তুই

বেশী। এক মানুষ সেই জটাধারী সন্ন্যাসী। যে ফল এত বিরাল কুকুর দেখালে, সেই ফল কেবল সেই সন্ন্যাসীকেই মানবাকারে প্রদর্শন করেছিল। সন্ন্যাসী কোথায়? স্তম্ভিতভাবে ভিকারী অনেকক্ষণ নিশ্চলে সেই নদীকূলে দাঁড়াইয়ে থাক্‌লো, সন্ন্যাসী আর ফিরে এলেন না। আকাশে আধখানি চাঁদ ছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে ক্রমে কাল মেঘের সঙ্গে মিশে গেল। ঘোর অন্ধকার।—এখন নক্ষত্রের রাজত্ব। রাজত্ব অথচ বিরহ।

পিতামহী বলেছিলেন, সন্ন্যাসীর বরে ভিকারী রাজা হয়েছিল। রাজা থেকে যোগী হয়েছিল, যোগী থেকে নির্ব্বাণ পেয়েছিল। পিতামহীকে নমস্কার, সত্যমিথ্যা, সে কথা আমরা জানি না।

আবার ঊষা। আবার রজনী প্রভাত। আবার আমরা পাঠক মহাশয়ের সঙ্গে নূতন সাক্ষাৎ কোত্তে সহর্ষ চিত্তে উপস্থিত।

দর্পণে মানব প্রকৃতির ছায়া পড়ে। কেমন যে সে ছায়া, পাঠক মহাশয় যদি দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন, অনুগত দাসের মতন ও ঐন্দ্রজালিক লাণ্ঠনের কাশী, বাঞ্চি, দ্রাবিড়াদি তীর্থস্থানের মতন সে দৃশ্যগুলি আপনাদের নয়নদর্পণে স্তবকে স্তবকে ধরে দিতে পারি।

চিনেছি মানুষে আমি বহু দরশনে,
মনে আছে ভুলিব না জীব যত দিন!
নৃশংস পামর দস্যু কতই মানব—
উরিয়াছে ধরাধামে শান্তিনাশ হেতু!
না থাকিত যদি ভবে মনুষ্য সঞ্চার,
মরুভূমি হতো বিশ্ব সাহারার মত,
তা হলে আমার শান্তি থাকিত জগতে!
পাপী আমি সত্য, কিন্তু শ্বেতদ্বীপ নর
আসিয়াছে সুখ সব অধিকার করি,—
তথাপি বাঁচিয়া আছি, ধিক এ জীবন!

সাত শত বর্ষকাল যবন প্রতাপে
পরাধীন বঙ্গবাসী প্রতাপে কালের!
কাপুরুষ লক্ষ্মণের ভীরুতা কলুষে
কলুষিত বঙ্গভূমি কে খণ্ডিবে তাহা?
যে পাপে বঙ্গের ভঙ্গ সে পাপের সীমা
দিতে নাই! আমরাও সেই পাপে পাপী!
পলায়ন তোমার কি এত প্রিয় ছিল?
কে তব জ্যোতিষবেত্তা? তুর্ক বীরবর
জিনিবে এ বঙ্গরাজ্য ক্ষুদ্র বাহুবলে,
সপ্তদশ অশ্বারোহী করিয়া সহায়,
প্রবেশিয়েছিল বঙ্গে, দুরন্ত যবন
রাহুরূপে গ্রাসিবারে বঙ্গসুখরবি;
পাপাত্মা, পামর, দস্যু, ধূর্ত্ত বখ্‌তিয়ার!
যে দিনে খিলিজি রাজ্য বঙ্গেতে বিস্তার,
তার পূর্ব্বে, বহু পূর্ব্বে গণকের মুখে
শুনেছিলা সেনবংশে বঙ্গেশ লক্ষ্মণ,
তুর্ক আসি বঙ্গরাজ্যে লবে অধিকার।
অধিকার? এ কি লজ্জা! কেহ জানিল না
রাজা তুমি পলাইলে গণকের ভয়ে?
যবনে তোমার রাজ্য করিল আক্রম!
ভীরু মোরা বঙ্গবাসী ভয়ে লুকাইনু!
সিংহাসনে রাজা নাই কার বলে যুঝি?
গিয়াছে সুখের রাজ্য! পরাধীন জাতি

লাথি জুতা খেয়ে খেয়ে রহিয়াছি বেঁচে !
এমন বাঁচনে ধিক ! জীবনেও মরা !
আর্য্যবর্ষ পরাধীন কহিব কাহারে ?
এস স্বাধীনতা সতি ! পূজি পা দুখানি ;
আমাদের করে দাও যা ছিলাম আগে ;
জাতিস্মর হই যেন প্রসাদে তোমার ।

এস মা বচনেশ্বরি ! হৃদিপদ্মধামে।
দেখাইয়ে দেহ মা-গো মরের মানুষ ।
কত খেলা খেলিতেছ, নাচিতেছ কত,
হাসিতেছ তুমি সতি ! প্রকৃতি সুন্দরি !
ছায়াবাজী করিতেছে তোমার পুতুল !
তুমি মা ত্রিলোকেশ্বরী ভব মায়াবিনী ;
কুহকিনী বোলে আমি গালি দিব তোরে !
আয় মা কল্পনা সতি ! নমস্কার করি,
থাক যদি দেখা দেও অবল মানবে,
তোমারি প্রসাদে আমি জয়িব সংসার ।
চরিতেছে কত জীব অনন্ত সংসারে,
ঢাকিতেছে চন্দ্রসূর্য্য চলাচল মেঘ,
তা বোলে কি হব আমি মেঘের অধীন ?
না মা না! তোমার দাস ভাবিছে তোমারে,
দেখিতেছে কত খেলা সংসারে তোমার,
উর আসি হৃদিপদ্মে সংসার ঈশ্বরি !

দুষ্ট এ মানবদল যাহাদের মাঝে
পশিয়াছি আমি দেবি! অদৃষ্ট ছলনে!
সবে অবহেলা করে ক্ষুদ্রজীব বোলে।
তা বোলে হব না সতি! অতি ক্ষুদ্রতর,
কহিব না তোমাদের উচ্চ স্থানে আমি।
পশিয়াছি সুরেশ্বরি! যা আছি তা আছি,
যে যা বলে করিয়াছি দেহ অলঙ্কার।
গিয়াছে সে দিন তবু আজো আছে মনে—
প্রিয়বন্ধু সিংহদেব প্রিয় উপদেশ,
কারো কথা শুনিব না রব নিজ পদে।
তিরস্কার কিম্বা পুরস্কার ভব ধামে,
যার যা অধিক আছে দিও তাহা মোরে,
করযোড়ে বহুমানে লব শির পাতি।
ঘুমায়ে ছিলাম আমি জাগিনু সহসা—
এ কি! স্বপ্নভঙ্গ না কি! কাহার কুহকে?
যারি হোক ভুলিব না থাকিতে চেতন।
এসেছি মানুষ আমি দেখাব মানুষে
বিশ্বপতি বিশ্বধামে কত লীলা খেলা।

প্রভাত হয়ে গেল। সে ভিকারী নাই, সে সন্ন্যাসী নাই, আকাশে চন্দ্র সূর্য্য কিছুই নাই, তবে আছে কি? একটা পূজনীয়া দেবী আছেন; তিনি সূর্য্যের জ্যোতি ভালবাসেন না। নিত্য শশধরের শীতল কিরণ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন না, একাকিনী তিমির বসন পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তরের দক্ষিণের শীতল সমীরণ স্পর্শ করিতে ভালবাসেণ, নাম তাঁর কি? কে

জানে কি ? আমি কিন্তু দেখি, সম্মুখে একটী স্বর্ণদেবী। সে দেবী কে ? চিন্তে পারা গেল না।

কেন পারা গেল না ? আমি জানি না। একবার ডাকি দেখি !

আয় মা কল্পনা সতি ! আকাশনন্দিনি !
আসিয়ে হৃদয়াকাশে হও মা উদয় ;
ভদ্রকালীরূপে সতি ! তেজোময়ী হয়ে,
হাতে লয়ে বরাভয় ; খর্পরধারিণি !
উর মম হৃদিপদ্মে যথা শম্ভুহৃদে—
দাঁড়াইয়া নৃত্য কর নৃত্যবিলাসিনী।
নৃত্যকালী তুমি দেবি ! জীব নিস্তারিণী।
সংহারিণী নামে ডাকি দেবী স্বরস্বতি !
যুদ্ধ নাই বঙ্গক্ষেত্রে বসিয়া নির্জ্জনে,
ভাবি ও অভয়পদ দেবী বীণাপাণি !
যে পদ প্রসাদে সতি ! দস্যু মূঢ়মতি
বাল্মীকি হইয়াছিল আদি কবিরাজ,
যে পদ প্রসাদে দেবি ! কবি কালিদাস,
যে পদ প্রসাদে সতি ! বীরভূমবাসী
রাধাকবি জয়দেব বিখ্যাত জগতে ;
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে পদের দাস
সেই পদাশ্রয় মাগো মাগি আমি আজি।
গিয়াছে হরিশচন্দ্র গিয়াছে কিশোরী,
গিয়াছে ঈশ্বর গুপ্ত, মধু মাইকেল,
একা আমি পড়ে আছি নিরাশ্রয় মত,
পদধূলা দিয়া মাগো কর সঞ্জীবিত।

সঞ্জীবনী মন্ত্র মাগো একা তুমি জান।
সেই মন্ত্রে সঞ্জীবিত কর নিজ দাসে।
জীয়ে তব গুণ গাই এই ভিক্ষা চাই।
আকাশে উঠিতে পারি বিজয় প্রতাপে,
ইন্দ্রকে জয়িতে পারি বৃত্রাসুর সম,
বাসুকি জিনিতে পারি রসাতলে পশি,
পর্ব্বতে জয়িতে পারি গিরি হিমালয়ে,
সাগরে পশিয়া পারি জয়িতে বরুণে,
নরধামে পরাজয়ি শত শত রাজা,
তোমার প্রসাদে সতি অসাধ্য সাধন
করিতে নাহিক শঙ্কা ; মতি যদি থাকে
তুয়া পদে। নতি করি ভক্তি করপুটে।

কে মা তুমি জগদম্বে ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরি ?
যুড়ি-হাত দয়াময়ি প্রণিপাত করি।
যে দেশে বিরাজি আমি, সে দেশ কি দেশ,
জানি মা জগদীশ্বরি ! মহিমা তোমার।
দেশের নিবাসী যত ভ্রান্তিকূপে ডুবি
আত্মহত্যা করিতেছে ডুবিয়ে হাঁপায়ে
মোহভ্রমে। মহাদেবি ! সব তুমি জান।

বীণাপাণি পাদপদ্ম বন্দিয়া মস্তকে,
নামিলাম আজি আমি নব রঙ্গভূমে।
দেখিব হারি কি জিতি প্রসাদে তাঁহার।

হটিব না যদি কৃপাবতী ; কৃপাময়ী
কৃপা নাহি বিতরেন অভাগা সন্তানে ;
তথাপি ছুটিয়া যাব যথা মন যায়।
সরস্বতি ! তুমি কি মা নিদয়া নিঠুরা ?
অনুগত দাসে কৃপা করিতে জান না ?
প্রণতি যুগল পদে ; ভক্তিভাবে সতি !
কৃতজ্ঞতা অর্পিলাম যা জান তা কর,
আমার সহায় আজি কল্পনাসুন্দরী।

ভিকারী চোলে গেল, যে দুঃখে গেল, সেই দুঃখে আমি ভিকারী।

পঞ্চম প্রবাহ।

সরাইয়ের সংসার।

চির নিবাসের স্থান নহে তব এ সংসার।
নয়ন মুদিলে হবে ধরাধাম অন্ধকার॥

আর্য্যাবর্ত্ত।

আজমীরের পুষ্করতীর্থ-সমীপে একখানি গাড়ী লাগ্‌লো। গাড়ীতে এক-জন উষ্ণীষধারী বীরপুরুষ অধিষ্ঠিত ছিলেন, তরবারি ধারণ কোরে গাড়ী থেকে অবতীর্ণ হোলেন। পরিধানে সামরিক পোষাক, অবয়বের আয়তন দীর্ঘ, কটিবন্ধে পেশকবজ, মুখ গম্ভীর। হঠাৎ দেখ্‌লেই বোধ হয় মারহাট্টা কিম্বা পাঠান। শকট হোতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি পূর্ব্বমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর। শেষে একটী গোরস্থানের নিকটে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কেন ? উত্তর দিবে

কে? বীরবর স্বগত বাক্যে আপনা আপনি অস্পষ্টস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, আছ কি?

কে তুমি সুন্দরি? কথায় কথায় চোক টেনে টেনে চোলে যাচ্চ, কলসীর জল উথলে উথলে পড়ে যে, এ কি সুলক্ষণ?

সুন্দরী কথা কৈলে না। আমি অবাক।—বঙ্গদেশের আশ্বিন মাস, শরৎ ঋতুর শুভাগমন। রাস্তার ধারে, নদনদীর ধারে কেশে ফুল ফুটেছে; কাঁটালের ঘরে ঘরে দুর্গা প্রতিমা একমেটে হয়েছে, চমৎকার শোভা। একটা মাতাল এসে বোলে গেল, বড় কাঁটালের দুর্গা ঠিক যেন হাস্‌চেন। আমরা সেখান থেকে সোরে এলেম। সাগরতরঙ্গে সংসারের দিন রাত গড়িয়ে গড়িয়ে চোলে গেল, চিত্রকরেরা দুর্গাঠাকুরকে খড়িমাটী রং দিয়ে চিত্র কোরে; নাগপাশে বাঁধা মহিষাসুর তখন দাঁত-খামাটী কোরে সদর্পে বোলে:—

থাক্‌ লো পিশাচি! তুই দুরন্ত রাক্ষসী;
জগতের বীরপনা শিখাইব তোরে!

হুঙ্কারিলা সুরেশ্বরী ভীম বজ্র নাদে।
আমিও শিখাব তোরে বিপুল সংগ্রাম,
রক্তের পিপাসা তোর ভঞ্জিব সমরে!
তিষ্ঠ তিষ্ঠ দুরাত্মন্! গর্জ্জ ততক্ষণ,
যতক্ষণ আমি নাহি মধুপান করি!

সে দিনের কথা গেছে, মায়া ফুরায়েছে।
বীরকুল বীরাঙ্গনা নিদ্রায় আকুল।
আর কি সে দিন ফিরে আসিবে আবার?
ভারতীয় সুখরবি অস্তাচলগত।"

কে কথা কয়, উত্তর পাওয়া যায় না। কাবুলের খাইবর পাশে তিন জন

পথিক। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর; ডাকাতেরা গাড়োয়ানকে মেরে ধোরে গাড়ীর সমস্ত সম্পত্তি লুটপাট কোরে নিয়েছে; গাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক ছিল, যুবতী স্ত্রীলোক, ডাকাতের হাতে সেই স্ত্রীলোকটী ধরা পড়েছে। কিরূপ যুবতী, রাত্রিকালে সেটী ভাল করিয়া জানা গেল না। একবার বিদ্যুতের মত মুখখানি নল্‌পে উঠেছিল, আধখানি ঘোমটা কপালে উঠেছিল, লাবণ্যে আর জ্যোতিতে জানা গিয়াছে, রমণী যুবতী।

যুবতী দেখে মন চঞ্চল হয় কেন? আমি জানি না, মন জানে। সেই স্ত্রীলোক যেন ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে অবনত বদনে অজস্র অশ্রু বর্ষণ কোর্ত্তে লাগ্‌লো, আমি একটী কথাও জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে পাল্লেম না। একটু পরে রমণী চোলে গেল।

ভবধামে গৃহস্থের গৃহগুলি ভবসংসারের অতিথিশালা। অন্য ভাষায় সরাই। যাহারা এই অতিথিশালায় বাস করে, তাহাদের কতই দম্ভ, কতই দর্প, কতই অহঙ্কার! কিছুদিন পরে একে একে সকলেই চলিয়া যায়। কোথায় যায়, কেহই জানে না। কাবুলের পথে সেই যে যুবতী রমণী ডাকাতের হাতে ধরা পড়িয়াছিল, সে যে কোথায় চলিয়া গেল, কিছুই জানা গেল না; আর সেই যে তিন জন পথিক, তাহারাই বা কে কোথায় গেল, তাহারও কিছুই নির্ণয় হইল না। যে পথে সকলে যায়, তাহারাও কি সেই পথে গেল? এ বিষম সমস্যার উত্তর কে দিবে? সকলেই সংসার-পথের পথিক। আজি হউক, কালি হউক, কিম্বা দশদিন পরেই হউক, পথিকেরা অদৃশ্য হইবেই হইবে; কেহই থাকিবে না।

সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। জীবকুল এই সংসারে আসে আর যায়, কেহই থাকিতে আসে না; এই মায়াময় ভবসংসার কাহারও চিরবাসস্থান নহে; চির দিনের বাসের জন্য বিশ্ববিধাতা এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি করেন নাই। এক সময় একদিন রাত্রিকালে এক ব্রাহ্মণ একটী রাজভবনে অতিথি হইয়াছিল। অগ্রে সংবাদ না দিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কিম্বা রাজ বাটীতে প্রবেশ করা রাজাদের আদব কায়দার বিরুদ্ধ; সুতরাং দ্বাররক্ষক সেই ব্রাহ্মণকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ কাঁদিতে

লাগিল। রাজার নিকটে সংবাদ পৌঁছিল, তিনি ব্রাহ্মণকে তাড়াইয়া দিতে হুকুম দিলেন; দ্বারসমীপে গড়াগড়ি দিয়া ব্রাহ্মণ আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। দুই বার তিন বার হজুরে খবর হইল, অবশেষে রাজা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। গর্জ্জনস্বরে কহিলেন, ইহা সরাইখানা নয়, চোর ডাকাতের আশ্রয়স্থানও নয়, তুমি দূর হও! ব্রাহ্মণের রোদন থামিয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া সদর্পে কহিয়া উঠিল, অবশ্যই ইহা সরাইখানা। তুমি এখানে কত দিন?

রাজা আরো রুষ্ট হইয়া কহিলেন, কি! আমি কত দিন? আমার প্রাসাদ, আমার বাসস্থান, আমি কত দিন? চির দিন।

ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া কহিল, তোমার পূর্ব্বে এখানে কে থাকিত?

পিতা।

তিনি এখন কোথায়?

স্বর্গে।

তাঁহার পূর্ব্বে?

তাঁহার পিতা।

তিনি কোথায়?

তিনিও স্বর্গে।

এক দিন তুমিও স্বর্গে যাইবে। তুমিও চিরদিন পৃথিবীতে থাকিবে না। তোমাকেও চলিয়া যাইতে হইবে। তবে ইহা অতিথিশালা নহে কেন? যে আইসে, সেই অতিথি। নিশাকালে বৃক্ষে যেমন পাখীরা বাস করে, প্রভাতে উড়িয়া যায়, এই সংসার সেইরূপ বৃক্ষ, মানুষেরা সেইরূপ পাখী। তবে ইহা সরাইখানা নয় কেন? আর তুমি যে বলিলে চোর ডাকাতের আশ্রয়স্থান নহে, আচ্ছা, কিন্তু বল দেখি, তোমাদের চেয়ে বড় ডাকাত পৃথিবীতে আর কে আছে? দেশের লোকের অর্থ হরণ করিয়া তোমরা রাজা নামে পরিচয় দাও। তুমি ডাকাত নও, আর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিশাকালে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে, তাহাকেই ডাকাত বল? তুমি রাজা? আমি বলি ডাকাতের রাজা। তুমি ডাকাত; তোমার এই রাজপ্রাসাদ একটী সরাইখানা।

ব্রাহ্মণের কথায় রাজার জ্ঞান হইল, ব্রাহ্মণকে সমস্ত রাজ্যসম্পদ দান করিয়া তিনি তীর্থবাসী সন্ন্যাসী হইলেন।

আমরাও এই নবীন নবন্যাসের যেরূপ ভাবপ্রকৃতি দর্শন করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, সংসার একটী সরাইখানা; স্থূল কথায় সরায়ের সংসার। নায়কনায়িকারা এই আছে, এই নাই। কে কখন কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। দেখি দেখি আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অন্বেষণ করিলে নিদর্শন পাওয়া যায় কি না। সেই নিমিত্ত বলিতে হয়, সংসারের সরাই অথবা সরায়ের সংসার।

ষষ্ঠ প্রবাহ।

প্রেমিক প্রেমিকা।

"রণে, বনে, গিরিচূড়ে, জলনিধি জলে,
সর্ব্ব স্থানে চিরসুখী, প্রেমিক প্রেমিকা।"

আর্য্যরত্ন।

সেই না তুমি?

আর এক স্বর উত্তর করিল, চিন্তে কি পার?

যাবত জীবন রবে কারেও ভালবাসিব না।

* * * *

জগতে শিখায়ে দিব কেউ যেন ভালবাসে না।

* * * *

এ ভাই তোমার কি কথা?

তোমারে আমি জীবনসঙ্গিনী বোলে প্রাণের সঙ্গে ফুলমালা গেঁথে তবকে তবকে গলায় পরেছিলাম।—দূর বিশ্বাসঘাতিনি! লহমার মধ্যে ছিঁড়ে দিলি? আর না!

কেন জীবিতেশ্বর! তোমারি ত আমি আছি!

সে কথায় মন মোহিত হতে পারে, প্রণয় মোহিত হয় না। প্রণয়ের ভাণ নেই। এক দিন তোরে আমি ভালবেসেছিলেম, সেই ভালবাসা তুই ভাল কোরে দিলি! কে তুই রাক্ষসি। এখনও আমি তোরে সেই চক্ষে দেখি,—কিন্তু বিষে বিষে নিশ্বাস পড়ে।

কত ভালবাসি তোরে হৃদয় ঈশ্বরি!
কহিতে পারি না সখি! জীবনের সখী
ছিলি তুই অভাগার জীবনের সাথে,
কার হয়ে গেলি প্রিয়ে বুঝিতে না পারি!
আকার ইঙ্গিতে আমি যত জানিয়াছি,
ধন্য প্রেম! প্রেম পদে প্রণিপাত করি!
প্রণয়ের পরিশোধ অনন্ত পিপাসা!
সে কি কথা? প্রণয়ের প্রতিশোধ আছে?
জানি না ত! অহঙ্কার কত দূরে যায়?
দম্ভ অরি দম্ভদর্প করিবেন নাশ।
তোমাতে আমাতে হবে অনন্ত বিচ্ছেদ!
বড় অহঙ্কার তোর ওলো গরবিণি!
রবে না এ দর্প তোর ভব দর্প-হারী
চূর্ণিবেন সর্ব্ব দর্প চক্ষের নিমেষে।
দর্প ত থাকে না কারো, নশ্বর সংসারে।
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সংহার তাহার॥

সত্যভামার দর্পচূর্ণপ্রসঙ্গে পাঁচালীওয়ালা দাশরথী রায় হাস্‌তে হাস্‌তে বোলেছিলেন,—

"দর্প ঘটে যার, রাজা কি প্রজার,
নর কিম্বা সুরাসুর।
গোলোক বিহারী, হরি দর্পহারী,
সে দর্প করেন চূর॥"

তোর সেই দশা হবে।

যে গ্রামে আমরা এসেছি, সে গ্রামের নাম উষাখণ্ড। গ্রামবাসীরা চাসবাস কোরে জীবিকা নির্ব্বাহ্ করে। গ্রাম বটে, কিন্তু একধারে একটী সরাই আছে। সেই সরাইখানার দরজায় রাত্রি ৯টার পর একখানি গাড়ী, গাড়ীতে কে? রাজস্থানের একজন বাবা। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে সরাইয়ে প্রবেশ কোল্লেন, লোকেরা চমকিত।—প্রবেশকারির অবয়ব সুন্দর, গঠন নাতিখর্ব্ব, মাথায় দীর্ঘকেশ, পরিধান লাল বসন, গোঁফ দাড়ী নাই। নাপিত বলে, যে ভাগ্যবান পুরুষ সিংহাসনে বসেন, তাঁর দাড়ীতে একটীও চুল থাকে না, দাড়ী যেন মাখমের মত মোলায়েম; কিন্তু যে সকল শ্মশ্রুধারী সেনাপতি তরবারিহস্তে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাঁদের চুল বড় কড়া; নাপিতকে বড় কষ্ট পাইতে হয়। সেই পাপে দাড়ী-গোঁফের অব্যাহত রাজত্ব।

আমাদের আখ্যায়িকার নায়ক একজন বীরপুরুষ,—বীরভূমের বীর-পুরুষ নয়, পত্নীকে তিনি মেয়ে বলেন না; নায়িকাটীও বীরপত্নী, বীরাঙ্গনা; কিন্তু সত্য কি সেই বীরাঙ্গনা বীরপুরুষে অনুরতা? আমাদের সাবিত্রী, দময়ন্তী আর বেহুলার মত সত্য কি সেই বীরাঙ্গনা যথার্থ সতীত্বধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন? পরিচয়ে পরিচয়। পরিচয় কি প্রকারে হইতে পারে? এক বর্ষ, দশ বর্ষ, শত বর্ষ পূর্ব্বে,—(কলিযুগে মানুষের যদি শত বর্ষ পরমায়ু হয়)—তাহারও পূর্ব্বে যদি কখন তোমার সঙ্গে আমার দর্শন হইয়া থাকে, সে পরিচয় আমাকে ভুলিতে হইবে না। কিন্তু পরিচয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের একটু ইতরবিশেষ আছে যখন সময় আসিবে, তখন আমি জানিব, তুমি জানিবে, পরিচয়ে পরিচয়।

সপ্তম প্রবাহ।

সতী।

"রে রে দক্ষ সতী দে, সতী দে, সতী দে।
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতীতে
রে রে দক্ষ সতী দে, সতী দে, সতী দে।"

ভারতচন্দ্র।

সম্বন্ধ হয়ে গেল, বিবাহ হয়ে গেল, যুগলে যুগল মিলন; কিন্তু এ মিলন কি চিরস্থায়ী? হইতে পারে না! মানুষের মন বড় চঞ্চল, প্রণয়ের ধর্ম্ম নিতান্ত অস্থির। তুমি যারে ভালবাস, সে হয় ত তোমারে ভালবাসে না, তুমি যারে ভালবাস, সে হয় ত মনে মনে তোমারে ঘৃণা করে। তোমারে যে ভালবাসে, তুমি হয় ত তারে ভালবাসিতে পার না। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তোমাদের দুর্ভাগ্য, বিধাতা যোড়া যোড়া সৃজন করেছেন, যোড়াতে তিন নাই, চার নাই, পাঁচ নাই, বেশী নাই, সাক্ষী প্রজাপতি আর শামুক। তবে তুমি কাঁদ কেন? উত্তর দিতে জান না। এক সময় আমি তোমার প্রতিনিধি হয়ে যোড়া কথার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়ে তোমার চক্ষের জল মার্জ্জন কোরে দিব।

সহরে নূতন লোক দেখ্‌লে দোকানের সরকার, জাহাজের সরকার, সদাগরি দালাল, উকীলের মোক্তার, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে শ্মশানক্ষেত্রের শকুনীর মত উৎপাত আরম্ভ করে। গন্ধ চাই। তুমি আমি যদি আসি, অর্থশূন্য, কেউ ঘেঁস্‌বে না। কুচবিহারের রাজা, পাতিয়ালার মহারাজ, মুরশিদাবাদের নবাব, এই রকমের বড় বড় কাঁটাল সহরে যদি আসেন, নীলকৃষ্ণ মাছিরা ভন্ ভন্ শব্দে সেই সকল কাঁটালের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। চায় কি? একটু একটু রস। সন্ধ্যাকালে শেয়াল আসে। কি করে? তারা কাঁটালের ভুতুড়ি শুদ্ধ টানে।

বোল্‌তে বোল্‌তে ভুলে গেলেম। বাঙ্গালায় শরৎ ঋতুর আবির্ভাব, মহালয়া অমাবস্যা পার হয়ে গেল, সাবর্ণ চৌধুরীর কুলপ্রথায় প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ। ষষ্ঠ রাত্রে ষষ্ঠী, অধিবাস, অভিষেক, বোধন। বাইনাচ বন্ধ। মহামায়ার আবির্ভাবে বড় মানুষের বাড়ী আনন্দক্ষেত্র। আগে আমরা শুন্‌তেম, বুকের নীচে সোণা ধারণ করা বড় পাপ, কিন্তু এখন সোণার চন্দ্রহার, সোণার মল, বড় মানুষের ঐশ্বর্য্য দেখাবার প্রধান উপকরণ।

হা জগদীশ! তোমার অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত খেলা। তুচ্ছ মানব তাহা নিরূপণ কোর্ত্তে জানে না। খেয়া হারাই, খেয়া পাই, সহায় একমাত্র তুমি, আর আকাশের সেই প্রাণাধিকা কুমারী কল্পনাসুন্দরী।

আয় লো কল্পনা সতি! হৃদয় আকাশে,
স্নেহ ভাবে, প্রেমভাবে, প্রিয়ভাবে ডাকি,
অন্ধকার হৃদাকাশ আলো কর এসে।
কোন্ পল্লীগ্রামে আমি পশিয়া ছিলাম,
জান কি তা? সঙ্গে সঙ্গে আছ তুমি সদা;
কেন না জানিবে দেবি! কি গতি আমার?
ছোট পথ, বন বৃক্ষ, ছোট ছোট গাছ,
কত ফল কত ফুল ফলিছে ফুটিছে,
কে দিবে তাহার সীমা একা তুমি পার।
বিশ্বময়ি! যাচি আমি তব পাদুখানি।
কুক্ষণে সংসারক্ষেত্রে করেছি প্রবেশ,
কুক্ষণে দম্পতী প্রেমে মজিয়াছে মন,
আর না, সকল আমি করি পরিহার,
সংসারে উদাসী হয়ে হব বনবাসী॥

এসো মা কল্পনা সতি! হৃদয় মন্দিরে।
তোমারে সহায় করি যাব দূর দেশে;
নদ, নদী, গিরিগুহা অতিক্রম করি,
পশিব অজ্ঞাত রাজ্যে, যে রাজ্যের রাজা
পালিছেন প্রজাবর্গে দয়া-মমতায়,
আছে যথা প্রজাপুঞ্জ নিত্য শান্তি-সুখে,
সেই দেশে যাব আমি তোমার প্রসাদে।

এই কি সে দেশ? যথা নাহি কোলাহল,
না জ্বলে বিদ্রোহ-বহ্নি, সংসার-কলহ,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল স্থান নাহি পায়
যেখানে, সেখানে যাব উড়িব আকাশে।
নমোনমঃ মায়াদেবী আকাশনন্দিনী
কল্পনে! (ক্ষমিও মোরে এই ভিক্ষা করি,
পদাঘাত করি আজি ব্যাকরণ শিরে।)
এসো মা হৃদয়াকাশে সহায়ে তোমার,
ডুবিব জলধি জলে উঠিব গগনে,
দগ্ধ হব ক্ষণে ক্ষণে জ্বলন্ত পাবকে,
তুঙ্গ শৃঙ্গ পরে সতি উঠি একবার,
পুনর্ব্বার সন্তরিব গিরিনদী স্রোতে।
কারে বা কি বলি দেবি হয়েছ বধিরা,
বধির হয়েছি আমি তোমার বচন
পশে না শ্রবণে যেন; কিচিমিচি রব।
কি শুনি কি বুঝি সতী, বুঝাও আমায়।

সব আমি বুঝি তবু কৃপা ভিক্ষা করি,
তব কৃপা বিনা দেবি সব অন্ধকার।
পশিয়াছি বিশ্বধামে কালিকার ছেলে,
কার বিশ্ব বিশ্বময়ি জান তুমি তাহা।
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর অনন্ত জগতে
খেলেন বিশ্বের খেলা। লীলা খেলাইতে
আবির্ভূত বিশ্বধামে ; নিত্যই নূতন।
কে তুমি প্রকৃতি সতী তব মায়া-কোলে
কত ছেলে খেলা করে হাসে আর কাঁদে,
সবারে সমান ভাল বাস মা জননি!
কেবা শান্ত কে দুরন্ত কর না বিচার,
তোমার অনন্ত দয়া বিখ্যাত জগতে।
অপরাধী হই যদি ক্ষমা ভিক্ষা করি,
অভয়ে! অভয় পদে করি প্রণিপাত।

এই কি সে দেশ সাধ্বি! যে দেশে এখন
পশিয়াছি লীলা খেলা দেখিবার তরে,
এই কি সে দেশ? হাহা! বাহবা তোমারে!
বেদিনী হয়েছ বুড়ি! এত ভোজ বাজী
কোথা শিখেছিলে আগে? দেখাইছ খেলা;
ধাঁধাইছ নর লোকে বিকাসিয়া মায়া?
হায় সতি জিনিয়াছ তুমি ভানুমতী।
এ কি লজ্জা! ছি ছি কথা! ভানুমতী তুমি?
কতশত ভানুমতী জঠরে তোমার

জন্মিয়াছে মরিয়াছে সংখ্যা নাহি তার।
সে কি ভানুমতি! আজি এ লজ্জা রাখিতে
কোথায় পাইবে স্থান? কিন্তু তব দোষে
সর্ব্বনাশি! কেন মোরে কৃপণতা কর?
হয়ে থাকি দুষী, আজি দয়া ভিক্ষা করি,
কৃপা করি কৃপাময়ি হও মা সদয়।

———

অষ্টম প্রবাহ।

ছোট শরৎ।

"গেল অমঙ্গল আজি মঙ্গলারি আগমনে।
কর মঙ্গলাচরণ যত কুলকন্যাগণে॥"

রঘুনন্দন।

আশ্বিন মাস, শরৎকাল। গুড় গুড়শব্দে মেঘ ডাক্‌ছে, কখন আলো, কখন অন্ধকার। শরৎ কালে শিল পড়ে না। আমি তখন লুব্ধ আশ্বাসে কোথায় কোথায় পরিভ্রমণ কোরে বেড়াই, শান্তি পাই না। স্রোতস্বতী-তীরে, পর্ব্বতশিখরে, বহু জনাকীর্ণ জনপদে, নিবিড় অরণ্যে, শান্তি অন্বেষণ করেছি, শান্তি পাই নাই।

এ কথা বলে কে? মতিহারী প্রবাসী ত্রয়োবিংশতি বর্ষীয় এক যুবা। সেই যুবা একটী দেবদারু বৃক্ষতলে। ঝুপ্ ঝুপ্ কোরে বৃষ্টি পোড়্‌ছে; বৃক্ষ-তলবাসীর অঙ্গ-বস্ত্রের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে, নিরুপায়। পথিক উদাসীন নয়, প্রবাসী। নিবাস বিহারে; উপস্থিত বঙ্গদেশের বাঁকুড়া জেলায়।

শরৎ কালের বৃষ্টি অধিকক্ষণ থাকে না, শরতের জলদগর্জ্জন শ্রবণে সুস্বর বর্ষণ করে; কিন্তু সব সময় বৃষ্টি হয় না। এই দেখি মেঘ, এই দেখি ধোঁয়া, এই দেখি অন্ধকার, এই শুনি মেঘের ঘর্ষণে ভীমনাদ, এই হাসে সৌদামিনী, কিন্তু একটু পরেই পরিষ্কার। পরিষ্কার আকাশে নির্ম্মল প্রভাকর অল্পে অল্পে দেখা দিয়ে অস্তশিখরে গড়িয়ে পোড়্লেন। দুই একটী কোরে অসংখ্য নক্ষত্র অনন্ত গগনে দীপ্তি বিকাস কোর্ত্তে লাগ্লো, এ বড় চমৎকার শোভা! পৃথিবীর গৃহস্থ কুলাঙ্গনারা সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালে, গগনাঙ্গনারা গগনাঙ্গনে তারাবলিরূপ অসংখ্য প্রদীপ জ্বেলে সহাস্যবদনে সহাস্য নয়নে পৃথিবী দর্শন করে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমাদের কুলকামিনীগণ উষাকালে গঙ্গাস্নান করেন, দক্ষকন্যারা নিশাকালে নদীতে ঝাঁপ দেন। নদীজলে নক্ষত্রেরা হীরকালঙ্কার পরিধান কোরে পবনের সঙ্গে নেচে নেচে হিল্লোলে হিল্লোলে ঝক্‌মক্ করে। কি লজ্জা! কে কারে চুমো খায়, কিছুই বোঝা যায় না।

বৃক্ষতলে পথিক। সিক্ত মস্তক, সিক্ত গাত্র, সিক্ত বাস, বৃক্ষতলে পথিক। গঠন নাতিখর্ব্ব, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, একটু ভুঁড়ি আছে, ঝাঁক্ড়া চুল, টানা নাক, দিব্য নেত্র, দোষের মধ্যে ঠোঁট মোটা। এই খুঁতটী না থাক্লে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে পথিক পুরুষ দিব্য সুশ্রী দেখাতেন। ঠোঁট মোটা বড় দোষ। ঠোঁট মোটা লোকেরা সাধে, অসাধে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, যখন হাসে, তখন সব দাঁতগুলি চক্ চক্ কোরে উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাঠক মহাশয়! কলিকাতার ফিরিঙ্গির মুখে "শূয়ার কি চানা" শ্রবণ কোরে থাক্বেন, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। মূর্খের জন্য যদি প্রয়োজন থাকে, শূকরীর বাচ্চা। লোকে অসভ্য মনে কোর্বে বোলে রসিক পুরুষেরা হাঁ লুকায়ে সরু করে, দাঁত ঢাকায় চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতির অপমান করা কাহার সাধ্য? হাসিতে বিজলি খেলেই খেলে।

ছোট শরৎ এই রকমে আসে আর যায়, কাশকুসুম বিকসিত হয়, ডাহুক ডাহুকী ডাকে। জলে হংস হংসী খেলা করে; স্বভাবের শোভা দেখে আনন্দে আনন্দে আমি বলি ছোট শরৎ।

নবম প্রবাহ।

নূতন দর্শন।

"সখি রে!
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে;
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।"
মাইকেল।

আশ্বিন মাসের শুক্ল সপ্তমী, ভাগ্যবানের ভবনে মহামায়ার আগমন, শারদীয়া দুর্গাপূজা। এমন উৎসব বঙ্গদেশে আর নাই। নবদ্বীপের এক-জন অধিকারী কবি যথার্থই বোলেছিলেন;—

"এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ, তবু রঙ্গ ভরা।"

বাইশ বৎসর বয়সে সেই বঙ্গকবি ইহ সংসার পরিত্যাগ কোরে নিত্য-ধামে প্রস্থান করেছেন; কিন্তু আমরা ভুলি নাই। যে পথিক আজ দেবদারু বৃক্ষতলে, সেই পথিকের চেহারাতে সেই কবির প্রতিবিম্ব দেখা যায়, পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয়ে। আজি আমি যেন জাতিস্মর।

রাত্রি এক প্রহর। সিক্তবস্ত্র পথিক কম্পিত গাত্রে এক জন গৃহস্থের দ্বারদেশে উপস্থিত। ডাকিলেন, "আশ্রয় দাও, নিরাশ্রয়।" কেহ কথা কহিল না। পুনরায় ডাকিলেন, "নিরাশ্রয় পথিক; রাত্রের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা।"

কেহই উত্তর দিল না।

কেন বল দেখি? বহু-বিস্তৃত-জনপদ; বহু লোকের বাস; এত বাস থাকতে সেই নিরাশ্রয় পথিক একদ্বারে ধন্না দিয়েছিল কেন? তারি মুখে তারি কথার মীমাংসা হবে। সেই বাড়ীতে হয় ত তার এক দিনের ভাল-বাসার কোন একটী বস্তু ছিল। আছে কি নাই, আমি জানি না। যে ব্যক্তি দ্বারে, সে হয় ত জানে না, কিন্তু প্রণয় প্রগাঢ়; প্রণয় অন্ধ।

প্রণয় পূর্ব্বের কথা স্মরণ করে; অকপট প্রণয়ী যুবা প্রণয়িনীর আবাসগৃহের দ্বারদেশে সমুপস্থিত!

ছিঃ ছিঃ ছি! তুমি যারে ভালবাস, সে তোমারে চায় না। তবে এত অনুরাগ কি জন্য? ভ্রমর ভোঁ কোরে উড়ে যায়, তবু পদ্মিনী তারে মধু দান করে, কোন ন্যায় শাস্ত্রে এ তর্কের সিদ্ধান্ত হয় না।

বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ আছে, নক্ষত্র নাই, চন্দ্র উদয় হইবার তিথিযোগ আছে কি না, মনে পড়ে না, পৃথিবী অন্ধকার। পথিককে দুয়ারে দেখে হাসিও আসে, দুঃখও হয়। প্রেমে মানুষকে রাজা করে, ফকিরও করে। এই যে জলে ভিজা বৃক্ষতলবাসী পথিক, আড়াই বৎসর পূর্ব্বে সে পথিক প্রেম শিক্ষা করেছিল। অশন, বসন, শয়ন একত্র, হা অভাগা! তোমার জানা ছিল না, জগৎসৃষ্টি যোড়া যোড়া, বিধাতা যত যোড়া সৃজন করেছেন, তার ভিতর কখনও বিযোড় দেখি নাই, যেখানে বিযোড়, সেই স্থানেই অলক্ষণ, সেইখানেই অমঙ্গল।

অন্ধকারে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে কম্পান্বিত পথিক রোদনের সুরে মধ্যমানে একটী গান ধরেছেন;—

তোরে ভালবেসে প্রিয়ে, ভালবাসা ভুলে গেছি।
আপনা পাশরি আমি, মনে মনে মরে আছি॥
যে দিনে তোমারি সনে, মিলন নেত্র মিলনে,
এয়োদশ বর্ষ পরে সে দিন কি দিন;—
সাধনেরি ধন তুমি, সাধনে পেয়েছি আমি,
সে দিন ভুলিয়ে গেলি, কপালে আমার ঃ—
যরি যা কপালে থাকে, সময়ে তা ঘটে থাকে,
তুমি প্রাণেশ্বরি সদা থাকিবে হৃদয়ে,—
ভুলিব না ভুলিব না, ভোল যদি ছাড়িব না,
এই তো প্রতিজ্ঞা মম, হৃদয় ঈশ্বরি!
আশা-প্রেম-তরুতলে হত্যা দিয়ে পড়ে আছি॥

এটী কার কথা ?

প্রেমিকের।

প্রেমিক কে ?

যে অকপট প্রেম জানে, সেই প্রেমিক। হতাশ প্রেমিব বিরহী, তার মনের কথা তুমি আমি জানি না। দরজা খুলে দিলে না, তথাপি সেই বিরহী প্রেমিক দরজায়। মন একটী নদী, মন একটী সমুদ্র, নদীতে ঢেউ, সমুদ্রে তরঙ্গ।

আবার মেঘ, আবাব বৃষ্টি, আবার বিদ্যুতেব চক্‌মকি, আবার বজ্রধ্বনি। প্রেমপিপাসী হতাশ পথিক কি যে জেনেছে, কি যে বুঝেছে, কেন সে সেখানে, কে বোল্‌তে পারে? কিন্তু বারম্বার ডাক্‌ছে কারে? আশা-প্রতিমারে। ধ্যান প্রতিমায়। ধ্যানে বলে :—

বড় ভালবাসি তোরে কল্পনাসুন্দরি !
ডাকে নাই, বলে নাই, তবু আসিয়াছি।
কি ক্ষণে তোমারে হেরে ভুলিয়াছে চিত,
পারি না বলিতে সখি ! স্বেচ্ছাচারী তুমি,
ইচ্ছামত কার্য্য কর যথাতথা যাও,
আকাশে, পাতালে, মর্ত্তে, সদা তব গতি,
তবু আমি রাঙা পদে চির ক্রীতদাস।
লয়েছি শরণ যাহা ভুলিব না কভু,
হৃদয় প্রতিমা তুমি আকাশনন্দিনি !
আশার আশার তুমি আশার প্রতিমা।

এ পথিক এখানে দাঁড়াইয়ে কেন? এই রাত্রিকাল, এই ঘোর অন্ধকার, এই মেঘ, এই বৃষ্টি, কার অপেক্ষায় এখানে নিরিবিলি অপেক্ষা কোচ্ছে? পাঠক মহাশয়! একটু সোরে আসুন। ভূতপ্রেত নয়, দেবতা উপদেবতা নয়, মানুষ।—মানুষে মানুষকে ভয় কোর্ত্তে হয় না, একটু সোরে আসুন।

পথিক একাকী অন্ধকারে দাঁড়ায়ে কি কথা বোলছে? কার আশ্বাসে আশ্বাসিত হয়ে এত কষ্টেও পুলকিত হোচ্ছে, একবার জানা চাই।

"তুমি কি ভিকারী?"

"উত্তর পাওয়া গেল না।"

অন্ধকারে মস্তক সঞ্চালিত হলো, ভাবে বুঝা গেল, ভিকারী।

"কিন্তু কিসের?"

গৃহস্থেরা দ্বারে ভিকারীকে মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা দেয়, সহরের বড়মানুষ দেউড়িব দরওয়ানের হাতে কালে ভদ্রে এক এক কড়া কড়ি ভিক্ষা দেন। তুমি কি তাই চাও?

আর ত মাথা নাড়িল না, তবে এ মুষ্টি ভিক্ষাব ভিকারী নয়, তবে এ কড়া কড়ির ভিকারী নয়, সতীত্বের ভিকারী, মনের ভিকারী, প্রেমের ভিকারী।

প্রেম কি আগে জানা ছিল? যে সে দ্বারে দ্বারে, সে দ্বারে তার প্রেমের পাত্রি কেউ কি কখন ছিল? প্রেমিক সে কথা বোল্‌তে পারে, অদৃশ্য প্রেমিকা, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে জানে। সতী কল্পনাসুন্দরি! তুমি কি আমার কথার উত্তর দিতে চান না? পথিক হাঁ করা, ঠিক একটা গাধা, প্রণয়ে লোক গাধা হয়, এ কথা সত্য, কিন্তু যেখানে অকৃত্রিম অকপট প্রণয়, সেখানে আমরা গাধাকে ঘোড়া কোর্ত্তে পারি। ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুর পবনে, বাষ্পে, জলে, অনলে, রেলের গাড়ী চালাচ্ছেন, জলে কলে জাহাজ চালাচ্ছেন কিন্তু প্রণয়ী গাধা ওরকে ঘোড়া, বাতাশের আগে ছুটে যায়, প্রণয় রথে চড়, পরীক্ষা করে দেখ, বিদ্যুৎ তোমার কাছে হার মেনে যাবে।

প্রণয়ী কি কথা বোল্‌ছে? পূর্ব্ব আকাশে বিদ্যুৎ নাচ্চে, বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে। ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার এক দিনের শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বীরভূমের রসকবি জয়দেব আক্ষেপ উক্তিতে বলেছিলেন; —

"শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর কল্পম্।"

ওস্তাদী কবিরা এই কথাব ভাষা কোরে গানের স্বরে ব্যাখ্যা করেছিলেন, "তোমায় কমলিনী কাল মেঘ দেখে কৃষ্ণ বলে পোর্ত্তে যায়।"

এ প্রেমিক ঠিক তাই। স্বগত বাক্যে পথিকের মুখ ফুটিল। আকাশে চপলা চমকিল, গৃহস্থের দ্বার অবারিত। পল্লীগ্রামের গৃহস্থ, রাজা নয়, জমিদার নয়, দেউড়িতে দরওয়ান নাই, কিন্তু আলো আছে। নিরাশ্রয় পথিক সেই আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে, দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কাতরোক্তি বোল্‌ছে ;—

হা প্রেয়সি ! তুমি মম সাধনের ধন !
দ্বাদশ বরষ কাল উপাসনা করি,
ডুবিয়ে সাগর তলে রত্ন অন্বেষিয়া,
পেয়েছিনু খুঁজি খুঁজি একটী মুকুতা,
যে মুকুতা দূর বনে ব্যাধের পতিনী,
কঠিন বদরী বলি ফেলেছিল দূরে,
সেই মতি তুমি। প্রিয়ে মানসে আমার
বিরাজিছ অহরহ চন্দ্রসূর্য্য সম,
ভুলিব কি ? তুমি কি রে ভুলিবার ধন ?
নিদয় হয়েছ তুমি ? কত দিন আঁখি
হেরে নাই ও প্রতিমা দেবের দুর্লভ,
বাসনা বাসিতে তাই হইয়ে উদাস
এসেছি তোমার দ্বারে দেখ আসি শশি।
এ কি কথা! অকস্মাৎ শশী নাম কেন ?
কত কাল ভুলেছিনু ! এ পাপ-রসনা
কেন আজি উচ্চারিল সেই প্রিয় শশী ?
শশি ! তুমি পূর্ণ শশী হৃদয় আকাশে !
এক দিন উঠেছিলে ; সে দিন ত নাই !
কোথায় মিলায়ে গেছ ? মনে নাহি পড়ে !

ঘোর অমাবস্যা নিশা আমার হৃদয়!
ঝিকি মিকি করিতেছে অসংখ্য তারকা,
ঝকিতেছে নীলাকাশ তারাবলি তেজে,
আমার হৃদয় কিন্তু ঘোর অন্ধকারে
সমাবৃত সতী লক্ষি! বিহনে তোমার!
কার পানে চেয়ে আছি ভিকারীর মত
দাঁড়াইয়ে দুয়ারে তোর ওলো সর্ব্বনাশি!
দেখা দেও, দেখা দেও, বারেকের তরে,
অন্য ভিক্ষা নাহি চাই, প্রেমের ভিকারী।

উপরের কক্ষের একটী গবাক্ষ উদ্ঘাটীত হয়ে গেল, ঘরে আলো ছিল, কে জানে সেজ কি প্রদীপ, বাতাসে সেই আলো কাঁপ্‌লো, প্রতিমা অচঞ্চলা, দীর্ঘকেশ, বেণিবদ্ধ, গৌরবর্ণ আভা, স্বর্ণ প্রতিভ, কাণের পাশে অলক-শ্রেণী ভ্রমর পংক্তির মত, কৃষ্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল। দুষ্ট পবন বড় বেহায়া, বড়ই নির্লজ্জ, সেই স্বর্ণ প্রতিমার কৃষ্ণকুন্তলের অলকদাম ধীরে ধীরে বিকম্পিত করে সুগন্ধ সুকোমল গণ্ডস্থল স্পর্শ কোর্‌ছে, লজ্জা যদি বারণ কোরে না দিত, আরও খোলোসা করে আরও কিছু বোল্‌তে পার্ত্তেম, কিন্তু আর না, এই পর্য্যন্তই ভাল। অলকের কোলে মেঘঢাকা চাঁদের মত দুকাণে দুটী মণিময় দুল। নাকে একটী সূর্য্যপ্রভ নলক।

দৃষ্টি কোন্ দিকে? রাস্তার পথিক অন্ধকারে। যারা আলোতে থাকে, তারা আপনাকে আপনি দেখ্‌তে পায়, অন্ধকারের লোকে অন্ধকারের বস্তু ভাল দেখ্‌তে পায় না, কল্পিত আলোকে পথিক দেখ্‌তে পাচ্চে, সুন্দরী প্রতিমা, কিন্তু প্রতিমা দেখ্‌তে পাচ্চে না, পথে কে? বিরাগী বিদেশী।

এ রহস্য অতি চমৎকার! যে যারে ভাল বাসে, সে তারে অদর্শনেও মনে মনে দেখে; তার প্রমাণ কবিবাক্য :—

"তুমি যদি ভোল সখি! আমি কভু না ভুলিব।
হৃদয় দর্পণে সদা মুখশশী নিহারিব॥

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি, প্রেমের লাগি উদাসী,
সুখে দুখে সর্ব্বনাশি! তবু তোমারে তুষিব॥"

এই যে পদাবলী, এটী অবশ্যই কোন ভাবুক প্রেমিকের রচনা।

গবাক্ষবিহারিণী পথবিহারীকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু প্রেমিকের চক্ষু দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ন্যায় প্রেমিকার মুখ পানে স্থির থাকে, কে কাহাকে দেখিল? সাধারণ চক্ষু সেটী অনুভব কোর্ত্তে অক্ষম।

'আলোতে যে পদার্থ থাকে, অন্ধকারের লোকে সে পদার্থ দেখিতে পায়, কিন্তু আলোতে থেকেও অন্ধকারের বস্তুকে ভাল কোরে দেখা যায় না। একজন বিলাতি বিখ্যাত কবি লণ্ডন সহরের এক নির্জ্জন পথে রাত্রিকালে গমন করিতেছিলেন, পচা খড়, পচা গোবর, আর পচা কর্দ্দমে জানুদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতেছিল। বড় দুঃখে, বড় আক্ষেপে মনে মনে তিনি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজধানীতে রাত্রিকালে রাজপথে কি আলো জ্বলে না? জ্বলে বৈ কি। যেখানে সেখানে আলো জ্বলে, কিন্তু কেন জ্বলে জান? অন্ধকারে অন্ধকার ভাল দেখা যায় না, সেই জন্য,—অন্ধকারকে ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য রাজপথের দূরে দূরে বহুদূর অন্তরে এক একটা আলো জ্বলে। আজ আমরা যেন সেই রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। কল্পনা আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন, আমি যেন অন্ধ। তথাপি,—

পাখা নাই তবু আমি উড়িবারে পারি,
অনন্ত আকাশ পথে বিহঙ্গের মত,
ডুবিবারে পারি আমি অগাধ সাগরে,
দগ্ধিভূত হতে পারি জ্বলন্ত পাবকে,
এমনি ধরণে সৃষ্টি প্রেমের সংসার।
কেবা কারে দেখিতেছে কে ভাবিছে কারে,
কে জানে কাহার কিবা সব ফক্কিকার?
এক দিন প্রাণেশ্বরি! প্রাণেশ্বরী তুমি,

ছি! ছি! ছি! ছি! একি লজ্জা! প্রাণেশ্বরী কথা?
কারে বা বিলাই আমি বিশ্বাস ঘাতিনি!
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের শিরে?
কুকুরে বসাও তুমি রাজ সিংহাসনে?
আর না। রাক্ষসি! তুই পিশাচী পামরি!
ভালবাসা প্রেম ব্রত উজ্জাপন আজি!
ভাল কি রে বেসেছিলি এক রাত্রি যোগে,
স্নেহ দয়া মায়া পাশ এক রাত্রি কালে
সকলি মিলিয়াছিল মনে মন গাঁথা।
ছিঁড়ে দিলি মায়াবিনি মনের বন্ধন?
দেখিতে এসেছি তোরে বহুদিন পরে!
লুকায়ে রাখিছে তোরে প্রদীপের আভা,
আমি কিন্তু প্রেম চক্ষে ওরূপ নিহারি।
জ্বলিতেছি হৃদানলে জরিতেছি বিষে,
বড়ই বড়াই তোর সতী সাধ্বী বলি;
সর্ব্বনাশি! এই কি লো সতীপনা তোর?
আফ্রিকা নিবাসী মূঢ়ে করি অঙ্গীকার,
পতিব্রতা ধর্ম্মভঙ্গ করে যে পিশাচী,
শত শত পদাঘাত করি তার শিরে।
ওথেলোর প্রেম-ছুরি সাক্ষী আছে তার।
দেখিতে এসেছি তোরে, প্রাণের প্রতিমা!
দেখা দিতে আসি নাই ভালবাসি বোলে।

আবার অন্ধকার। ঘরে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, নির্ব্বাপিত হয়ে গেল।

কামিনী গবাক্ষে, ভিকারী পথে, এ রহস্য কেমন ? কবে কোথায় এ যুগল নায়ক-নায়িকার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল, আমরা উত্তর দিতে পারি না। হয় প্রেমিক, নয় প্রেমিকা, এ প্রশ্নের উত্তর দিবার অধিকারী কিম্বা অধিকারিণী। সুতরাং তাই, ব্যাকরণের গৌরবে শেষের কথাটী অধি-কারিণী। প্রণয়ে কি অন্ধকার আছে ? ভুল কথা। প্রণয়ে অন্ধকার থাকে না। চক্ষে চক্ষে দেখা না হলেও প্রণয়ে দিবানিশি আলো জলে। রাত্রি অন্ধকার। যে রাত্রে অমাবস্যা, সে রাত্রে কি জলে কুমুদিনী ফোটে না ? ফোটে, কিন্তু কার জন্য ? গগনে কুমুদিনীনায়ক শশধরের অভাব। কোন্ মূর্খ এ অভাব বলে ? কুমুদী-হৃদয়ে নিশামণি সর্ব্বদাই বিরাজমান। আলো অন্ধকার কুমুদিনী জানে না। আকাশে যদি মেঘ থাকে, সূর্য্য যদি মেঘে ঢাকা থাকেন তা বোলে কি দিবাভাগে কমলিনী হাসে না ? কোন্ মূর্খ কোন্ কালে দেখেছে দিবাভাগে কমলিনী বিষণ্ণ ? না ভাই, তা নয়। যে যার প্রণয়ে মুগ্ধ সে ভাবে সর্ব্বদাই দেখে।

ভট্টাচার্য্যের সরোবরকূলে দুপাশে দুটী বকুলগাছ, একটী বৃক্ষতলে নিরাশ প্রেমিক। বৃষ্টির জলে ভিজেছে, থরহরি কাঁপছে, তবু বকুল তলায় দাঁড়াইয়ে। এমন সময়ে গুণাকর কবিবর ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী কোথায় ?

দেখি দেখি একবার আহ্বান করি :—

প্রণয় সঙ্গিনী সখি ! আয়লো মালিনি !
রথ পাশে দাঁড়া এসে, হেলায়ে অঙ্গুলী
উভয়ে দেখায়ে দাও যুগল মিলন।
অন্ধকার বুঝি ? তাতে কিবা ক্ষতি কার ?
প্রণয়ী হৃদয়ে সখি বিদ্যুৎ প্রভাবে
সাপের মাণিক সম আলো জ্বলে সদা
যথা অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ত্রিলোচন শিরে,
এই তো প্রেমের ভাব সৃষ্টি বিধাতার।
যে প্রেমে শঙ্কর যোগী সতী দাক্ষায়ণী

যে প্রেমে ত্যজিলা প্রাণ পতি নিন্দা শুনি,
যে প্রেমে বেহুলা সতী নখিন্দরে লয়ে,
ভেসেছিলা অভাগিনী কলার মান্দাসে,
যে প্রেমে সাবিত্রী সতী ধর্ম্মরাজ মুখে,
বাঁচাইলা মরা পতি যে প্রেম ভিকারী
কলিগ্রস্ত নলরাজ পরের আশ্রয়ে,
পুনঃ স্বয়ম্বর কথা দূতমুখে শুনি,
স্বয়ম্বরে উপস্থিত দময়ন্তী আশে,
যে প্রেমে ভিকারী হর রক্তবীজ রণে,
শুয়েছিলা চামুণ্ডার শ্রীচরণতলে।
যে প্রেমে রাঘবানন্দ অযোধ্যার রাজা,
সীতা উদ্ধারের হেতু সহায়ি বানর,
সাগরে বাঁধিয়া সেতু নাশিলা রাক্ষসে।
যে প্রেমে ভব সংসারে ভোজবাজী প্রায়
ঘূরিছে মানব-বৃন্দ মায়ার প্রভাবে,
সেই এক প্রেম। আরো, আরো প্রেম আছে।
অনন্ত অক্ষয় বিশ্বে সে প্রেমের সীমা
কে বা জানে জানিতেন নবদ্বীপ-বাসী
শচীমার গর্ভানন্দ সন্ন্যাসী নিমাই।
আজি আর সে কথায় নাহি প্রয়োজন,
পৃথিবীর প্রেম আজি জানুন পৃথিবী।
দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে প্রেমের ভিকারী।
দেখা শুনা হবে কি না, কে বলিতে পারে?

দশম প্রবাহ।

কত দিনের দেখা?

"তরু-শাখা উপরে শিখিনি।
কেন লো বসিয়ে তুই বিরস বদনে?
না হেরিয়ে শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
অনাথা রাধার সম তুইও কি দুখিনী?
আয় পাখি! আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করে কাঁদি,
তুই ভাব জলধরে আমি নবঘনে।"

ব্রজাঙ্গনা।

কত দিনের দেখা, মনে পড়ে না। প্রেমিকেরও না, প্রেমিকারও না। তবে এ কূট প্রশ্নের মীমাংসা করে কে? একটী পাখী আর একটী মানুষ। মানুষের সঙ্গে পাখীর প্রেম। এ বড় আশ্চর্য্য কথা। পাখী বনের গাছে থাকে, অনন্ত নীল-আকাশে উড়ে যায়, নীল বায়ুসাগরে সাঁতার দেয়, বার-মাসের মধ্যে এক এক মাসে এক এক দিন গাঢ় নীলবর্ণ আকাশ নিখুঁত শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। সেই সময় পাখী যখন অনেক উঁচুতে উঠে, চর্ম্মচক্ষে তখন দেখা যায়, শুভ্র অম্বরতলে ছোট ছোট কৃষ্ণবিন্দু। বিন্দুগুলি এক একটী পাখী। পাখীর সঙ্গে মানুষের প্রেম।

এক বৎসর শ্রাবণ মাসের শেষে, একটা নিবিড় নির্জ্জন নিকুঞ্জে চাঁপা ফুলের গাছে এক পাখী বোসে ছিল। চাপাফুলে ভ্রমর বসে না, এ কথা পাঠক মহাশয়ের অবশ্যই জানা আছে। পাখী একাকী;—প্রসঙ্গাধীনে একা-কিনী। এক বিহঙ্গ;—কে জানে কি বিহঙ্গ, একবার এলো আর উড়ে গেল। দুই দণ্ড পরে সহচর সঙ্গে পুনরায় সেই গাছে উপস্থিত। নূতন পাখী পুরাতন পক্ষিণীর অনেক দিনের নামে নামে চেনা। গাত্রের আঘ্রাণে

আবার নূতন পরিচয়। সেই সঙ্গে সুধাপান, সেই সঙ্গে মিলন। যে হৃদয়ে যে আশার জন্ম ছিল না, সেই হৃদয়ে সেই আশার নবীন সঞ্চার। কথায় কথায় কত যে আশ্বাস, কত যে আনন্দ, তাহারাই তাহা জানিত, তাহারাই তাহা জানিল। শ্রাবণ মাসের রাত্রি দিনমানের চেয়ে যেন কিছু বড়, প্রণয়ী-যুগলে প্রেমবিহ্বলে সেইটীই সিদ্ধান্ত কোল্লে। কেন না, যতক্ষণ যুগল মিলন, ততক্ষণ অল্পে বহু জ্ঞান হয়, বহুক্ষণে অল্প বোধ হয়। সেই প্রমাণেই শ্রাবণের রাত্রি বড়। কেন বড়? আরও এক কথা। প্রভাতের পর বেলা দশ দণ্ড পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাত হয় না, তখনও কোকিল ডাকে না, তখনও ভৈরবী রাগিণীর আমেজ ভঙ্গ হয় না, তখনও হয় ত নলিনীসুন্দরী পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে জলে ভাসে না। কিন্তু প্রকৃতি যেমন ঠিক, তেমনি ঠিক থাকে।

স্বভাবের উপদেশে প্রভাতী পাখীরা প্রভাতী গেয়ে দিগ্‌দিগন্তে উড়ে যায়, কিন্তু সে রাত্রের,—সে দিনের কথা স্বতন্ত্র। বেলা দশদণ্ডে যাহাদের প্রভাত, তাহাদের উড়ে যাওয়া অসম্ভব। দুটী পাখীর একটীও উড়ে গেল না। কেন গেল না, মানুষের কথায় সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুরূহ।

দুই দিন, তিন দিন, ক্রমে ক্রমে এক পক্ষ অতীত হয়ে গেল। পাখীদের আর ছাড়াছাড়ি নাই। এক পাখীর খাদ্য দুই পাখীতে আহার করে, দিবারাত্রি মুখে মুখে থাকে। যদি বলা যেতে পারে, তা হলে বোল্‌তে পারি, (বোল্‌তে হাসিও পায়) অকৃত্রিম অকপট প্রণয়। এই রকমে এক মাস, দুই মাস, তিন মাস। শাস্ত্রে শুনা ছিল, পাখীরা পূর্ব্বে ঠিক মানুষের মত কথা কইতে পারত; সত্য মিথ্যা শাস্ত্রকারেরা জানেন, কিন্তু বিহঙ্গিনী বলিয়াছিল,—পাখীর ধর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল;—

পাখি রে! তোমারে আমি ভালবাসিলাম,
জনমের মত তব দাসী হইলাম।
হইলাম হইলাম করিলাম পণ,
হবে না বিচ্ছেদ কভু থাকিতে জীবন,
জীবনে যদিও কিছু থাকে অধিকার,

সেই অধিকার পাখি! আজিরে তোমার!
আমার জীবনে আমি অধিকারী নই,
কেন জান? তব আমি সহচরী হই।
জীবনের সহচরী হইলাম আজি,
আমি রে তরণী তব, তুমি মম মাঝি।
মনে রেখো ভুলনাকো খেলিব দুজনে,
খেলে যথা সৌদামিনী অসীম গগনে;
হেসে হেসে চলে যায় মেঘে নিরখিয়া,
তেমতি আসিব যাব জুড়াইব হিয়া।
তুমি হে আমার কান্ত! আমি হে তোমার,
এ জনমে ছাড়াছাড়ি হবেনাকো আর।
আকাশে জলদ হেরি পাখা বিকাসিয়া,
নৃত্য করে শিখীকুল পর্ব্বতে থাকিয়া।
মেঘের গর্জ্জন শুনি ভেক জলবাসী,
কত খেলা করে জলে ক্যাঁ কোঁ রবে হাসি।
খাইতে ফুলের মধু গুঞ্জরে ভ্রমরা,
বড় ভালবাসে ফুলে, জান তা তোমরা।
যে ফুলেতে মধু নাই, সে ফুলেতে অলি
ঘৃণা করি চলে যায় পদতলে দলি।
আমি ত তেমন নই, সঁপিয়াছি মন,
সঁপিয়াছি তব পদে জীবন যৌবন।
এক ভাগ আনি যদি দুইভাগে খাই,
আরো কারে নাহি হেরি তোমারেই চাই

তুমি মম প্রাণসখা জীবন-জীবন,
তুমি মম আমি তব যাবত জীবন।

এই ত প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা কি মনে পড়ে? প্রথম মিলনে আরও কি কথা বলেছিলাম, তা কি তোমার মনে পড়ে? ভুলিয়া থাকা উত্তম। স্মরণ করাইতে,—পুনঃস্মরণ করাইতে অবলা,—আমি অবলা,—আমি যদি অসমর্থ হই, নাচার;—কিন্তু ভুলো না। জীবনের বন্ধন এক প্রকার অচ্ছেদ্য; সে বন্ধন যে ছেদন করিতে পারে, এক পক্ষে সে সাধু পুরুষ, এক পক্ষে সে কাপুরুষ। কিন্তু প্রাণপাখি! সে কথা কি তোমার মনে পড়ে? বিধাতা আমারে পক্ষিণীরূপে সৃজন করেছেন। যে কেন তুমি হওনা, আমার প্রাণের পাখী তুমি, আমি তোমারে পাখী বলেই ভাবি। তুমি এখন এই হৃদয়সংসারে রাজ্যেশ্বর রাজা হও, রাজার উপর রাজা, ভূমণ্ডলের অধীশ্বর সম্রাট হও, দাসী চরণে। আমি তোমার চির কিঙ্করী, রাজরাণী হইতে পারি না, ক্ষুদ্র বিহঙ্গিনী। তথাপি প্রাণপাখি! আমি তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি না, পাখীর মুখে প্রতিধ্বনি হইল, "আমিও তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি না।"

পাখী পাখীনীতে এক রজনীতে তর্কবিতর্ক হইল, সত্য কি প্রণয়ে অন্ধকার নাই? পাখী বলিল, না। পাখীনী বলিল, আছে। সে অন্ধকারের নাম কি? ঈর্ষা। প্রণয়ের ঈর্ষা।

এ আবার কি কথা? যাদের এত বাঁধাবাঁধি কথা, তাদের কাছে দুরন্ত ঈর্ষা এসে কোথায় দাঁড়াবে?

দ্বাদশ বৎসরের মিলন। পাখীর সঙ্গে অনেক পাখী আসে, তার মধ্যে একপাখী,—আগে ছিল ছাতারে, পরে হয়েছে দয়েল। সে বেশ শীস্ দিতে জানে। সেই জন্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, সেই জন্যে পাখি! তোতে মোতে বিচ্ছেদ।

সেই জন্যে সেই জন্যে।

"কত দিনের দেখা?" অনেক দিনের ভাব; তবে বিচ্ছেদ কেন? ভিকারী দ্বারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে; তবে দেখা সাক্ষাৎ নাই

কেন? গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইয়া শীঘ্র আবার অবরুদ্ধ হইল কেন? আলো জ্বলিতেছিল, সে আলো হঠাৎ নির্ব্বাণ হইল কেন? সেই জন্যে সেই জন্যে। বড় দুঃখে বলি ঃ—

কেমনে অমল প্রেমে বঞ্চিলি আমারে?
পাপাচারি দুরাচারি বিশ্বাসঘাতিনি!
কার ভাবে ভুলে গেলি? কে রক্ষিবে তোরে?
কারে ভালবেসে তুই সুখী হবি ভবে?
দেখ্ দেখি ভেবে মনে ওলো সর্ব্বনাশি!
ছি ছি! কি লজ্জার কথা! হারাইয়ে তোরে
দহিছে যে জন সদা জ্বলন্ত দহনে,
তারে জ্বালাইয়ে সাধিবি! কি সাধ্য তোমার—
সুখী হবে ভবধামে? সাক্ষী বিশ্বপতি।
কাঁদিতে হইবে শেষে হাহাকার রবে।
এই না প্রতিজ্ঞা ছিল ত্যজিবে না মোরে?
ছাড়িবে না যতদিন রহিবে জীবন?
সে কথা কোথায় গেল? বঞ্চিয়ে আমায়
কত সুখী হও তুমি দেখিব দেখিব!

আবার এক দিন গেল। আবার এক দিনের সূর্য্য পূর্ব্বগগনে উদয় হইয়া পশ্চিমাচলে অস্তগত হইলেন; আবার আকাশ অন্ধকার হইল। নক্ষত্রের সঙ্গে সুধাকর আবার পৃথিবীর জলে ঝাঁপ দিলেন। আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর আবার খেলা হইতে লাগিল। আকাশে চন্দ্র, আকাশে নক্ষত্র, ধরণী বুঝি অনাথিনী? না ত! তাও কি কখনও হোতে পারে? তা ত কখনও হয় না। আকাশে সূর্য্য যেমন, আকাশে চন্দ্র যেমন, আকাশে নক্ষত্র যেমন, আমরা পৃথিবীর জলের নীচে ঠিক তেমনি তাহার ছায়া দেখি।

প্রভেদ এই যে, আকাশে আকাশ কাঁপে না, চন্দ্র-নক্ষত্র কাঁপে না, জলে এলেই পবনী তাঁদের কাঁপায়।

তুই কি জানিস বিহঙ্গিনি! জানা শুনা কত দিন? মনের দেখা দ্বাদশ বর্ষ, চক্ষের দেখা শুদ্ধ আড়াই বৎসর। অনন্ত বিরহের পরেই আশু বিরহ। হয় ত এক দিন ভালবাসিতে, হয় ত এক দিন ভালবাসিয়া ছিলে, হয় ত এক জনের খাদ্য দুই জনে বণ্টন করিয়া খাইয়াছিলাম, সে কথা কি স্মরণ হয়? তুমি খাইলে আমি খাইব, তুমি না খাইলে আমি খাইব না, সে দিন কি মনে পড়ে? হা সর্ব্বনাশি! যদিও অনেক দিনের কথা, তথাপি সে কথা আমার মনে আছে। বেতাল পঁচিশ পড়িয়াছ? গরুর খুরের জল, উভয়ের পিপাসা, এক জন পান করিলে অপরের জন্য এক বিন্দু থাকে না। এ বলে তুমি খাও, ও বলে তুমি খাও, তারা বনবাসী হরিণ-হরিণী, কেহই খাইল না; দুটীতেই পিপাসায় মরিয়া গেল। তাল বেতাল বিচার করিয়াছিল কি? দুজনেই প্রেম জানিত না। এক জন খাইলে যদি দুজনের প্রাণ বাঁচিত, তাহা হইলেই জানিতাম, বিশুদ্ধ প্রেম; কিন্তু না ত। বিশুদ্ধ প্রেম না ত! কেবল কপটতা মাত্র। সংসারে বিশুদ্ধ প্রেম অতি কম।

তখনও ভিকারী দরজায়।

আবার গবাক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত। সেই প্রতিমা, সেই আশা-প্রতিমা গবাক্ষপার্শ্বে। চারিচক্ষু একত্র। কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না। ভিকারীর কি দুরদৃষ্ট! যেখানে এসেছে, ঠিক লক্ষ্য স্থল। যাকে দেখ্‌ছে, পূর্ব্বে দেখা ছিল, কিন্তু এখন যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কোকিল ডাক রে! পঞ্চমে পঞ্চমে, সুরে সুরে মিলিয়ে, কোকিল তুমি একবার ডাক রে! এই প্রেমিক প্রেমিকা;—না হয়, এই নায়ক নায়িকার যদি কখনও চোখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকে, মনে করাইয়া দাও। কতক্ষণ আর ভিকারী দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে?

কোকিল নিঃশব্দে বিরস বদনে শাখার উপর ঝোপের ভিতর সুস্থির ভাবে উপবিষ্ট। কোকিলের বদন, এই কথাটী শ্রবণ কোরে হয় ত কেহ কেহ হাস্য কোর্‌বেন, কিন্তু সে হাস্যের ক্ষমা আবশ্যক; কেন না, বিরস চঞ্চু, বলা আমাদের অভ্যাস নাই। সেই কথাটী শ্রবণ কোর্ত্তে যে পাঠক মহাশয়ের

একান্ত অভিলাষ, যে রস আস্বাদনে যাঁহার অভিলষিত রুচি, তিনি সচ্ছন্দে "বিরস চঞ্চু" আবৃত্তি কোর্‌বেন, ব্যাকরণ অশুদ্ধ হবে না।

কোকিল মৌন। পুনঃ পুন অনুরোধ, পুনঃ পুন মৌন। প্রবাহ-প্রারম্ভে ব্রজেশ্বরী রাধিকার বিরহে ময়ূরীকে সম্বোধনে কবি কহিয়াছেন :—

"তরু-শাখা উপরে শিখিনি!
কেন লো বসিয়ে তুই বিরস বদনে?"

এখানেও আমাদের কোকিল বিরস বদনে। এ নজির যদি গ্রাহ্য করা হয়, ময়ূরীর যদি বদন হোতে পারে, কোকিলের না হোতে পার্‌বে কেন? সুতরাং চঞ্চু বল্‌বার প্রয়োজন হলো না।

আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর কত দূর নিকট সম্পর্ক, পণ্ডিত সেটী না জান্‌তে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ জানেন, কবি সেটা জানেন, আর পৃথিবীতে যাঁরা যথার্থ প্রেমিক, তাঁরাও সেটী জানেন। এইখানে একটু রহস্য আছে। ব্যাকরণের পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা কোর্‌তে পারেন, বিজ্ঞানবিৎ কি পণ্ডিত নন? কবিরা কি পণ্ডিত নন? এ তর্কের মীমাংসায় আমরা হাঁ ভিন্ন না বল্‌বো না। আর একটা কথা। পৃথিবী যাঁরা যাঁরা যথার্থ প্রেমিক, এই কথায় মানুষেরা হয় ত আনন্দে নৃত্য কোর্‌তে থাক্‌বেন। কিন্তু তা নয়। মানুষ যেমন, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই সেইরূপ, সকলেই প্রেমিক হোতে পারে. কিন্তু শুধু তা ও নয়। সজীবে প্রেমিক হয়, নির্জ্জীবে হয় না, এ কথা অসঙ্গত। জগতে প্রেম ছাড়া কিছুই নাই। চরাচর সৃষ্টিসংসারে সকলেই প্রেমসূত্রে বাধা। এই ক্ষেত্রে আজ আমরা সজীব নির্জ্জীব প্রেমিকের দুই একটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত কোর্ত্তে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বেও আভাস আছে, এখন কিছু স্পষ্ট। আকাশে মেঘ হয়, পৃথিবীর পাহাড়ে পর্ব্বতে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে, এমন কি, গৃহস্থের গৃহ ছত্রেও ময়ূরে পেখম ধরিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করে। কেন জান? প্রেমের খাতিরে। আকাশের মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মত আর আর যার যার প্রেমসম্পর্ক, তারাও আকাশে মেঘ দেখে নাচে। আকাশে সূর্য্য উদয় হয়, জলে কমলিনী হাসে; সূর্য্যমুখী ফুল আহ্লাদে ঢলে পড়ে। নিশাকালে আকাশে চন্দ্রোদয়

হয়, প্রেমামোদে পৃথিবীর জলে আদরিণী, আমোদিনী, কুমুদিনী সহাস্য মুখে প্রস্ফুটিত হয়ে জলাশয়ের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। প্রেমিক সকলেই, প্রেমিকা সকলেই। প্রভেদ কি? কপট আর অকপট। এক কথায় সজীব নির্জ্জীব সকলেই যোড়া যোড়া, কোন যোড়া জন্মাবধি ছাড়ে না, কোন যোড়া ছেড়ে ছেড়ে যোড়া হয়।

গৃহস্থ গৃহের দ্বারের ভিকারী এক দিন অবশ্যই যোড়া ছিল, এখন ছাড়া, কিন্তু মন তার যোড়া ছাড়া নয়; মন কখন যোড়া ছাড়া থাকে না। সচরাচর নিদারুণ ঘৃণিত বিচ্ছেদে সংসারের লোকে সাদা কথায় কাঁচের বাসনের উপমা দেয়। কিন্তু সে উপমাকে কল্পনাসতী কিছু বেশী দিন আদর করেন না। কেন করেন না? সেটীও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কথা। তেমন বিচ্ছেদ যেখানে, পূর্ব্বে সেখানে অকপট পবিত্র প্রেম ছিল না। হংস-হংসিনী, কপোত-কপোতী, জলধর-চাতকী, সূর্য্য-নলিনী, চন্দ্র কুমুদী, জগৎকে সেই অকপট প্রেম শিক্ষা দেয়।

দ্বারের ভিকারী সেই অকপট পবিত্র প্রেম শিক্ষা করেছে। পূর্ব্বে দেখা হয়েছিল, বন্ধনসূত্রে উভয় অন্তরে প্রণয়বীজ সঞ্চারিত হয়েছিল, সে কথা মনে আছে, কিন্তু দিন মনে নাই। কত দিনের দেখা, ঠিক সেই দিনটী মনে নাই, মনে পড়ে না, নায়কেরও না, নায়িকারও না।

উঃ! কি কষ্ট! অদৃষ্ট অগ্নি অপেক্ষা, দৃষ্ট অগ্নি অধিক যন্ত্রণা প্রদ। দেখা বিলক্ষণ স্মরণ হচ্ছে, কিন্তু কত দিনের দেখা, প্রেমিক প্রেমিকা দুজনেই সেটী মনে কোর্‌তে পাচ্ছে না।

প্রদোষ কালে গগনে একটী মাত্র নক্ষত্র থাকে। প্রদোষ অবসানে অনেক নক্ষত্র একত্র হয়। শাস্ত্রানুসারে নক্ষত্র মাত্রেই স্ত্রী। দুই প্রমাণ। এক প্রমাণে নক্ষত্রের নাম তারা, আর এক প্রমাণে চাঁদ সর্ব্বদাই তারা পতি। কিন্তু নক্ষত্র মাত্রেই কি দক্ষরাজার কন্যা? এ জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া আমাদের অসাধ্য।

এক বাতুল এক দীপকে জিজ্ঞাসা কোরেছিল, চাঁদ যদি তারাপতি, চাঁদকে দেখে যদি তারকামালা পতিভক্তিতে প্রফুল্ল হয়, তবে পূর্ণিমা-রজনীতে পূর্ণচন্দ্র সমাগমে তারাবলী অত মিট্‌মিট করে কেন? অমাবস্যা-যামিনীতে

সুধাকর অম্বরে থাকেন না। সে রাত্রে নক্ষত্রেরা অত হাসে কেন? তবে বুঝি তারাদলের আরও কেহ নায়ক আছে।

এ কথায় নিশ্চয়ই নক্ষত্রেরা বেশ্যা। পতির অদর্শনে যাদের মুখে হাসি আসে, পতির অদর্শনে যাদের মনে আনন্দ হয়, তাদের সতীত্বকে ধিক্কার না দিয়ে থাকা যায় না। একদিন কি দুদিন ছাড়া, নিত্য নিত্য যারা পতি-সমাগম লাভ করে, বৎসরে বার দিন কি চব্বিশ দিন যথা সময়ে পতিকে যারা দর্শন কোর্ত্তে না পায়, ঘোর অন্ধকারে তাদের মুখে তত হাসি কি ভাল মানায়? ছিঃ! নক্ষত্রেরা বেশ্যা। আর এই যে ভিকারী, আর ঐ যে গবাক্ষে সুন্দরী কামিনী, এরা কারা? শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ আর সন্ধ্যা-কালের একটী নক্ষত্র, পৃথিবীতে এরাই কি তারা?

কে বোল্‌তে পারে? যদি অকপট প্রণয় এই দুই হৃদয়ে অবিচ্ছেদে বিদ্য-মান থাক্‌ত, তা হলে এত দূর বিস্মরণ হবে কেন? কত দিনের দেখা, মনে থাক্‌তে না পারে, কিন্তু যে দিনের দেখা, অকপট প্রণয়ে সেই দিন থেকে হৃদয়ে হৃদয়ে দুজনে দুজনের হৃদয়ের হার হয়। প্রথম মিলনেই বোধ হয় যেন, বহুদিনের দেখা, বহুদিনের মিলন, একদিন বিচ্ছেদে এক যুগ জ্ঞান হয়, এক মুহূর্ত্তের মিলনে শত যুগের প্রণয় মনে পড়ে। প্রণয়ের ধর্ম্মই এই। তবে কেন এ প্রণয়ীরা চক্ষু থাক্‌তেও অন্ধ? গবাক্ষবাসিনী কামিনী আমাদিগকে ক্ষমা কোর্‌বেন, প্রেমিক পাঠক মহাশয়, প্রেমিকা পাঠিকা ঠাকুরাণি। আমাদিগকে ক্ষমা কোর্‌বেন, ভাবে গতিকে অনুমান হচ্চে, যে রমণী গবাক্ষে, যিনি প্রণয়পাত্রকে চিন্তে পাচ্চেন না, তিনি হয় ত স্বেচ্ছাচারিণী।

প্রণয় অমূল্য পদার্থ। হৃদয়ে একবার এই অমূল্য রত্নের সঞ্চার হইলে জীবনকালের মধ্যে তাহা আর দূর হইবার নয়। ঘুচিবার নয়, মুছিয়া ফেলিবার নয়, জলে ধুইয়া ফেলিবার নয়, উৎপাটন করিবার নয়, দূরে নিক্ষেপ করিবারও বস্তু নয়। যাহারা বলেন, সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে থাকিলে ঘনি-ষ্ঠতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, চক্ষের অন্তর হইলেই কমিয়া যায়, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। অন্য কোন সম্পর্কে তাহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যেখানে বিশুদ্ধ অকৃত্রিম প্রণয়ভাব, সেখানে বিস্মরণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না।

অদর্শনে বরং অকৃত্রিম প্রণয়ের পরীক্ষা আছে। বিচ্ছেদ এক প্রকার প্রণয়-কাঞ্চনের কষ্টি-পাথর। যদি তাহাই সত্য, তবে এই প্রণয়ীযুগল মনে করিতে পরিতেছেন না কেন যে, কত দিনের দেখা? প্রণয়ের নিকটেই এ প্রশ্নের উত্তর আছে।

একাদশ প্রবাহ।

যুগল মিলন।

"আজি কি আনন্দ সখী সব দুঃখ ঘুচিল।
আদরে মাধবী লতা তমালেরে বেড়িল॥
দূরে গেল ভব ঘোর, তুই মোর আমি তোর,
এই কথা মনে মনে অকস্মাৎ জাগিল।
বিচ্ছেদ সাগরে পার, আশা নাহি ছিল আর,
কেমন বিধির খেলা, তীরে তরী ভিড়িল॥"

বঙ্গরত্ন।

পঞ্চম রজনী। যা ভেবেছি তাই। চন্দ্র যখন মধ্য গগনের কাছা কাছি, জনপদ নিঃশব্দ, জীবকুল নিদ্রাগত, পৃথিবী নিশুতি, ঠিক সেই সময় একটী যুবা আর একটী যুবতী গৃহসমীপবর্ত্তী সরোবরকূলের নিম্ববৃক্ষতলে একত্র। কে এরা? সেই গবাক্ষপথের কামিনী আর সেই দ্বারদেশের ভিকারী। যখনকার কাহিনী, তখন এদেশে ইংরেজের রাজত্ব ছিল না। ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন বিদ্যমান ছিল না, বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত অশ্লীলতা-নিবারিণী সভা ছিল না। আমরা বহুকালের লোক, গগনবিহারী, পৃথ্বি-বিহারী, পাতালবিহারী, পৌরাণিক চতুর্দ্দশ জগৎবিহারী। আকাশকুমারী

কল্পনা বিনা বেলুনে কখন আমাদিগকে স্বর্গে নিয়ে যান, কখন পৃথিবীতে আনেন, বিনা জাহাজে সমুদ্র পার কোরে কখন রসাতলের বাস্মুকি-রাজ্যে প্রবেশ করান, কল্পনার গতি অতি বিচিত্র। স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে অহরহ কল্পনাসতীর গতিক্রিয়া। আমরা যে কি, কল্পনা সেটী জানেন। জননী বোলে কখন কোলে উঠি, স্তন পান করি, ক্ষীর ননী খাই, আবার কখন প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী বোলে এক পালঙ্কে এক শয্যায় শয়ন কোরে প্রেমভাবে সম্ভাষণ করি, আবার কখন আদরিণী অবিবাহিতা কুমারী কন্যা বোলে কোলে নিয়ে আদরে স্নেহভাবে বিধুমুখে চুম খাই। কল্পনা তাতে রাগ করেন না, মান করেন না, নাগিনীর মত বিষ বর্ষণে গালাগালি দেন না, তিন ভাবে কাজেই আমরা সতীর কাছে প্রণয় পাই।

নিম্ববৃক্ষতলে দুই মূর্ত্তি একত্র। পূর্ব্বের ভাব এখন আর প্রকাশ করা যায় না, প্রচারের ভয় আছে। মাথার উপর ইংরেজের ইংরাজি আইন আছে, কাজেই মনের আগুন মনে মনে ঢেকে রাখ্‌তে হয়; অশ্লীলতা-নিবারণি সভা এখন ত মরা। কেশব বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্ব থেকেই মরা, তবু আমরা সাবধান। যুবা প্রেমিক, যুবতী প্রেমিকা, আর ত বলা গেল না। সুরসিক ভাবুক পাঠক মহাশয়! মনে মনে অনুভব করুন, পূর্ব্ব ভাব কিরূপ ছিল। বহুদিন অদর্শনের পর নূতন মিলনে কি ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই কথাই চাপা। পূর্ব্বের অনুমান মিথ্যা হলো না, সত্যই এ রমণী স্বেচ্ছাচারিণী।

যুবার নাম শশিকুমার, যুবতীর নাম মিহিরমোহিনী, ওরফে আশা-প্রতিমা। বিপথে পদার্পণ কোর্‌লে কত স্থানে কত সময়ে কত কি নূতন নূতন নাম হয়, এই আশা প্রতিমা ক্রমে ক্রমে সে কথা সপ্রমাণ কোরে দিবেন। মার্কিণ দেশের একজন বিখ্যাত কবি আমাদের অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসী হয়ে পত্নী বিয়োগে নানা কষ্টে নানা দেশ পর্য্যটন কোরে মনে ভেবেছিলেন, স্ত্রীবিয়োগের পর বেশ্যাগৃহে সুখ আছে। আছে কি নাই, সত্য কি মিথ্যা, সেটী তাঁহার জানা ছিল না। কিন্তু দেবতার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ছিল। ইংরেজের মতে মার্কিণ দেশ নূতন দেশ, নূতন জগৎ। আমাদের পিতামহীরা আজিও অজ্ঞতাবশে বোলে থাকেন, তিন খুঁট পৃথিবী। তিন খুঁট মানে কি? সাহেবের কথার

অনুবাদে খুঁট মানে খণ্ড। তবেই পৃথিবী তিন খণ্ড। যদি খণ্ড তিন হয়, তবেই নারী-সংস্কারে ধোরে নিতে হবে, পৃথিবী ত্রিকোণ।

সমস্তই মিথ্যা কথা। আমাদের শাস্ত্রে পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলে না, আর মার্কিণ রাজ্য যে নূতন, এ কথাও বলে না। কেন জান? রাজা রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, অশ্বরক্ষক শত্রুঘ্ন তৎকালে অশ্ব অন্বেষণে সমস্ত পৃথিবীর রাজগণকে পরাজিত করেন। শেষে সিদ্ধপুরযাত্রা। সিদ্ধপুরের নাম এখনকার ভাষায় মার্কিণ, ইংরাজি ভাষায় আমেরিকা। সেইখান থেকেই পৃথিবীর ত্রিখুঁট, অথবা ত্রিকোণ নাম খণ্ডন। ধরণী পরিবেষ্টনে সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে, ভাস্করাচার্য্য মতে গোলাকার। আমাদের সিদ্ধপূর আজ আমেরিকা। কলম্বস নামে একজন জাহাজী খালাসী এই আমেরিকা নূতন দেখেন, তিনিই বলেন, নূতন দেশ, নূতন জগৎ। ইংরাজি ভূগোল নির্লজ্জ; আজিও বলে, নূতন জগৎ। কিন্তু রামচন্দ্রের ভ্রাতা যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন, যখন সিদ্ধপুরে যান, তখন সেই সিদ্ধপুরে রাম সীতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে সেই খানে রামসীতার নামে এক পর্ব্ব হয়, শাঁক ঘণ্টা বাজে, রামসীতার আরতি হয়, মেলাস্থলে বহুলোকের জনতা হয়। রামসীতুয়া আমেরিকার একটী তীর্থ।

এক কথা বোল্‌তে বোল্‌তে এ কথা এলো কেন? নূতন আর পুরাতনের সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য। নূতন আয় পুরাতন। যাদের নূতন প্রেম বহুকাল বিলুপ্ত হয়েছিল, এখন তাদের নূতন দর্শন।

মিহিরমোহিনী সকাতরে করজোড়ে মিনতি কোরে বোল্লেন,—"প্রাণেশ্বর! এত কালের পরে দাসীকে কি মনে পড়েছে?"

প্রেমিকের মুখে আর বাক্য নাই। প্রেমিকা আবার আধ আধ কণ্ঠে পুনরুক্তি কোল্লেন;—

"দাসীকে কি মনে পড়েছে?"

কে দাসী? কে কার মনে পড়ে? দুজনেই তা জানে, আর কেউ না। যদিও আমরা এক এক সময় সর্ব্বজ্ঞ বোলে অভিমান করি, কিন্তু প্রণয়ের বিচিত্র গতি নিরূপণ কর্‌বার আমরা কে?

শশিকুমার মস্তক অবনত কোরে নিরুত্তর হলেন।

মিহিরমোহিনী অশ্রুপ্রবাহে বক্ষঃস্থল আপ্লাবিত কোরে যুগল হস্তে প্রাণেশ্বরের গ্রীবাদেশ ধারণ কোরে রোদনস্বরে বোল্লেন ;—

অপরাধী আছে দাসী চরণে তোমার।
প্রাণ প্রিয় শুকপক্ষী কোথা গিয়াছিলে
উড়িয়ে শিকল কাটি ? ধরেছি তোমারে,
আর কভু ছাড়িব না, রাখিব হৃদয়ে
চিরদিন দরিদ্রের কাণাকড়ি সম ;
পুঞ্জ পুঞ্জ করি নাথ এ ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে,
যে ক্ষুদ্র ভাণ্ডার খোলা রয়েছে সতত,
সঞ্চিবারে মন ধন জনমের মত।

শশিকুমার একবার মোহিনীর মুখে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে তীব্র স্বরে বোল্লেন ;—

দূর সর্ব্বনাশি ! তুই বিশ্বাসঘাতিনী !
এতক্ষণ পরে আমি চিনিয়াছি তোরে !
বৈশ্যা তুই পাপীয়সি ! পিশাচি রাক্ষসি !
কেন যে হইল দেখা বুঝিতে না পারি,
কেন হেথা আসিয়াছি ভিকারীর বেশে ?
আমি না, জানেন তিনি অন্তর্যামী যিনি,
করিয়াছি তোর প্রেমে চির বিসর্জ্জন।

কেন নাথ ? পাপে কি হে ক্ষমা কিছু নাই ?
মার্জ্জনা, মার্জ্জনা ভিক্ষা করি তব পদে।
অজ্ঞানে করেছে পাপ, ক্ষম এ দাসীরে।

অজ্ঞানে কখন না ত পাপিষ্ঠা দুর্ম্মতি!
ছেড়েছিস মম আশা নূতন প্রণয়ে,
সজ্ঞানেতে করেছিস কারে প্রেম দান,
ভেবে দেখ্ সর্ব্বনাশি! প্রায়শ্চিত্ত যদি
থাকে কভু এ সংসারে, অবশ্য করিবি,
অবশ্য ভুঞ্জিবি তুই এ পাপের ফল।
বড় ভালবাসি তোরে, ভাল বাসিতাম,
কেমনে ভুলিয়ে গেলি সেই ভালবাসা?
কেমনে ক্ষমিব দুষ্টে! অন্তরের কালী,—
অন্তরের কালানল দহিছে আমারে!
আর ভাল বাসিব না। জনমের মত
যে ভাল বাসিয়াছিনু, ভুলিয়াছি সব।
আজি হতে হলি তুই বিষবৈরী মোর।
ভালবাসা হোক্ তোর কাফরী সন্তান।

কেন জীবিতেশ! মোরে এত তিরস্কার?
কেন ক্রোধ, কেন শাপ, কেন অভিমান?
সব তেয়াগিব আমি তোমার কারণে,
চরণে আশ্রিত দাসী, ত্যজ না আমায়।

যা ভেবেছি তাই। গবাক্ষবাসিনী এ কামিনী অবশ্যই বেশ্যা। তা যদি না হবে, তবে আপনার দোষ স্বীকার কোরে এত হীনতা স্বীকার কোর্বে কেন? ধরা ত পড়ে নাই, তবে এত কাকুতি কেন? প্রণয়পাত্র কে? বঞ্চনা করা যদি ইচ্ছা থাক্‌তো, নূতন নায়ককে সর্ব্বেশ্বর কর্‌বার যদি ইচ্ছা থাক্‌তো, তবে এত ছোট হবে কেন? দোষ স্বীকার, পাপ স্বীকার, অপরাধ স্বীকারই বা কোরবে কেন?

হয় ত মনে মনে একটু অকৃত্রিম ভালবাসা আছে। আমিও কি পাগল? মনে মনে অকৃত্রিম ভালবাসা থাক্‌লে কি অপরের উপর মন পড়ে? ভিকারি! তুমিও কি পাগল? তুমিও কি মনে মনে বিবেচনা কোর্‌তে পাচ্ছ না, এ দুশ্চারিণী মায়াবিনী?

ভিকারী স্তম্ভিত। দৃষ্টি কোন্‌ দিকে, বুঝা যায় না, মন কোন্‌ দিকে, ভিকারী আপনি জানে, আর কেউ না।

কোকিল এতক্ষণ বিরসে নিঃশব্দে বোসে ছিল, সহসা ডেকে উঠ্‌লো, কু—উ—উ।

যেমন কেন প্রণয়ী হোক্‌ না, সত্য সত্য কোকিলের ডাকে প্রাণ কেমন করে কি না? দেশের কথা দেশে থাক, কবির কথা কবিতে থাক, দুজনে শিউরে উঠ্‌লো।

শশিকুমার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে পূর্ব্বভাব, পূর্ব্বস্মৃতি, পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণে মিহিরমোহিনীকে বোল্লেন, "মিহির! তুমি সত্যবাদিনী। একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল দেখি, পাপপথে তোমার মতি গিয়েছিল কি না?

মিহিরমোহিনী ইতস্ততঃ কোরে কি উত্তর দিবেন, অনেক ক্ষণ স্থির কোর্‌তে না পেরে অবশেষে মুখ ফুটে বোল্লেন, "লজ্জা।"

"তা ত বুঝেছি, কিন্তু মূলকথার উত্তর পেলেম না।"

অশ্রুপূর্ণ লোচনে মিহিরমোহিনী উত্তর দিলেন;—

পায়ে পড়ি ক্ষমা কর পায়ের দাসীরে!
চরণ-কিঙ্করী আমি অতি অভাগিনী।
কত শত কটু বাক্য বলেছি তোমায়,
মৌন হয়ে ছিলে নাথ, দ্বিরুত্তর কভু
শুনিনি তোমার মুখে। সব আছে মনে।
সেই যে শ্রাবণ মাসে শুনিয়ে লাঞ্ছনা,
গেলে চলি কাশীধামে আসিবে না বোলে,
সেই দুঃখে প্রাণেশ্বর মন অভিমানে,
মনভ্রমে ভজিয়াছি এক কাফ্রী সুতে।

অকস্মাৎ মাথায় বজ্রাঘাত হইলে ত্রিপান্তর মাঠের মাঝখানে নিরাশ্রয় পথিক জীবন বিগত না হলেও যেমন অচেতন হয়ে পড়ে, শশিকুমার ক্ষণকাল সেইরূপ হতচেতন থেকে একটু পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্তে ধীরে ধীরে উত্থান কোরে মৃদুস্বরে বোল্লেন ;—

"পাপিয়সী তবে তুই, ছোঁবো না লো তোরে !"

"কেন নাথ ! আজি আমি প্রায়শ্চিত্ত করি,
আজি হতে এ দাসীর তেমন কুমতি
হবেনা হবেনা আর। দেহ পদাশ্রয়,
চরণের দাসী বলি রাখ ও চরণে।"

অশ্লীলতা নিবারিণী সভা! যদি বেঁচে থাক, ক্ষমা কর। সেই রাত্রিকালে সেই নিম্ববৃক্ষতলে ভিখারীবেশী সেই শশিকুমার সেই মিহিরমোহিনীকে একটী চুম্বন করিলেন। গম্ভীর বদনে গম্ভীর বচনে বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত জীবিতেশ্বরি? বচনে পবিত্র প্রেমের এই প্রায়শ্চিত্ত? তবে আর না। তবে আর আমি তোমারে অবিশ্বাস কোর্‌ব না। শোন আমার মনের কথা। যা তুমি করেছিলে, তা আমি করি নাই; পার্‌তেম, কিন্তু প্রণয়ে আমার একাগ্রতা ছিল। আমি—"

সজলনয়নে বুকের উপর মুখ রেখে মাথায় বাধা দিয়ে মিহিরমোহিনী বোল্লেন, "কেন আর জ্বলন্ত অনলে আহুতি দাও, জীবিতেশ্বর! আমি পাপীয়সী, আমি রাক্ষসী, আমি পিশাচী, আমি সর্ব্বনাশী, আমায় ক্ষমা করো। আর আহুতি দিও না। আমি তোমারই।

"তুমি আমারই! তবে এ ভিকারী চরিতার্থ! কিন্তু বল দেখি, সহচরি! কত দিনের দেখা?"

"মনে হয় না প্রাণেশ্বর।"

"সত্য, আমারও মনে হয় না প্রাণেশ্বরি!"

"সব দোষ তুমি ক্ষমা কোর্‌লে?"

"একটু সন্দেহ আছে।"

সন্দেহের নাম শুনিয়া মনে মনে কত কি চিন্তা করিয়া আপনাকে আপনি আত্মাবমানিনী বলিয়া তিরস্কার করিয়া কথায় কথায় থামিয়া থামিয়া মিহিরমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সন্দেহ?"

"সেই কাফ্রী যদি আমার সম্মুখে আসে।"

"না,—কখনই না।"

"এখনও তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।"

"অবিশ্বাসের কারণ?"

"কারণ এই, সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, যে যাকে ভালবাসে, কৃত্রিম হোক্ অকৃত্রিম হোক্, স্বার্থলোভে যে যাকে ভালবাসে, সে তাকে শীঘ্র ভুল্‌তে পারে না।"

মিহিরমোহিনী মৌনবতী।

শশিকুমার বোল্লেন, "লক্ষণেই ত এই পরিচয়। তুমি কি সে কাফ্রীকে ভুল্‌তে পার্‌বে?"

হেঁটমুখে মিহিরমোহিনী বোল্লেন, "পার্‌ব।"

"তবে তুমি আমার আগেকার কথার উত্তর দিলে না কেন?"

"মায়া।"

"মায়া—কি?"

"আশ্রয় চাই।"

"তবে কি সেই কাফ্রীপুত্র তোমার আশ্রয়?"

"না।"

"তবে কি?"

"তা কি তুমি জান না? লতারা গাছে থাকে, গাছেরা লতারই আশ্রয়; গাছ যদি পড়ে যায়, ভূমে গড়াগড়ি খেয়ে লতা শুকিয়ে মরে।"

"উপায়?"

"আর একটী গাছ।"

"আর একটী গাছ? তবে কি সেই কাফ্রীপুত্র?"

"না।"

"তবে এ সকল কথা বোল্লে কেন?"

মনের ভাব গোপন করিয়া শশিকুমারের মনের কথা না শুনিয়াই গলা কাঁপাইয়া মিহিরমোহিনী কহিলেন, "তুমি ছেড়ে গিয়েছিলে।"

"আর কি কোন উপায় ছিল না ?"

"জানা ছিল না।"

"আমার কি জানা ছিল ?"

"পুরুষ পরেশ।"

"তাতে কি বুঝিলাম ?"

"তোমার অনেক আছে।"

উত্তেজিত হইয়া শশিকুমার কহিলেন, "সেই জন্যই কি ক্রীতদাসকুমার তোমার প্রণয়ের অধিকারী ?"

"না।"

"তবে কি জন্য ?"

"তোমার বিরহে।"

"আমার বিরহে তুমি যদি একজন দাসপুত্রকে আলিঙ্গন কোর্ত্তে পার, তবে আমিও তো একজন বিদ্যাধরীকে—"

"ও কথা বলে না।"

"কেন না ? ঈর্ষা নামে যদি একটী কথা থাকে, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা নামে যদি একটী কোন কথা থাকে, তা হলে—"

"থাকে না। তোমাতে আমাতে যে কথা, সে কথার সঙ্গে ঈর্ষার সম্পর্ক নেই,—প্রতিহিংসার সম্বন্ধ নেই,—"

"দূর সর্ব্বনাশি ! যা থাকে, তা দুদিকেই থাকে।"

মিহিরমোহিনী অজস্র অশ্রুপাত কোর্ত্তে কোর্ত্তে ভিকারীর চরণ ধারণ কোরে সকরুণ স্বরে বোল্লেন, "হৃদয়বল্লভ ! আমি তোমারই।"

শশিকুমার গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "তোমাকে আর বিশ্বাস কি ? তুমি যখন আমার পবিত্রপ্রণয়ে অবিশ্বাস করিতে পারিয়াছ, নির্ঘাত আঘাত করিতে পারিয়াছ, তখন আর বিশ্বাস রাখি কিরূপে ?"

"সত্য কথা, আমি অবিশ্বাসিনী ; কিন্তু এখন ত প্রতিজ্ঞা, আর আমি কখনও পরের হবো না।"

আচ্ছা, কিন্তু আমি যদি পরের হই? বিশ্বাসঘাতিনি! এখন ত মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছ পরের হইবে না; কিন্তু আমি যদি পরের হই?"

"অসহ্য।"

"কেন?—অসহ্য কেন? দুই দিকেই ত সমান।"

"সে তোমার জালায়;—আমি যে পাপ করেছিলেম, সে তোমার জ্বালায়।"

"জ্বালা আমি বুঝি না, তুই রাক্ষসি! ব্যভিচারিণী। ব্যভিচারিণীকে স্পর্শ কোর্ত্তে আমার ঘৃণা হয়।"

"ঘৃণা করো না জীবিতেশ! তোমার চরণে আমি চিরকালের জন্য বিক্রীত হয়ে আছি। সে পাপে আর আমার মতি যাবে না।"

"যাবে না? তবে আমিও শীঘ্র তোমাকে আর অবিশ্বাস কোর্ব্বো না। কেন জান?—"

অবিশ্বাস নাহি তোরে হৃদয়ের রাণি!
দেখাইয়ে দিস মোরে প্রেম অবিশ্বাস
অহরহ হৃদিক্ষেত্রে। তবু আমি হাসি,
তবু ভালবাসি তোরে জীবন-প্রতিমা!
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করি সঁপিয়াছি যারে
দেহ প্রাণ; ত্যজিব কি তারে এ জীবনে?
কার্ত্তিকের অমাবস্যা দীপান্বিতা যোগে—
প্রদোষে গৃহস্থ গৃহে লক্ষ্মীপূজা হয়,
কুলা বাজাইয়া করে অলক্ষ্মী বিদায়।
তাই কি আমার তুই? লো সুরসুন্দরি!
কুলা বাজাইয়া আমি খেদাইব তোরে?
না ত না প্রাণের রাণি! আয় হৃদাকাশে,
জবা বিল্বদলে আজি পূজা করি তোরে।

সত্য সত্য মিহিরমোহিনী শশিকুমারের চরণ ধারণ কোরে হৃদয়ে স্থাপন কোল্লেন। উঃ! কি কষ্ট! তাতে কি ঈর্ষানল নির্ব্বাপিত হয়?

"যে ঈর্ষা যে প্রতিহিংসা জ্বলিছে হৃদয়ে,
সেই ঈর্ষা সেই হিংসা দগ্ধিবে তোমারে,
সর্ব্বনাশি! আর আমি হেরিব না তোরে!"

"কেন ভাই! অপরাধ স্বীকারিনু যদি,
তবু কেন দাসী প্রতি এতই আক্রোশ?"

"দেহ আলিঙ্গন সতি! শ্রীমুখ চুম্বনে
হইব অমর আজি ইহ মর্ত্তধামে।
কার সাধ্য বিরোধিবে আস্থক সম্মুখে,
বিরোধী কাহার আমি সম্মুখ-সংগ্রামে?"

তুমি কেন বিমর্ষ? ভেবে চিন্তে অনেক দেখ্‌লেম, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পাওয়া গেল না। যা চেয়েছিলে, অর্পণ করা গেল, এখন আয় ভাই!—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

(এখন) একবার আয় ভাই চুমো খাই বিধুবদনে।
আরো কিছু অভিলাষ নাহি রে মনে।
যে মুখ দর্শন করি, সব দুখ পরিহরি,
সেই মুখ প্রাণেশ্বরি, হেরি নয়নে—
একবার হেরি নয়নে।

মিহিরমোহিনী লজ্জায় বিনম্রমুখী। মনে মনে যে অভিলাষ ছিল, মুখ ফুটে প্রকাশ কোর্ত্তে পাল্লেন না; কিন্তু যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জার আবির্ভাবে সর্ব্ব শরীর পুলকিত হয়ে উঠ্‌লো। পাঠক মহাশয়! অনেক স্থানে এমন ভাব

অনেক দেখেছেন, হর্ষে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, বিস্ময়েও হয়, শোকেও হয়, লজ্জাতেও হয়, আর এক এক সময় সাত্ত্বিক ভাবের অকস্মাৎ প্রাদুর্ভাবে স্তম্ভ, কম্প, আর রোমাঞ্চ, সবগুলি একত্র হয়ে থাকে। আমাদের লজ্জা-শীলা নায়িকার অবয়বে এই ক্ষেত্রে সেইগুলি সমস্তই একত্র।

প্রণয়ী-হৃদয় কখন্ কোন্ ভাবে আন্দোলিত, হিল্লোলিত ও তরঙ্গিত হয়, সকলে সেটী সহজে অনুভব কোর্ত্তে সমর্থ নন। মিহিরমোহিনীর মনের ভাব মিহিরমোহিনীই জান্‌লেন, শশিকুমারের মনোভাব শশি-কুমারই পরিজ্ঞাত। আর আমরা? যদিও আমরা সর্ব্বজ্ঞ নই, তথাপি— তথাপি এই প্রণয়ী-যুগলের স্নেহলক্ষণে, আর বচন ইঙ্গিতে, অনেক দূর পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম কোর্ত্তে পেরেছি। একজন মহাকবি বলিয়া গিয়াছেন, যে হৃদয়ে পবিত্র প্রেম বাস করে, সে হৃদয় অগাধ সমুদ্র; সামান্য ডুবুরির সাধ্য নয় যে সে অনন্ত অগাধ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মুক্তা অন্বেষণ করে; মুক্তা একটী রত্ন, তাহার মূল্য আছে, প্রণয় একটী মহারত্ন, তাহার মূল্য নাই, সাগরের সঙ্গে প্রেমিকের হৃদয়ের উপমা অতি চমৎকার। সমুদ্রের নাম রত্নাকর, এ নাম কেন, কাহাকেও জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে হয় না, ব্যাকরণের আশ্রয় নিতে হয় না, অভিধানের কাছেও ঋণী হতে হয় না, আপনা আপনিই অর্থ বোধ হয়ে থাকে। প্রেমিকের হৃদয় রত্নাকর কেন? সেই হৃদয়ে প্রণয়রূপ অমূল্যরত্ন সদাসর্ব্বদা বিরাজিত। পাখী আকাশে উড়ে যায়, একা একা যায় না, দম্পতী। মন পড়ে থাকে কোথায়? বাসায় যদি শাবক থাকে, সেইখানে। শাবক যখন ছোট, তখন দম্পতী আকাশে উড়ে না, প্রসূতি শাবকগুলিকে বুকে কোরে নিরন্তর নীড়ে অব-স্থান করে, পুরুষ পাখী বনে বনে, বৃক্ষে বৃক্ষে, আহার অন্বেষণে ধাবিত হয়, কেন জান? স্ত্রীপুত্রকন্যার ভরণপোষণের জন্য।

মায়া! তুমি ধন্য! কুহকিনি! তোমারে নমস্কার। দেবি! তোমার চরণে শত শত প্রণিপাত, তোমারই উপদেশে এই মায়াময় সংসারে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার বর্গের প্রতিপালনে বিশ্বসংসারের সংসারী জীবকুলকে অবিরত ব্যস্ত থাক্‌তে হয়। আমরা মানুষ, ছোট ছোট ছেলেগুলিকে মানুষ করি কেন, অসময়ে এবং বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের প্রতিপালনের ভার লইবার জন্য? সকলের

ভাগ্যে সেটী ঘটে না সত্য, কিন্তু আশা তাই, পশুপক্ষীরা সন্তান-সন্ততি পালন করে কেন? কুহকিনী মায়া! কেবল তোমারি প্রতাপে, তোমারি শাসনে। বিরাল কুকুর, বনের পাখী, সন্তানের কাছে অসময়ে প্রতি পালনের আশা রাখে না, অথচ বহুযত্নে পালন করে, দেবি! সে কেবল তোমারি উপদেশ।

এখানে মায়ার কথা কেন? পশুপাখীর কথা কেন, হচ্ছিল এক নায়ক-নায়িকার কথা, বহুদিনের অদর্শন, বহুদিনের পর আকস্মিক দর্শন, বহুদিনের পর যুগল মিলন সূত্রপাত, এখানে এ সকল অপ্রাসঙ্গিক নূতন কথার আড়ম্বর কি জন্য, ভাবুকেরা এ প্রশ্ন কোর্ত্তে অবশ্যই কুণ্ঠিত হবেন, কিন্তু সাধারণ জন সমাজ,—যারা কেবল পাচালী ভালবাসে, তারাই এই প্রশ্ন কর্‌বার অধিকারী।

কেন জান? একটু পূর্ব্বেই বলা হয়েছে অনুমানে মিহিরমোহিনী বেশ্যা। এখন আরও নূতন অনুমান, মিহিরমোহিনীর মনের মূল্য চার পয়সা। তবে কেন এত সৃষ্টি শুদ্ধ মায়ার খাতির। মিহিরমোহিনীর মন যত ছোট, শশিকুমারের মন তত ছোট নয়, তাঁর মনের উপর মায়াদেবীর বড় দয়া। পশুপাখীর মায়াদয়ার মত শশিকুমারের মনের মায়াদয়া তত ক্ষণ-স্থায়িনী নয়। একবারের ভালবাসা ছিল, অগাধ অতলস্পর্শ সপ্রেম-হৃদয়ে প্রণয় সঞ্চারিত হয়েছিল, জন্মে ভোলা যায় না, সেই মায়ার অনুরোধে আমাদের শশিকুমার ভিকারীবেশে নায়িকার দ্বারদেশে উপস্থিত। সন্দেহ হয়েছিল, মিহির-মোহিনী অবিশ্বাসিনী, তথাপি সেই অবিশ্বাসিনী মিহির-মোহিনীকে নেত্রগোচর কর্‌বার আশায় শশিকুমার পাগল।

পাগল নয় কে? মায়ার সংসারে তুমি আমি সকলেই পাগল। শশি-কুমারের সঙ্গে মিহিরমোহিনীর পূর্ব্বে যে সম্পর্ক ছিল, মিহিরমোহিনী সে সম্পর্ক ভুলে যান। কিন্তু শশিকুমার ভুলে যান নাই। মিহির-মোহিনী মনের উল্লাসে অপর প্রেমে কুৎসিত আমোদে বিভ্রান্ত হয়ে শশিকুমারকে ভুলে গিয়েছিলেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো না, কত দিনের দেখা মনে ছিল না; সহসা পূর্ব্ব-স্মৃতির পুনরুদয়ে, নিশাকালে নিম্ববৃক্ষতলে উভয়ে একত্র।

হাসি কেবল ওষ্ঠে ওষ্ঠে উদয় হয়ে ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলিয়ে যায়, হাসি কি

কখনও কথা কয়? যে জানে, সেই জানে, হাসি আজ কথা কহিতেছে। কি কথা?

তুমি হাস লোকে হাসে নিজে আমি হাসি,
হাসিই আমার নাম হাসি ভালবাসি।
কেবা কারে ভালবাসে অখিল সংসারে,
দেখাবার তরে আমি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
পুরাতন ভালবাসা হইল নবীন,
পূর্ব্বরাগ ফিরে এলো ফিরে এলো দিন।
যোড়া গেল ভাঙা মন নবীন প্রণয়,
যখন নবীন ছিল মনে ছিল ভয়।
ঘুচিল সে ভয় আজি হাসিনু দুজন,
হাসি হাসি দেখালেম যুগল মিলন।

দ্বাদশ প্রবাহ।

নায়ক-নায়িকা।

"The Spirits I have raised abandon me:
The Spells which I have studied baffle me."
Manfred.

এক অরণ্য-সমীপবর্ত্তিনী নদী-তীরে বসিয়া অপ্সরাসুন্দরী রোদন করিতেছেন। কুমার ভূপেশচন্দ্র সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "কেঁদো না,—প্রাণাধিকে! কেঁদো না।"—প্রাণাধিকাকে কাঁদিতে নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু সেই বীরবর নিজে বীরহস্তে আপন নেত্র আবরণ করিয়া আপন অশ্রু

পরিমার্জ্জন করিলেন। ক্ষণকাল কি যেন স্মরণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "মধুমতি! শান্ত হও। আমি বোধ করি, এমন একটি সুসময় আসিতেছে, যে সময় আমরা সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্ট, সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে পারিব। প্রাণাধিকে! সত্যই সে সময় আসিয়াছে। এখন আমরা স্থির হইয়া ধৈর্য্য-সহকারে সম্মুখবর্ত্তী সমস্ত বিপদকে দমন করি এসো। আমি নরলোক, সৌভাগ্যের আশা অতি অল্প। হতভাগা, আত্ম-বিশ্বাসী, পদে পদে ভয়, কে যেন, কাহারা যেন, আমাকে দলন করিবে। প্রিয়তমে! তুমি কি এমন বিবেচনা কর যে, তোমাকে আমি মম বিপদের অংশী করিব? না, সমস্ত জগৎ একদিকে হইলেও আমি তোমাকে কোন বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিব না। তোমাকে আমি কতদূর ভালবাসি, তুমি তাহা না জানিতে পার, কিন্তু প্রাণাধিকে! তোমার নিমিত্ত আমি বিশ্ব সংসারের সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারি। আমার প্রণয়ে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। আমার প্রণয়ের প্রকৃতি এই যে, আমার নিজের অপেক্ষা তোমার সুখাশাকে উচ্চস্থানে সংস্থাপন করিব। সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আমি কেবল তোমারই মঙ্গল অন্বেষণ করি।"

"ভূপেশ! কি কথা বলিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হয়। এই কথা বলিয়া, অর্দ্ধ শঙ্কিত, অর্দ্ধ সন্দিগ্ধ, অর্দ্ধ আশ্বাসিত নয়নে অপ্সরা-সুন্দরী ভূপেশচন্দ্রের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিলেন।"

"শশিমুখি! তুমি আমাকে ভালবাসিয়া ব্রতবন্দী হইয়াছ; কিন্তু তোমাকে সেই ব্রতে জড়ীভূত করিয়া রাখা আমার উচিত হয় না। সে নিষ্ঠুর কার্য্যে আমার পাপ আছে। অপ্সরা! একটী ছোট কথায় বলি, আমাদের বিচ্ছেদ হওয়াই ভাল। তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা পাও; যাহাতে আর আমাকে মনে করিতে না হয়, তাহার উপায় শিক্ষা কর। তুমি—"

"যথেষ্ট! যথেষ্ট!! ভূপেশচন্দ্র! যথেষ্ট!!! আর না! আর আমি ইহা সহ্য করিতে পারি না!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দারুণ যন্ত্রণায় উভয় হস্ত পেষণ পূর্ব্বক অভাগিনী অপ্সরাসুন্দরী পুনরায় স্থিরনেত্রে ভূপেশের বদন নিরীক্ষণ করিলেন। সহসা অপ্সরার বদনে যেন সগর্ব্ব, সসন্তোষ, আলোহিত আভা

দীপ্তি বিকাশ করিল। তিনি প্রশান্ত, পরিষ্কারস্বরে ভূপেশচন্দ্রকে কহিলেন, "আমি তোমারে অপমান করিব না। ভূপেশ! আমরা উভয়ে পরস্পরে যে ব্রতে বাঁধা, তুমি সেই বন্ধন্ হইতে মুক্ত হইবার পন্থা অন্বেষণ করিতেছ, এ সন্দেহে আমি তোমারে অপমান করিব না। শৈশবকাল হইতে আমাদের উভয়ের জানা শুনা। তোমার সত্যবাদিতা, তোমার হৃদয়ের পবিত্রতা আর তোমার স্বভাবের মহত্ত্ব, আমার উত্তমরূপ জানা আছে। সে হৃদয়ে যে এতাদৃশ অনাচারিণী চিন্তার উদয় হইতে পারে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। শুন ভূপেশচন্দ্র! শুন, দেবতারা সাক্ষী থাকুন, আমি তাঁহাদের সাক্ষী হইতে ডাকি, যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটুক্, তোমার বিপক্ষেরা তোমারে যতদূর উৎপীড়িত করিতে পারে করুক্, গ্রাহ্য করি না; মাথার উপর একজন আছেন, তিনি সংসারের সাক্ষী, পাপপুণ্যের ফলদাতা; তিনি সাক্ষী, কোন্ দুরদৃষ্ট ঘটনা তোমার আমার বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে, ঘটাক, গ্রাহ্য করি না; আমার অদৃষ্টের জন্য আমার পিতার হৃদয়-ভাণ্ডারে কি অভিসন্ধি সঞ্চিত আছে, থাকুক, গ্রাহ্য করি না; যদি আর কেহ আমারে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, করুক, গ্রাহ্য করি না, তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা, চিরদিন তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অটল ভাবে সে পবিত্র-প্রণয়কে আমি হৃদয়ে ধারণ করিব। ভূপেশচন্দ্র! আমার যাহা বলিবার, তাহা বলিলাম; মন দিয়া শুনিয়াছ ত? অতীত অর্দ্ধঘণ্টা কাল আমার বুকের উপর যে প্রকাণ্ড পাষাণ চাপান ছিল, ঐ কথাগুলির সঙ্গে সেই মহা ভার আমার হৃদয় হইতে সরিয়া গেল।"

"অপ্সরা! প্রিয়তমে! আমি আর কি কথা কহিব? এমন অক্ষয়, অমর প্রণয়ের প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া কি কথায় আমি যে কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহা খুঁজিয়া পাই না। তেমন কথা বোধ করি পৃথিবীর অভিধানে নাই। না,—অপ্সরা! যে আশা এতদিন আমার অন্তরে প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সে আশাকে বিসর্জ্জন দিব না; আশার আশ্বাসে আশ্বাসিত, আমার নিষ্কলঙ্ক আত্মাকে নিরাশা সাগরে ডুবাইয়া ফেলিব না। ওঃ! নারীজাতির পবিত্র-প্রণয়ে নিশ্চয়ই কোন প্রকার স্বর্গীয়ভাবের আবির্ভাব আছে! তোমার ঐ ছোট ছোট বাক্যাবলীতে আজ আমার সে প্রত্যয় নিশ্চয়ই

জন্মিল। অপ্সরা! এই পবিত্র সত্য আমি গ্রহণ করিলাম ; তুল্য পবিত্রতায় সেই ব্রত অবশ্য আমি পালন করিবই করিব।"

ক্ষণকাল মধ্যেই হঠাৎ এই প্রেমিক-প্রেমিকা আপনাদের সমস্ত চিন্তা বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

* * * * * * * * * * *

অকস্মাৎ রোষ বিস্ময়-মিশ্রিত এক ভীমনাদ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। চঞ্চল চমকিতভাবে উভয়েই উঠিয়া দাড়াইলেন। সম্মুখে এক বিভীষণ মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তি নিবিড় কাননমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। কে তিনি? অপ্সরাসুন্দরীর পিতা, রাজা বিরাটকেতু।

"পাপীয়সি! বঞ্চনকারিণি!" অপ্সরাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া রাজা বিরাটকেতু সক্রোধে কহিলেন, "পাপীয়সি! বঞ্চনাকারিণি! এই নিমিত্তই বুঝি তুই প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নদীতীর ভ্রমণচ্ছলে বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিস্? আর তুই নরাধম!"—ভূপেশচন্দ্রের প্রতি সরোষ নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া, বিরাটস্বরে বিরাটকেতু কহিলেন, "আর তুই নরাধম! তুই আমার কন্যাকে চুরী করিতে অভিলাষ করিস্?"

"মহারাজ!" প্রত্যুৎপন্নমতি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ ত্বরিতস্বরে ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনার তনয়ার সহিত আমার পবিত্র প্রণয়! এ প্রণয় কেবল একা আমি হৃদয়ে ধারণ করিতেছি না; সমভাবে উভয়েই। শৈশবাবধি এই পবিত্র প্রণয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিপক্ব——"

"আর না!" স্বভাব সিদ্ধ কর্কশস্বরে বিরাটকেতু কহিলেন, "আর না! আর আমি শুনিতে চাই না!" স্বর ক্রমশঃ আরও অধিকতর কর্কশ হইয়া উঠিল। সেই উগ্রস্বরে তিনি পুনরায় কহিলেন, "আর একটা কথাও না! কলঙ্কিনি! স্বেচ্ছাচারিণি! হেথা আয়!" গর্জ্জনস্বরে কন্যাকে এই কথা বলিয়া সবলে অপ্সরার হস্ত ধারণপূর্ব্বক নিকটে আকর্ষণ করিলেন। পুনর্ব্বার কহিলেন, "আয়! আমার সঙ্গে ঘরে আয়! আমি তোরে সোজা করিয়া লইব। বন পর্য্যটন বন্ধ করিয়া দিব। আর তুই ভীরু, কাপুরুষ, ভূপেশ সিংহ! তোরে আমার দুটী একটী কথা বলিবার আছে। রাজাধিরাজের আদেশ, তোর সেনাপতিত্ব পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এই কথা বলিবার জন্য আমি তোর বাসস্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। দেখিতে পাই নাই। পঞ্চদশ দিবসের বেতন বাকী আছে, এই গ্রহণ কর্। শীঘ্র এদেশ হইতে দূর হইয়া যা।" রুক্ষস্বরে এই কয়টী কথা বলিয়া, কয়েকখণ্ড রজতমুদ্রা ভূপেশের পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। ভূপেশচন্দ্র আট হস্ত দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন, মুদ্রার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। রাজা বিরাটকেতু কন্যাকে আকর্ষণ করিয়া রাজপথাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া কুমারী অপ্সরাসুন্দরী একবার সজলনয়নে ভূপেশের প্রতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিপাত করিলেন। সে যে দৃষ্টিপাত, সে দৃষ্টিপাতের যে কি নিগূঢ় অর্থ, পৃথিবীর কোন ভাষার কোন বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। সেই দৃষ্টিপাত অপ্সরাসুন্দরীর ওষ্ঠনির্গত অকপট ব্রতকথা ভূপেশের মনে পুনঃস্মরণ করাইয়া দিল। অপ্সরা যখন আবার মুখ ফিরাইলেন, সেই সময়ে তাঁহার বিম্বাধরে সুমধুর বিদায়ী হাসি দেখা দিল।

প্রেমিক প্রেমিকা উভয়েই কাননপথে নদী-তীরে উপবিষ্ট ছিলেন। অপ্সরা চলিয়া গেলেন, যতক্ষণ দেখা গেল, ভূপেশচন্দ্র ততক্ষণ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে তিনি উদাসমনে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশিলেন। হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল, বনে বসিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে সেই আঘাতের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অপ্সরাকে লইয়া বিরাটকেতু কোথায় চলিয়া গেলেন, কিছুই স্থির হইল না। যেরূপ ক্রোধের আবির্ভাব দেখা গেল, তাহাতে অপ্সরার পক্ষে হয় ত কোন অমঙ্গল ঘটনা হইতে পারে। স্নেহকাতর প্রেমিকের মনে প্রেমিকার অমঙ্গল আশঙ্কাই আগে হয়। ভূপেশচন্দ্র নিজের আঘাতের চিকিৎসা করিবেন কি, অপ্সরার চিন্তায় তাঁহার ব্যাকুল হৃদয় আরও অধিকতর আন্দোলিত হইয়া, প্রবল বাতাহত তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গিত হইতে লাগিল।

— —

ত্রয়োদশ প্রবাহ।

তরঙ্গিণী তটে।

কোথা যাও স্রোতস্বতি! আপনার মনে,
কারো কথা শুনিছ না, কেন লো ললনে?
আকাশে বাতাস নাই তবে কেন ঢেউ,
ছুটে ছুটে চলিতেছ, মারিছে কি কেউ?
বুঝেছি বুঝেছি সাধ্বি! বক্ষ উঁচু করি,
হিল্লোলিয়া যাইতেছ বুকে করি তরি;
মহাবেগে ছুটিতেছ মহানন্দ ভরে,
প্রেমানন্দে মিশিবারে অনন্ত সাগরে।

আর্য্যরত্ন।

একটী যুবতী কামিনী প্রয়াগধামের ত্রিবেণী-সঙ্গমে এলোচুলে দাঁড়াইয়া। বেলা প্রায় একপ্রহর। তীরে আর কেহ নাই, অনেক নর-নারী নদীজলে স্নান করিতেছে। সলিলের তরঙ্গ পবনের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেই সকল নর-নারীর অঙ্গস্পর্শ করিতেছে। পবনের একটুও লজ্জা নাই।

যমুনাতীরে দাঁড়াইয়া এলোকেশী কামিনী কি নিরীক্ষণ করিতেছেন? তাঁহার মনের কথা কে বলিবে? দৃষ্টি অচঞ্চল ভাবে নদীর জলের দিকে বিনিক্ষিপ্ত; এক একবার উদ্ধনেত্র হইয়া আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতেছেন; বদন বিষণ্ণ, কি বিষাদে বিষাদিনী, বিষাদিনীকে জিজ্ঞাসা না করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর পাওয়া দুর্ঘট।

যুবতী দেখিতে পরম সুন্দরী। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, গঠন মধ্যবিধ, শরীর নিতান্ত স্থূলও নহে, কৃশও নহে, হস্তপদ সুডৌল ও মোলায়েম, বক্ষঃস্থল সম্ভবমত সমুন্নত, মস্তকে চাঁচর-কেশ, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া

প্রায় উরুদেশ স্পর্শ করিতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কেশ আলুলায়িত; নেত্রদ্বয় কবিবাক্য প্রমাণে সফরী সদৃশ, নীলাভ তারকা, সেই উজ্জ্বল নীল তারকা দুটী সতেজে সমুজ্জ্বল, কপোলের পার্শ্বে কর্ণসমীপে ভ্রমর-পংক্তির ন্যায় কৃষ্ণ অলকদাম অতি চমৎকার শোভা বিকাশ করিতেছে। পৃষ্ঠকুন্তল ও অলকমালা উভয়ই মৃদু মৃদু পবনান্দোলনে আন্দোলিত। নাম অপ্সরাসুন্দরী, বয়স অনুমান সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বর্ষ।

আমাদিগের দেশের মহাকবিগণ এক এক বিষয়ে প্রকৃতি সতীর গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, সলিলে পদ্মফুল ফোটে। পঙ্কে ইহার জন্ম, সুতরাং অভিধানে পদ্মের একটী নাম পঙ্কজ। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই প্রসঙ্গে এক স্থলে অত্যন্ত হাসাইয়াছেন। এদেশের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত জানেন, পঙ্কেই কিম্বা পঙ্কিল জলেই কমলের জন্ম হয়, কিন্তু মাইকেল একজন দেশ-বিখ্যাত সুশিক্ষিত কবি হইয়াও একখানি কাব্যের এক স্থলে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?"

কবির মুখে এমন হাস্যময় রহস্য অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত কবিগণ আরও অধিক দূর গাঢ়ভাব প্রকাশ করিতে কৌতুকান্বিত। কাব্যের রস রক্ষা কি সহজে হয়? স্বচ্ছ সলিলের সৌন্দর্য্য বর্ণন সময়ে তাহারা এক প্রকার নূতন ভাব ও নূতন রস সংযোজন করিয়া দেন। মরাল মরালী, ডাহুক ডাহুকী, ইত্যাদি যেমন জল-শোভা সম্পাদন করে, পদ্ম তদপেক্ষা অধিক শোভা সম্পাদক। সুতরাং জলশোভা বর্ণনের অবসর উপস্থিত হইলেই সুরসিক কবিগণ পদ্মের কথাটী সর্ব্বাগ্রেই উপস্থিত করিয়া থাকেন। সে স্থলে সে অবসরে কেবল সরোবরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নিরস্ত হইতে পারেন না। সকলেই জ্ঞাত আছেন, স্রোতের জলে নলিনী প্রস্ফুটিত হয় না; কিন্তু ঋষিবাক্য প্রমাণে কাজেই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, স্রোতের জলে পদ্মিনী ফুটিয়া থাকে। কে জানে হ্রদ, কে জানে খাল, কে জানে বিল, কে জানে সরোবর, কে জানে নদী, এমন কি, কে জানে সমুদ্র, যেখানে জল থাকে, পদ্মকে সেখানে ফুটিতেই হইবে।

কিন্তু যমুনা আমাদের কবিগণকে অপমান করিতেছেন। যমুনার জলে পদ্মফুল নাই। যমুনা নর নারী বুকে করিয়া বায়ু-হিল্লোলে নৃত্য করিতেছেন। যমুনার জল নীলাভ, সেই জলে দিবাভাগে সূর্য্যদেবসহ নীলাকাশের ছায়া পড়ে, নিশাকালে গ্রহনক্ষত্রসহ নীল জলে নীল আকাশের ছায়া পড়ে, অতি চমৎকার শোভা হয়। বোধ হয় যেন পৃথিবীর জলতলে নূতন একটী আকাশ সৃজিত হইয়াছে।

তাহা ত হইল, যমুনার নীলজলে যেন একটী নূতন আকাশই সৃজিত হইল, কিন্তু এখন? এখন সেই জলে কিসের ছায়া পড়িতেছে?

এ নূতন প্রশ্ন কেন? দিবা এক প্রহর, আকাশে নবীন সূর্য্য, কোথাও একবিন্দু মেঘ নাই, গগনমণ্ডলের পবিত্র ছবি যমুনার স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত; তবে এ নূতন প্রশ্ন কেন?

প্রতিবিম্ব খণ্ড খণ্ড। পবনের খেলা অতি বিচিত্র। যখন কোথাও বাতাস না থাকে, তখন জলে আর গাছের মাথায় পবনের বড় চমৎকার খেলা হয়। কি বলিব তিনি দেবতা, মানুষ হইলে বলিতাম, তাহার পক্ষপাত বড়। জলকে হয় ত তিনি ভালবাসেন, বৃক্ষপত্রকে হয় ত তিনি ভালবাসেন, সলিলবাসিনী কমলিনী ও কুমুদিনী সতীকে হয় ত তিনি ভালবাসেন। শেষের দুটী নাম উল্লেখ করা হইল কি জন্য? কেন না, সরোবরের জলে যখন ঢেউ না থাকে, তখনও দিবসে কমলিনী, রজনীতে কুমুদিনী, পবনের প্রতাপে অল্প অল্প কাঁপেন। কমল-বন্ধু প্রভাকর সহস্র করে কমলিনীকে আলিঙ্গন করেন, তথাপি মধুলোভী মধুকর গুন্ গুন্ গুঞ্জনে উড়িয়া উড়িয়া কমলের কমল মুখে মধু পান করিতে আইসে, আকাশে স্বামী, পার্শ্বে পবন, কমলের বড় লজ্জা হয়। নববিবাহিতা বধূর ন্যায় নীরবে মাথা নাড়িয়া ভ্রমরকে নিকটে আসিতে বারণ করেন, রাত্রিকালে কুমুদিনীও তাহাই করেন। আনন্দে বায়ু-দেবের নৃত্যের বিরাম থাকে না।

আমরা হয় ত পাপী হইলাম। পবন দেবকে পক্ষপাতী বলা হইয়াছে, তিনি হয় ত ক্রোধ করিয়া আমাদিগকে ভস্ম করিতে পারেন। ভস্ম করিবার শক্তি কাহার? আগুনের। আগুন আবার পবনের বন্ধু। আগুনের একটী নাম বায়ু সখা।

এটী কি সত্য কথা? উত্তর করিতে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। সখার কার্য্য সখায় করিয়া থাকে, কিন্তু সখা কখন শত্রুর কার্য্য করে, এমন কথা কি কেহ শুনিয়াছেন? সংসারেই আমরা এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিব।

পাঠক মহাশয় মনে করুন, আপনি একদিন বড়মানুষ ছিলেন। অনেক পারিষদ, অনেক মোসাহেব নিত্য আপনার উপাসনা করিত, অদৃষ্টচক্রের এক পরিবর্ত্তনে আপনার সেই সৌভাগ্য-দিন অদৃশ্য ভাবে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আপনি তাহা জানেন না। দিন ফিরিয়া গিয়াছে, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, গজভুক্ত কপিথ-বৎ আপনি যেমন তেমনি রহিয়াছেন, কিন্তু আপনার ভিতরের সারভাগ উড়িয়া গিয়াছে! আর কেহ আপনার উপাসনা করিতে দ্বারে উপস্থিত হয় না, আপনার জয় কীর্ত্তন করিয়া পারিষদ লোকেরা আর গদির উপর জানুস্পর্শ করিয়া বাবু অপেক্ষা আমি আর বেশী ছোট নই, বাবু বড়, আমি ছোট; সে কথা বলিয়া আর কেহ আপনার নিকটে খোসামোদ করিতে আইসে না। আপনি একবার হাই তুলিলে এক কালে শত হস্তে তুড়ি বাজিত, আপনার নাসিকায় একবার একটী হাচি আসিলে জীব জীব শব্দে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইত, এখন আর সে তুড়ি বাজে না, এখন আর সে প্রতিধ্বনি হয় না। লোকের মুখে আপনি এখন শুনিতে পান, ছোট বাবু দেউলে। বক্তার মুখে, জনরবের সহস্র রসনায় আপনি চাপা দিতে পারেন না, সত্য সত্য দুর্ভাগ্য আপনাকে আলিঙ্গন করিয়াছে।

একটী শ্লোক আছে, যে শ্লোকের সিকি আমি একটু পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়া দিয়াছি, উচ্চ হইতে অধঃপতিত ধনবান দরিদ্র পাঠকমহাশয়কে সেই শ্লোকটী আজ সম্পূর্ণ স্মরণ করিতে হইবে।

"আজগাম যদা লক্ষ্মী নারিকেল ফলাম্বুবৎ।
নিজ্জগাম তদা লক্ষ্মী গজভুক্ত কপিথবৎ॥"

এ শ্লোকের অর্থ এই যে, নারিকেল ফলে যখন জল সঞ্চার হয়, কোথা দিয়া হয়, কেহই জানে না, কেহই দেখিতে পায় না। সেই রূপ ভাগ্যবানের

ভাগ্যে অলক্ষিতে লক্ষ্মীর সঞ্চার। হাতীতে যখন কৎবেল খায়, তখন ফলের কোন অংশে ছিদ্র মাত্র দেখা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে শূন্যগর্ভ।

আপনারও যেন এখন সেই দশা। বসন্তের কোকিলের মত সুসময়ে যাহারা আপনার বৈঠকখানা-কুঞ্জে শুভাগমন করিয়া সুমধুর পঞ্চমে সুমধুর ঝঙ্কার দিত, বর্ষার কোকিলের মত এখন তাহারা নিরুদ্দেশ,—নিস্তব্ধ। আপনি যদি আজ পদব্রজে তাহাদের দ্বারস্থ হন সমাদরে বাবু বলিয়া পুনঃ পুন আহ্বান করেন, গৃহে থাকিয়াও তাহারা উত্তর দিবে না। বিরাম-কক্ষের গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত থাকিলে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিবে, কেন না, আপনি দেউলে, দরিদ্র, নিঃসম্বল! পাছে কিছু চান, এই ভয়।

যমুনাতীরে কামিনী, জলে আকাশের ছায়া, পদার্থে পদার্থে পবনের প্রণয়, এ প্রাকৃতিক প্রসঙ্গে দেউলে বড়মানুষের দৃষ্টান্ত কেন? কারণ আছে। সে কারণের কারণ কে? পবন দেব। কি জন্য? তিনি বায়ুসখা।

আবার সেই কথা। হুতাশন সত্যই কি বায়ুসখা? অবশ্যই হইতে পারে। উভয়েই উভয়ের সখা, কিন্তু প্রভেদ এই, প্রবল আর দুর্ব্বল; প্রবলের সখা প্রবল, দুর্ব্বলের সখা দুর্ব্বল। প্রবল কখন দুর্ব্বলের সখা হয় না, দুর্ব্বল কখন প্রবলের সখা হয় না। যেখানে হয়, সে স্থান পবিত্র, যাঁহারা হন, তাঁহারা সাধু।

আপনি একটী প্রদীপ জ্বালিয়া রাখুন, অগ্নিসখা পবনদেব নিকটে আসুন, সে ক্ষুদ্র আলো উজ্জ্বল করিয়া দিবেন না, নির্ব্বাণ করিয়া দিবেন। কেন জান, দীপশিখা দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের কাছে বন্ধু কখন বন্ধুর কার্য্য করেন না, সেই জন্য হুতাশনসখা পবনদেব দুর্ব্বল প্রদীপটি নিবাইয়া দিবেন।

আর?—সখা তবে কখন? অগ্নি যখন প্রবল। গৃহস্থের গৃহে আগুন লাগুক, পাবকসখা পবন তখন স্বীয় পুত্র হনুমানের মত বীর প্রতাপে মূর্ত্তিমান হইয়া যথাশক্তি সহায়তা করিবেন, অভাগার গৃহ-সংলগ্ন সর্ব্বনাশ-কর দুর্জ্জয় হুতাশনকে সমুচিত উৎসাহ দানে প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দরিদ্র কুটীর ছারখার করিয়া দিবেন। কেবল একখানি মাত্র নয়, সহস্র সহস্র। নির্ব্বাণের চেষ্টা হইলে অন্ততঃ শত শত। সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। দুই সখা একত্র।

পবন হিল্লোলে যমুনা-জল দুলিতেছে। এখানে ত পবন আগুন জ্বালিতেছে না। সমুদ্রের জলে বাড়বানল জ্বলে, যমুনায় ত বাড়বানল নাই, এ মেয়েটী সূর্য্যকন্যা। সূর্য্যের নাম কলিন্দ, এই প্রমাণে যমুনার নাম কালিন্দী। একজন কৃষ্ণভক্ত কবি, কৃষ্ণকে আর যমুনাকে এক সঙ্গে মিলন করাইয়া ভক্তিভাবে কহিয়াছিলেন।ঃ—

"কলিন্দ-নন্দিনী-তটে ব্রজে শ্রীনন্দ-নন্দন।"

এ কথায় আমরা কি বুঝিলাম? কালিন্দীকূলে শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন।

এখানে তাহার কি? একটী এলোকেশী কামিনী। যমুনাজলে তাহারই ছায়া, আমরি কি সুন্দর। বিষাদিনীর বিষণ্ণ বদন, ক্রমশঃই বিষণ্ণ, মরীচিমালী ভাস্কর ধীরে ধীরে পশ্চিমে একটু একটু অগ্রবর্ত্তী, বেলা প্রায় দুই প্রহর হয় হয়। যাহারা স্নান করিতেছিল, জলকেলি সমাপন করিয়া একে একে তাহারা তীরে উঠিল, এলোকেশীর দিকে চাহিতে চাহিতে পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে সকলেই চলিয়া গেল। কেবল একটী মাত্র রমণী যমুনাজলে আবক্ষ ডুবাইয়া তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। কালিন্দীর কাল-জলে এলোকেশী সুন্দরীর ছায়া পড়িয়াছে।

কাল জলে কত ছায়া পড়ে, কে তাহা চাহিয়া দেখে?—তরুছায়া,—লতাছায়া,—পল্লবছায়া,—গগনছায়া,—সব ছায়াই জলে পড়ে। এখানে একটী এলোকেশী সুন্দরী কামিনীর ছায়া পড়িয়াছে।

চতুর্দ্দশ প্রবাহ।

বিরহ সন্তাপে।

"মলিন বদনা দেবী, হায়রে যেমতি,
খনির তিমিরগর্ভে • • সূর্য্যকান্তমণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে ;
• • • •
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা,
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া।"

মেঘনাদ বধ।

অপ্সরাসুন্দরী একাকিনী নদীকূলে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ক্ষণকাল পরেই একটী সঙ্গিনী মিলিল। যে রমণী যমুনা-সলিলে ক্রীড়া করিতেছিল, সহাস্য-বদনে আর্দ্র বসনে সেই রমণী ধীরে ধীরে তীরে উপস্থিত। মৃদুমন্দ গমনে ক্রমে ক্রমে অপ্সরার নিকটে।

লোকের বিমর্ষ বদন নিরীক্ষণ করিয়া মুখে হাসি আইসে, সংসারে এমন লোক ক-জন আছে? অপ্সরাসুন্দরীর বিমর্ষ বদন দর্শনে হৃদয়ে অবশ্য দয়ার আবির্ভাব হয়, কিন্তু নিকটবর্ত্তিনী সিক্তবসনা ললনা অপ্সরাকে দেখিয়া হাস্য করিল কেন? বোধ হয় ইহার মধ্যে কোন কিছু নিগূঢ় ভাব থাকিতে পারে।

পাঠক মহাশয়! এই স্থলে এই নব সঙ্গিনীর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় অবগত হওয়া আপনার আবশ্যক। রমণী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, একটু বেঁটে, মুখখানি বাদামে, ঠোঁট কিছু পুরু, কপাল চৌরস, চক্ষু ডাগর, মস্তকের কেশ কিছু খাট খাট, কিন্তু মিশ কাল, মুখখানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি, বয়স অনুমান একবিংশতি বর্ষ, নাম শ্যামাঙ্গিনী।

শ্যামাঙ্গিনী নিকটে আসিয়া সেইরূপ সহাস্যবদনে অপ্সরাকে কহিল, "আয় ভাই! একাকিনী এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লে আর কি হবে?"

"কি হবে তা জানি না, কিন্তু আমি যাব না।"

"যাবে না? যমুনার সঙ্গে একদিনে তোমার এতই ভাব হয়ে গেল, আমি কি তোমার পর হলেম?"

আমার আর আপনার পর কি ভাই? তুমিও যেমন আমার আপনার, এই কালিন্দী যমুনাও তেমনি আমার আপনার। তুমিও যেমন আমার পর নও, এই যমুনাও তেমনি আমার পর নয়।"

"বুঝ্‌তে পাল্লেম না।"

অপ্সরার বিমর্ষ বদনে একটু হাসি আসিল, সে হাসি বিদ্রূপের হাসি, ঘৃণার হাসি, অভিমানের হাসি, বিরহ সন্তাপের হাসি, আনন্দের হাসি নয়, হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "পাল্লে না?"

"না।"

"তবে একটু বুঝিয়ে বোল্‌তে হলো। সংসারে সকলেই এখন আমার আপনার।"

"যদি তাই, তবে আমার কথা শুন্‌ছো না কেন?"

"কি কথা তোমার?"

"ঘরে চল।"

"আমার ঘর নাই।"

"তবে যে এই মাত্র বোল্লে, সকলেই তোমার আপনার।"

"আর এখন যদি বলি, সংসারে কেউ আমার আপনার নয়।"

"দু-কথা হয়।"

"সে ভয় আমার ভাল হয়ে গেছে।"

"তবে কি তুমি যাবে না?"

"না।"

"তবে কি কোর্‌বে?"

"যা মনে আছে।"

"কি আছে মনে?"

অপ্সরাসুন্দরী অনেকক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া মনে মনে কি চিন্তা করিয়া নিরাশব্যঞ্জক হাস্য সহকারে ধীর মৃদুস্বরে কহিলেন, "কিছুই নেই।"

"তবে ?"

"তবে কথার উত্তর আজ থেকে—এখন থেকে এই অপ্সরার মুখে আর কেউ কখনও শুন্‌বে না।"

"আবার ভাই গোলমালে ফেলে দিলে ?"

"গোলমাল ?—পৃথিবীর গোলমাল থেকে যত শীঘ্র সোরে যেতে পারি, ততই আমার মঙ্গল।"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শ্যামাঙ্গিনী কহিল, "বুঝেছি, জীবন-বৈরাগ্য।"

"ঠিক তাই।"

"আমি সে কথা শুন্‌বো না, ঘরে তোমারে আজ্ নিয়ে যাবই যাব। তোমারে ছেড়ে কখনই আমি ঘরে ফিরে যাব না।"

আবার অপ্সরার বিমর্ষ মুখে হাসি আসিল। জগৎমোহন মুখে জগৎ-মোহিনী হাসি হাসিয়া বিষাদিনী অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ঘরেই ত যাচ্ছি।"

"যাচ্ছ যদি, তবে যাবনা বোল্‌ছো কেন ?"

"একটু বিলম্ব।"

"স্পষ্ট কথা কওনা ভাই! মনে তোমার আছে কি ?"

"তা যদি জান্তে, তবে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে না।"

"এখন তুমি কোর্‌বে কি ? শুন্‌তে চাই, সাফ কথা, সাদা কথা।"

"সাফ কথা, সাদা কথা, আমি আর ঘরে ফিরে যাব না, মরিব।"

"মরিবে ?"

"হুঁ।"

"কোথায় ?"

যমুনার জলের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া উদাস ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া উন্মাদিনী, এলোকেশী, বিষাদিনী জোরে জোরে বলিলেন, "ঐখানে।"

অনেকক্ষণ শ্যামাঙ্গিনীর মুখে কথা ফুটিল না। স্থিরনেত্রে অপ্সরার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কম্পিতস্বরে কহিল, "সে কি দিনের বেলা?"

"আমার আর রাত দিন কি ভাই?"

"দিনের বেলা অনেক লোক স্নান কোরতে আসে যায়।"

"জানি।"

"তারা কি বাধা দেবে না?"

"কার সাধ্য!"

"তবে কি নিশ্চয়ই মরিবে?"

"হুঁ।"

দক্ষিণ দিক হইতে একটী শব্দ আসিল। হিল্লোল হিল্লোল শব্দে ধোঁতো ধোঁতো করিয়া একখানি পাল্কী আসিয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইল। কে দেখে? কে শোনে? অপ্সরা উন্মাদিনী। অন্যমনস্কভাবে শ্যামাঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জান তুমি যমুনা কে?"

"না।"

"যমুনা আমাদের যম রাজার ভগ্নী।"

"এ ভাই বিষম সমস্যা।"

"কেন?"

"কেন? কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয়ার ভাই ফোঁটা মনে পড়ে?"

"তাতে কি?"

"কি?—

প্রীতায় যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ?"

শ্যামাঙ্গিনী হাস্য করিয়া বলিল, "বৎসরে একদিন অন্য লোকের মুখে এ মন্ত্র শুনি, মানে জানি না, তুমি যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, এটীও এতদিন আমার জানা ছিল না।"

পাল্কীর ভিতর হইতে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ বহির্গত। সাটিনের পোষাক পরা, মাথায় পীতস্বরী পাগ, গলদেশে সুদীর্ঘ জরিমোড়া শৃঙ্খল, পেষবন্ধে কিরিচের সঙ্গে তরবারি। জোরে অপ্সরাকে আলিঙ্গন করিয়া সেই অস্ত্রধারী বীরপুরুষ শিবিকামধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

বেহারারা তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া শিবিকাস্কন্ধে দ্রুতপদে উত্তর মুখে ছুটিয়া চলিল। পশ্চাতে শ্যামাঙ্গিনী।

কেন? শিবিকার সঙ্গে শ্যামাঙ্গিনী কেন? সে কি কোন বড়মানুষের বাড়ীর পরিচারিকা?

কে জানে? এখন ত ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই, গৃহিণী কি পরিচারিকা, অপরিচয়ে অনুমানে কিরূপে বুঝা যাইবে?

বীর পুরুষের রূপ বর্ণনা করিবার অবসর নাই। পাল্কী ছুটিতেছে। এমন সময় ভাল করিয়া চেহারা দেখা অসম্ভব। আমাদের চক্ষু নক্ষত্র গতিতে ছুটিতে জানে না, কালিন্দীকূলে যখন দেখা গেল, তখনও নিরীক্ষণ করিবার অবসর হইল না, কি বলিয়া বলি, সে মূর্ত্তি কি প্রকার।

ভগবান ভাস্কর মধ্যগগনে আরোহণ করিয়া প্রচণ্ড প্রখর-তেজে বিরিঞ্চির জগৎ সংসারে অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন। পুড়াইয়া মারিবেন কি? না ত! সূর্য্যকে লোকে জগৎচক্ষু বলিয়া সম্ভ্রম দেন, সমাদর করেন। তিনি বিশ্বসংসার দগ্ধ করিবেন কেন? সময়ের ধর্ম্ম, সময়ের গর্ব্ব, সময়ের খেলা ইহার প্রশ্নকর্ত্তা ও মীমাংসাকর্ত্তা কে? দেখিবেন, শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক ভীষণ রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে, জনপদ-পথে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিচরণ করিতেছে, পিপাসার্ত্ত মহিষকুল সুপঙ্কিল ক্ষুদ্র জলাশয়ে সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া কেবল নাসারন্ধ্র বাহির করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস-বায়ু বহির্গত করিতেছে। পথভিকারী বৈষ্ণবের ন্যায় রাস্তার বেকার কুকুরেরা এক বেলার ভিক্ষা অবসানে কোন জলাশয়ের কূলে, কোন দয়াময় বৃক্ষতলের ছায়ায়, কোন দয়াময় গৃহস্থের দ্বারদেশে, অথবা কোন দোকানদারের দোকানের পাটাতনের নীচে জিব বাহির করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাসে হাঁপাইতেছে, যাহারা নিতান্ত নিরীহ, তাহারা অকাতরে ঘুমাইতেছে। সমস্ত লোক ব্যতিব্যস্ত।

কেন গা? সূর্য্যদেব এতই কি মহাপাপী? তিনি কি জগৎসংসারকে জ্বালাতন করেন? না ত। তিনি জগৎসংসারের উপকার করেন। তেজ আছে, অহঙ্কার আছে, সত্য, কিন্তু তেজের কি পতন নাই? অহঙ্কারের কি দণ্ড নাই? কেন থাকিবে না? এই দেখ, এই দেখ, এখনি এই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের আশু পতন হইবে।

মহাকবি কালিদাস,—অশ্লীলতা-নিবারণী সভা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন,—মহাকবি কালিদাস এই উত্থান-পতনের উপমার রহস্য স্থলে বলিয়া গিয়াছেন, যুবতীর স্তন যত উচ্চে উঠিতে পারে উঠুক, যৌবনের গর্ব্ব যত উচ্চ হইতে পারে হউক, কিন্তু পতন আছে। যৌবনান্তে, কিম্বা হয় ত পূর্ণ যৌবনেই সুন্দরী যুবতীর স্তন নতমুখ হইয়া সাগরগামিনী স্রোতস্বতীর মত নিম্নভাগে বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে। আমাদের দিবা-দেবতা মহাতেজস্বী প্রভাকর এই বিষয়ের প্রবল দৃষ্টান্ত। উজ্জ্বল দিবা দ্বিপ্রহর। সূর্য্যের যত তেজ ছিল, বেলা দুই প্রহরের সময় মধ্যগগন হইতে ধরাতলে তাহা সতেজে বর্ষণ করিলেন। তাহার পর আর কতক্ষণ? উচ্চে উঠিলেই শীঘ্র শীঘ্র পতন। ক্রমেই পশ্চিমে ঢল্‌কাইয়া পড়িতে লাগিলেন। মাতাল যেমন অধিক মাত্রা পান করিলে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে, মহর্ষি কশ্যপের পুত্র দিননাথ দিবাকর সেইরূপ অধিক মাত্রায় তেজস্বিতা দেখাইয়া অল্পে অল্পে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

বেলা আড়াই প্রহর। একটী মনোহর উদ্যানে পাল্কী পৌঁছিল। উদ্যান-রক্ষক তটস্থ হইয়া সেই সাটিনের পোষাক পরা বীর পুরুষকে দক্ষিণ হস্তে অভিবাদন করিল। শ্যামাঙ্গিনী তখন অনেক পশ্চাতে। ফটক বন্দ হইয়া গেল। অপ্সরাসুন্দরী উদ্যানবাটিকার একটী নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অস্ত্রধারী অদৃশ্য।

এ আবার কি ভাব? দেব-দানবেরাই মায়া জানেন, ভোজ রাজার অনুচরেরাই মায়া জানে, কিন্তু সাধারণ মানুষের এ কি মায়া? এই ছিল, এই নাই! এ কি আশ্চর্য্য খেলা! যমুনা কূলের এলোকেশী অপ্সরা আবার এখানে একাকিনী।

শ্যামাঙ্গিনী কোথায়? পদব্রজে রাজপথে। পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়াছিল, দুই দণ্ড পরে ফটকে আসিয়া পৌঁছিল। দরজা বারিত। খুলিয়া দিবার হুকুম দেয় কে? প্রহরী গিয়া আরজ করিল, স্বামী উপস্থিত নাই। অপ্সরাসুন্দরী মৃদু বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

প্রহরী উত্তর করিল, "একটী স্ত্রীলোক।"

"নাম কি?"

ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া প্রহরী উত্তর করিল, "কুলবালার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে নাই, তথাপি নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বলে না।"

"জিজ্ঞাসা কোরেছিলে ?"

"না।"

"কর।"

প্রহরী চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "শ্যামাঙ্গিনী।"

"খুলিয়া দেও, আসিতে বল।"

পাঁচ সাত মুহূর্ত্ত মধ্যে যুগলে আবার একত্র।

শ্যামাঙ্গিনী কহিল, "এ কি ভাই তোমার ?"

"জানি না।"

"তবে সে বীরবর তোমারে এখানে আনিল কেন ?"

নিশ্বাস ফেলিয়া অপ্সরা কহিলেন, "জানি না।"

"তবে তুমি কাহার জন্য উদাসিনী ? কাহার জন্য উন্মাদিনী ?"

অর্দ্ধদণ্ড পরে প্রত্যুত্তর নিশ্বাসে অপ্সরা উত্তর করিলেন, "উহারি জন্য।"

এই উত্তরের সঙ্গে অপ্সরাসুন্দরীর চক্ষে শ্রাবণ মাসের জলদ-বর্ষিত জলধারার ন্যায় অনর্গল বারিধারা।

শ্যামাঙ্গিনী কহিল, "তুমি কাঁদ কেন ?"

"পৃথিবীতে আমি কাঁদিব না ত কাঁদিবে কে ?"

"কেন ?"

"তা জানি না, কাঁদিতে আসিয়াছি, কাঁদিতে রহিয়াছি, কাঁদিয়া মরিব।"

"এ ভাই তোমার মর্ম্মভেদী কথা।"

উদাস হাসি হাসিয়া অপ্সরা কহিলেন, "কোন্ কথা আমার মর্ম্মভেদী নয় ?"

"মিলন ত হয়েছিল।"

"সে মিলনে আমার প্রয়োজন নাই।"

"তবে কেমন মিলন তুমি চাও ?"

"মনে একটী ছিদ্র আছে, যত দিনে সেই ছিদ্র পূর্ণ না হয়, ততদিন

আমার এই দশা। আর সেই দশার অবসান হবে না বলেই যমুনা-জীবনে জীবন বিসর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা।"

"তবে সত্যই কি সখি আমারে পরিত্যাগ কোরে ধর্ম্মরাজের ভগ্নীর সহচারিণী হবি?"

"আমি তার কি জানি? যিনি প্রেরণ করেছেন, তিনিই জানেন। যিনি বিবাসিনী হতাশ্বাসিনী করে এই অভাগিনীবে পরিত্যাগ করে গিয়েছেন, সেই মনোময়, প্রাণময়,—না ভাই, আর আমি বল্‌তে পারি না।—বাতাস আমার রসনাকে ক্ষণে ক্ষণে যেন স্তম্ভিত কোরে রাখ্‌ছে।"

"আর যদি সেই মনোময়কে তুমি পাও?"

"দুরাশা।"

"না ভাই! দুরাশা নয়, সেই তোমার মনোময় তোমার জন্যেই পাগল।"

দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিয়া, অপ্সরাসুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন।

বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন করিয়া দিয়া সান্ত্বনাবাক্যে শ্যামাঙ্গিনী কহিলেন, "বৃথা আশঙ্কা।"

"বৃথা? তবে কি স্বপ্ন? যে আমার মনোরাজ্যের রাজা, সে কি আমাকে মনে করে?"

"তোমার দশায় আর তার দশায় যদি তুলনা করে দেখা যায়, এক তুলামান যন্ত্রে দুই জনকে যদি ওজন করা যায়;——"

"তা হলে কি হবে?"

"হবে এই, তাতে তোমাতে——"

"তাতে কাতে?"

"তোমার চিত্তচোরে।"

"চিত্তচোর আমার কোথায়?"

"নিকটে।"

একটী, দুটী, তিনটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী উচ্চ উচ্চ হাস্য করিলেন। কে কাহার কথা শোনে, কে কাহার কথার উত্তর করে, সময় ছুটিয়া যাইতেছে। অনন্তস্রোতা নদী যেমন অগাধ অতলস্পর্শ সাগরের দিকে ধাবিতা হয়, প্রেমিকার মন অবিকল সেই রূপ। মন আছে

এক দিকে, অন্য লোকে কথা কয়, কর্ণ হয় ত সেই দিকে থাকে। থাকিলেই বা কি হইবে? অসাড়! বোধ কর, আমার মন আছে আকাশে, কর্ণ আছে দেহে, চক্ষু আছে দেহে, কিন্তু ইহারা কি করে? চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না, কর্ণ কিছুই শুনিতে পায় না। বিরহ মনের।

অপ্সরাসুন্দরীর মনের কথা, বিরহ বিকার, আজ আমার মুখে ব্যক্ত হইবে। যে মেয়েকে ভূতে পায়, যে মেয়েকে ডাইনে খায়, ভূত কিম্বা ডাইনী, সে মেয়ের মনের কথা টানিয়া বলিতে পারে না। যদি পারে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। সকল ব্যক্তই রোগীর মুখে। আমি যদি কবি হইতাম, দেখাইতাম, রোগী বলে কি? অপ্সরা বলিতেছে, "আমি আর আমার না, যাহাকে মন সমর্পণ কোরেছিলেমন, সে আমারে দেখা দিলে না। উঃ! সেই রক্তবস্ত্র, সেই পর্দ্দা ঢাকা গবাক্ষ, সেই মখ্‌মল-মণ্ডিত সুচারু খট্টা, সেই স্ফটিকময় দীপাধার, সেই আমি, সেই সেই; কিন্তু কোথায় সে? মনের কথা জিজ্ঞাসা কর? মন আমার তারি কাছে।"

"কার কাছে ভাই?"

অপ্সরা মৌনবতী।

শ্যামাঙ্গিনী ঠিক ঠিক রহস্য বুঝিতে না পারিয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, বদল?

"হইতে পারিত, কিন্তু আমি ঠকিয়া গিয়াছি।"

"কিরূপে?"

"যাহাকে দিব বলিয়া।"

"তবে দেও নাই?"

"হাঁ।"

"বদল হইল না কেন?"

অপ্সরাসুন্দরী রোদন করিতে লাগিলেন। দুটী উজ্জ্বল পদ্মচক্ষু অশ্রু-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মুখে আর কথা সরিল না।

"কি ভাই অপ্সরা! চক্ষের জলে আমার হৃদয়কে ভিজাইয়া দিলে, কিন্তু তোমার মনের কথা ত আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না।"

"জানবে আর কি? যাহাকে মন সমর্পণ করেছিলাম, যে আমারে মন

সমর্পণ কোর্‌বে অঙ্গীকার করেছিল, ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করেও তারে আর আমি দেখ্‌তে পাই না।''

"সে কোথায় ?''

''সেই জানে, এক রাত্রে ঠাট্টা তামাসা হয়েছিল, সে আমারে বলেছিল, কপোতী, আমি তারে বলেছিলাম কপোত।''

''কি সঙ্কেত ? কপোত কাকে বলে ?''

''পায়রা।''

''সে পায়রা তোমার কোথায় গেল ?''

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট,—তাল আড়খেমটা।

আমার নয়ন তারা সুখের পায়রা উড়ে গিয়েছে,
উড়ে গিয়েছে, ও কেউ ধরে রেখেছে।
কার সনে কি বাদ ছিল, কে তাহারে ধরে নিল,
আমার হৃদয় মাঝে শূন্য খাঁচা পড়ে রয়েছে॥

শ্যামাঙ্গিনী একটু হাস্য করিল। কহিল, ''আমি যদি তারে ধোরে দিতে পারি ?''

''চিরদিনের মত,—চিরজন্মের মত আমি তোমার দাসী হয়ে থাক্‌বো।''

দাঁতে জিব কাটিয়া শ্যামাঙ্গিনী কহিল, ''এ কি ভাই তোমার সৃষ্টি-ছাড়া কথা ?''

''আমার অদৃষ্টই এখন সৃষ্টিছাড়া।''

''এই শেষ কথাটির সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরাসুন্দরীর পঙ্কজনয়নে দুই বিন্দু জল দেখা দিল।''

''বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন করিয়া দিয়া শ্যামাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, ''তুমি ভাই কাঁদ কেন ?''

বিন্দুর পরিবর্ত্তে অপ্সরার চক্ষে এবার দরদর ধারে বারিধারা। কাঁদিতে কাঁদিতে পুনর্ব্বার কহিলেন, ''পৃথিবীতে আমি কাঁদিব না ত কাঁদিবে কে ?

শ্যামাঙ্গিনী একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, "সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। যাহা জানি, তাহাতে অত দূর বিরাগ জন্মিবার কারণ ?"

"কারণ ? ভেবে দেখ দেখি, যাহাকে হৃদয় দান করেছিলাম, হৃদয়ের হৃদয় মনে কোরে নিত্য নিত্য হৃদয়-মন্দিরে যারে পূজা করিতাম, সে যদি পরিত্যাগ কোরে গেল, তবে আর সংসারে আমার প্রয়োজন ?"

"আশা যায় নাই। তাকে পাবার উপায় আছে। অত উতলা হলে শরীর রক্ষা হবে কিসে ?"

"কেন ? শরীর রক্ষা হবে যমুনায়। আশা আমার কালিন্দীর গর্ভে।"

"আবার সেই কথা ? আত্মহত্যা মহাপাপ।"

"আমি অধ্যাপকের ব্যবস্থা চাই না। জীবনে আমার যে যন্ত্রণা, যমুনা-জীবন ভিন্ন তাহার শান্তির আর স্থান নাই।"

শ্যামাঙ্গিনী সজল নয়নে অশ্রুমুখী সখীর নেত্রজল মুছাইয়া দিল। তাহা কি থামে ? গিরি-নির্ঝরের ন্যায় অবিশ্রান্ত প্রবাহ। যেন জ্বলিয়া গেল। সান্ত্বনা হইল না, শীতল হইল না, যন্ত্রণানল বরং আরও জ্বলিয়া উঠিল।

একজন কবির বাক্যে আমরা শুনিয়াছিলাম বিরহি হৃদয় কোথাও শীতল হইতে পায় না। জলে যাইলে আবো জ্বলে। প্রকৃতিদেবী বিজ্ঞানের কথা বলেন, বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিত প্রকৃতিদেবীকে অন্বেষণ করেন। বিজ্ঞানের শক্তি অনন্ত। এমন যে তেজোময় পদার্থ অগ্নি, তাহাও শীতল সলিলে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; কিন্তু বিরহী হৃদয়ে যে একটী বিরহানল জ্বলে, সে অনল সমুদ্র সলিলেও নির্ব্বাণ হইবার নয়। শ্মশানে চিতাশয্যায় অনল জ্বলে, আমি তাহা দেখিয়া আসি, বিরহী তাহা দেখিয়া আসে, প্রাণ জ্বলিয়া উঠে, কোন জলে তাহা শীতল হয় না। অন্তরীক্ষে আশা আসিয়া বলেন, ঘরে ফিরিয়া যাও। জানি আমি আশা সর্ব্বনাশী, বিরহী হয় ত জানে না আশা সর্ব্বনাশী, অপ্সরা-সুন্দরী হয় ত জানিতেন না আশা সর্ব্বনাশী, শ্যামাঙ্গিনীও হয় ত জানিত না আশা সর্ব্বনাশী, কিন্তু আশাদেবি ! আমি তোমারে প্রণাম করি; আমি তোমারে সর্ব্বনাশী বলিব না; পৃথিবীর অভিধানের কোন কটুবাক্যে আমি তোমারে তিরস্কার করিব না; জানি আমি সাফ কথা,—আশা চপলা।

পঞ্চদশ প্রবাহ।

তোমরা কে ?

চিনি চিনি করিতেছি চিনিতে না পারি,
কোথা হতে আসিয়াছ যাইবে কোথায় ?
কহিছ কাহার কথা বিজন কাননে,
হারায়েছে বুঝি কিছু অমূল্য রতন,
খুঁজিছ কি সেই ধনে উদাসীর প্রায় ?
পাবে না সে হারা নিধি জনশূন্য বনে।

আর্য্যরত্ন।

আশা! তোমার অনন্ত শক্তি! অনন্ত কুহক! তোমার মহিমা বুঝিতে পারে, এই মায়াময় মানব-সংসারে এমন লোক অতি বিরল। আশা! তুমি চপলা; কখন যে কি রঙ্গে থাক, কেহই তোমার লীলাখেলা বুঝিতে পারে না। সংসারের জননী কে? শাস্ত্রমতে প্রকৃতি-সতী। কিন্তু আশা! আমি তোমাকেই প্রকৃতি বলি। মা! এই অখণ্ড অনন্ত বিশ্বসংসারে কেবল তোমারি খেলা। তুমি নিজে খেলিতেছ, আর সমস্ত জীবকুলের খেলা দেখিতেছ। তাহারা খেলা করিতেছে তোমারই উপদেশে। যাহারা বনের বানর ভল্লুক নাচাইয়া গৃহস্থের দ্বারেদ্বারে পয়সা ভিক্ষা করে, তাহাদের কৌশল আছে, কিন্তু কুহক নাই। তুমি কুহকিনী। জননী যেমন সন্তানকে গালাগালি দিতে পারেন, সন্তানও তেমনি জননীকে গালাগালি দেয়। আশা! আমি তোমাকে জননী বলিয়াছি। তুমি সৃষ্টি স্থিতি-সংহার-কারিণী! এই শেষ কথাটিই যথার্থ সার্থক। কুহকিনি! তুমি সর্ব্বনাশী। তোমার নাম করিয়া লোকে যেমন এই মায়াধামে মহাদুঃখেও প্রাণ ধারণ করে, তোমার অভাবে মানবকুল সেই রূপেই ধ্বংস হয়।

একজন বৃদ্ধ পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিদারুণ ব্যাধিযন্ত্রণায়, ব্যাধি

শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে, তুমি আসিয়া কাণে কাণে কথা কহিলে, ভয় নাই, শরীর নিরাময় হইবে, সন্তান গিয়াছে, আবার সন্তান হইবে। শোকাতুর রোগাতুর বৃদ্ধ একটু সুস্থ হইল। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র-শোকাতুরা জননী পুত্রশোকে কাতরা হইয়া অনাহারে দিবা-রজনী রোদন করিতেছেন, জীবন বিড়ম্বনা জ্ঞান হইতেছে, তুমি আসিয়া কাণে কাণে মন্ত্র দিলে, শোক সম্বরণ কর, আবার পুত্র হইবে। দুঃখিনী জননীর চিত্ত ক্ষণকাল কতক সান্ত্বনা পাইল। একজন ধনবান লোক দৈবনিগ্রহে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দীনহীন দরিদ্র হইয়াছেন, দারুণ দুর্ভাবনায় শরীর দিন দিন জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তুমি আসিয়া প্রবোধ দিলে, এ দিন থাকিবে না, নবপ্রভাতের প্রভাকরের ন্যায় পুনরায় শুভদিনের সমুদয় হইবে। বিপদাপন্ন দরিদ্রপুরুষ তোমার আশ্বাসে কিছুদিন আবার সংসার রঙ্গভূমে প্রহসনের অভিনয় করিল। সমুদ্রে তরণী মগ্ন হইতেছে, প্রাণভয়ে মহা সঙ্কটে ভয়ার্ত্ত আরোহীবর্গ বিকম্পিত হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে, তুমি আসিয়া ভরসা দিলে, ভয় নাই। জীবন রক্ষার উপায় আছে। যাহারা তত ভয় পাইয়াছিল, তোমার প্রবোধ বাক্যে তাহারা অনেক শান্ত হইল। একজন বিরহী প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমা-বিরহে নিতান্ত অস্থির হইয়া দিবানিশি ম্রিয়মাণ, আহার-নিদ্রা ক্রীড়া-কৌতুক পরিবর্জ্জিত, অন্তর-সাগরে প্রাণপ্রিয়ধন, প্রিয়াচিন্তা অনুক্ষণ তরঙ্গিত। মুখে হাসি নাই, জনমানবের সঙ্গে ইচ্ছাবশে সাক্ষাৎ আলাপ করা নাই। সংসারের সুখ-শান্তি যেন তাহার জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে, এমন সময় তুমি আসিয়া আশ্বাস দিলে, মিলন হইবে! বিরহী প্রেমিক সেই আশ্বাসে যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল। কুহকিনি! সংসারে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তোমাকে প্রকৃতি বলিয়াছি, কিন্তু তাহা ত তুমি নও। এই দেখ, আমার কত ভুল, আপনার কথাই আপনি খণ্ডন করি, আমি তোমাকে সংসারের জননী বলিয়াছি, কিন্তু তাহা ত তুমি নও। সংসারপ্রসূতি প্রকৃতি সতী তালে তালে নৃত্য করেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বিপর্য্যয় নাই, তোমার বিপর্য্যয় আছে। তুমি সর্ব্বনাশী। আবার গালাগালি দিই। তুমি মায়াদেবীর দূতী, সৃষ্টি-সংহার-কারিণী সর্ব্বনাশী রাক্ষসী। লোকে

বিপদে পড়িয়া বিপদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, তোমার প্রলোভন বাক্যে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু তুমি রাক্ষসী, যাহাকে বাঁচাও, তাহাকেই মার। বাঘিনী যেমন শিকারকে একেবারে প্রাণে না মারিয়া খানিকক্ষণ সজীব রাখিয়া খেলা করে, তুমিও তাই কর। তোমাকে বিশ্বাস হয় না। মানুষ অহরহ-তোমার কুহকে পড়ে, এক বিপদের মুখ হইতে অপর এক নূতন বিপদের মুখে অগ্রসর হয়, তথাপি সে তোমাকে ভোলে না, তুমিও তাহাকে ছাড় না। একবার একবার সরিয়া যাও, আবার নয়ন-সমক্ষে আসিয়া নৃত্য কর। আশা! তুমি চপলা, এক মুহূর্ত্ত তোমাকে স্থির দেখিতে পাওয়া যায় না, কোথায় কখন থাক, কোথায় কখন যাও, লোকে জানে না। তোমার খেলা কেবল তুমিই জান, সেই জন্যই বলি—রাগ করিও না, আমিও তোমার দাস, বড় দুঃখে সেই জন্যই বলি, তুমি রাক্ষসী, তুমি সর্ব্বনাশী, তুমি চপলা, সংসার অভিধানে লেখা আছে, মহাকবির হৃদয়-দর্পণে ছায়া আছে, বিশ্ব রঙ্গভূমে সুদৃশ্য চিত্র-পট অঙ্কিত আছে, আশা-চপলা।

এলাহাবাদের উত্তর প্রান্তে অনেকগুলি মুনিঋষির আশ্রম,—আজ কাল মুনিঋষি বড় বেশী নেই,—অনেকগুলি সাধুপুরুষের আশ্রম। আশ্রমের অদূরে স্থানে স্থানে এক একটী নিকুঞ্জ। বৃন্দাবনের নিকুঞ্জের মত নয়, এক প্রকার নিবিড় জঙ্গল, দিনের বেলা অন্ধকার, দিনের বেলা সড়াৎ সড়াৎ শব্দে বৃক্ষশাখা হইতে কালভুজঙ্গ কলাপ ধরাতলে পতিত হয়। নিরীহ হরিণ-হরিণীরা সভয়ে চকিত হইয়া দূরে দূরে ছুটিয়া পালায়। কিন্তু সে সকল বন আর এক প্রকারে নিরাপদ। ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি শ্বাপদ জন্তুর দৌরাত্ম্য কম। এক দিন দিবা তৃতীয় প্রহরে দুটী যুবা সেই সকল বনের এক বনে একটী লতাকুঞ্জ সমীপে বসিয়া রহিয়াছেন। বনে তাহারা কেন, সে কথার উত্তর আমরা জানি না। কথা কহিতেছে।

একজন কহিল, "তুমি অত ভাব কেন?"

নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বিতীয় যুবা উত্তর করিল, "ভাবিলে কি তাহাকে পাই-তাম না?"

"কাহার কথা বলিতেছ?"

"যাহার মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকা।"

চকিত বিস্মিতভাবে প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "যে মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছ, তাহা কি দেখা যায়? যদি যায়, তবে দেখাও দেখি?"

"দেখান যায় না।"

"ছবি দেখান যায় না, এ কি কথা?"

"উপরে নাই, অস্থি চর্ম্মে ঢাকা আছে।"

"এ কি তবে প্রণয়ের কথা?"

যিনি অতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিলেন, এই শেষ প্রশ্নের উত্তরটী তিনি নিজে দিলেন না। উত্তর দিল তাহার চক্ষের জল।

তোমরা কে? আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কে?

উত্তর পাওয়া গেল না। প্রায় এক দণ্ড উভয়েই নিস্তব্ধ, বাতাস নিস্তব্ধ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গের অবসরে প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা নূতন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কাহার জন্য কাঁদ?"

বিকার-প্রাপ্ত রোগী যেমন প্রলাপ উচ্চারণ করে, দ্বিতীয় যুবা ঠিক সেই প্রকারে মূল প্রশ্ন ছাড়িয়া উত্তর করিলেন, "মন বোঝে না।"

প্রশ্নকারী হাস্য করিলেন। এ হাস্যের তাৎপর্য্য কি? আমরা অনেক প্রকার হাস্য দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সময়, এমন কথায় হাসি পায়, এমন হাসি কখনও দেখি নাই।

"মন বোঝে না" এই একটী ছোট কথা শুনিয়া,— প্রথম ভাবুকের মর্ম্মভেদী একটী ছোট কথা শুনিয়া শ্রোতার মুখে হাস্যের উদয় হয়। পাঠক মহাশয়! এমন অভিনয় কি কখনও কোথাও দর্শন করিয়াছেন? তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যিনি প্রথমে কথা কহিতেছিলেন, ঐ কথা শুনিয়া যিনি হাস্য করিয়াছিলেন, তিনি কাশীধামের হরানন্দ সামাশ্রমীর শিষ্য, নাম বিজয়কিশোর গোস্বামী, উপাধি বিদ্যানিধি। যাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছিল, তাঁহার নাম ইন্দুভূষণ, উপাধি কি, প্রকাশ ছিল না, কিন্তু জনশ্রুতি, তিনি একজন গুজরাটী রাজকুমার।

মূল কথা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। "মন বোঝে না।" বিদ্যানিধি আবার হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন তোমার কে হয়?"

কে উত্তর দিবে? যাঁহার প্রতি প্রশ্ন, তিনি এক প্রকার অচেতন। পুনঃপুন প্রশ্ন। দীর্ঘশ্বাস ও নেত্রনীরের সহিত একবার উত্তর হইল, "মন আমার কাছে নাই।"

"ঐ কথাই কথা। মন চলিতে জানে না, নড়িতে পারে না, বুঝিবারও শক্তি নাই, মন জড় পদার্থ। আত্মা তাহার কর্ত্তা, দুঃখাদির সাধক যে একটী যন্ত্র, তাহারই নাম মন, সে মন কখনও স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নয়।"

"যদি নয়, তবে আমারে দগ্ধ করে কেন?"

"সংকল্প বিকল্প।"

"বড় দুঃখে হাসাইলে। যে বস্তু জড, তাহার কি সংকল্প বিকল্প থাকে?"

"কপিলসূত্রে সাঙ্খ্যদর্শনের মত।"

"আমি সাঙ্খ্যদর্শনের ধার ধারি না। যে দর্শন আমার বুকে জাগে, কত দিনে যে তার দর্শন পাব, সেই ভাবনাই আমার প্রধান, সেই দর্শনই আমার জীবনদর্শন।"

"তবে সংকল্প বিকল্প নাই কেন?"

"যদি থাকে, তাহা আত্মার, মনের নয়।"

"তুমি হয় ত সাঙ্খ্যের মত ভাল করিয়া জান না।"

"আমি বৈদান্তিকের শিষ্য, আমি জানি না, তুমি জান?"

"তোমা অপেক্ষা বোধ হয় কিছু বেশী জানি, আমার মন একা কাজ করে না, পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে মিশে আমারে হাসায়, আমারে কাঁদায়, আমারে নাচায়।"

"সেই জন্য বুঝি তুমি দর্শনে দোষ দাও।"

"না, দর্শনে ত দোষ দিই না, দর্শন আমাকে গ্রাস করে।"

যাঁহারা অল্প অল্প শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, কথায় কথায় তাঁহাদিগের রাগ হয়। বিদ্যানিধি মহা ক্রোধান্বিত হইয়া আরক্তনয়নে কহিলেন, "দর্শন কখনও গ্রাস করিতে পারে? তুমি যোগের কথা কিছু জান?"

"কোথায় যোগ, কোথায় দর্শন!"

"তবে তুমি বল কি?"

"দর্শন আমাকে গ্রাস করে।"

"তুমি গণ্ডমূর্খ নরাধম। এই মাত্র বলিতেছিলে, মন জড়পদার্থ, আবার এই মাত্র বলিলে, দর্শন তোমাকে গ্রাস করে।"

"হাঁ, দর্শন আমাকে গ্রাস করে। দর্শন ছয়, ইন্দ্রিয় পাঁচ। দর্শনকর্ত্তারা একমাত্র অদ্বিতীয় জগদীশকে নানা ভাবে, নানা ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়া সিদ্ধান্তের দিকে,—মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন,--বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। পান নাই।"

"তুমি পাও?"

"পাইয়াছিলাম, হারাইয়াছি।"

"জগদীশ তুমি মান?"

"আগে তুমি বল, দর্শন গ্রাস করে কি না, তাহার পর সে কথার উত্তর।"

ক্রোধান্ধ পণ্ডিত সগর্ব্বে কহিলেন, "তুমি বলিয়াছ, মন জড় পদার্থ, আমিও বলিতেছি, দর্শন জড় পদার্থ, জড় কখনও কাহাকেও গ্রাস করিতে পারে না।"

"তুমি মূর্খ! দর্শন গ্রাস করে, রসনা আস্বাদন করে, মুখ আহার করে, আহারের বস্তু উদরে যায়, ইহাই ত সকলে জানে, কিন্তু তাহা ত নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ভক্ষণ করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই ক্ষুধা আছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই পিপাসা আছে।"

"প্রমাণ?"

"চক্ষু। চক্ষুর ক্ষুধা পিপাসা কি? শত্রু-মিত্র দর্শন, ভালমন্দ দর্শন, চক্ষু তাহা খায়, চক্ষু তাহা পান করে। কর্ণের ক্ষুধা-পিপাসা কি? সুস্বরকুস্বর শ্রবণ। সুরসিকের সঙ্গীত, কোকিলের ঝঙ্কার। আমার কর্ণ ইহাই গ্রাস করে। চাটুকারের চাটুবাদ, নীচ লোকের কটু বাক্য, বেশ্যার তিরস্কার, আমার কর্ণে বিষ-বর্ষণ করে। জড় পদার্থ হইয়াও কর্ণের এতদূর বিবেচনা শক্তি। নাসিকাও ঘ্রাণ করে। কি?—সুগন্ধ আর দুর্গন্ধ। রুচি-অরুচি কিসে কি আছে, বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে। নাসিকা কিন্তু জড়। রসনা আস্বাদন করে কি?—সুখাদ্য কুখাদ্য। রসনা কিন্তু জড়। তবে আর কিছু শুনিতে চাও? ক্ষমা কর, আর আমি অধিক দূর যাইব না। কিন্তু দর্শন আমাকে গ্রাস করে।"

বিদ্যানিধি জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রাপ্ত হইয়া উচ্চরবে কহিলেন, "নিপাত।"

দুঃখে হাস্য করিয়া ইন্দুভূষণ কহিলেন, "ক্ষত্রিয়কুমার নিপাতকে ভয় করে না। যে দর্শন আমাকে গ্রাস করিয়াছে, সে দর্শন হয় ত তুমি অধ্যয়ন কর নাই।"

"নাম কর।"

"কামিনী-কটাক্ষ, আর কামিনী-বিলাস"

"তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। সে বিষে তোমারে জর্জ্জরিত কেন করে, কে তাহার ফল ভোগ করে, সেইটী আমার জানিতে বাকী ছিল। আমি কিন্তু ঠকিলাম না। মনে সব যাতনার আঘাত হয়, ইহা তুমি স্বীকার কর?"

"আঘাত স্বীকার করি না, প্রতিঘাত স্বীকার করি। প্রাচীরে যদি আমার গায়ের ধাক্কা লাগে, প্রাচীরকে আঘাত লাগিবে না, প্রতিঘাত মাত্র লাগিবে। আমার অঙ্গে আঘাত লাগিবে। মনের সঙ্গে, আমার সঙ্গে আর আত্মার সঙ্গে, এত দূর প্রভেদ।"

"দর্শন শাস্ত্রে তবে তোমারই জয়।"

"জয় ছিল বটে, কিন্তু যাহাকে দর্শন করিয়া একদিন আমি পাগল হইয়াছিলাম,—একদিন কেন, চিরদিন পাগল হইয়া রহিয়াছি, সেই প্রাণ-প্রতিমার অদর্শনে বিশ্ব আমার অন্ধকার। সেই জন্যই বলি, দর্শন আমাকে গ্রাস করে।"

বিদ্যানিধি একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ইন্দু! তোমার সঙ্গে আমার বালক কালের সদ্ভাব, তোমার স্মরণ নাই, আমার স্মরণ আছে। এক দিন তুমি বলিয়াছিলে, আর এক দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কামিনী-প্রেমে কখনও মুগ্ধ হইবে না। তবে এ কি?"

"ভাল বে বাসিয়াছিলাম।"

"উত্তম।"

"যদি উত্তম, তবে এখন নিবারণ কর কেন?"

"নিবারণ করি নাই।"

"তবে আমার সে ধন কোথায়?"

"কোথায় যে ভালবাসা থাকে, তাহা পৃথিবীর লোকে জানে-না; আমার অহঙ্কারের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে; আমার যেন মনে হয়, ভাল ভালবাসা হয় নাই।"

"কেন? যাহা দিতে হয়, তাহা ত দিয়াছি, হনূমান বুক চিরিয়া রামনাম দেখাইয়াছিল, মানুষ বুক চিরিয়া কোন নাম দেখাইতে পারে না, হৃদয় তাহাকে দিয়াছি। হৃদয়ে সেই নাম, সেই প্রতিমা আঁকা আছে।"

বিদ্যানিধি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "এতক্ষণে বুঝিলাম, তুমি সংসারের ক্ষুদ্র প্রাণী, ক্ষুদ্র জীব, তবে এতক্ষণ যোগের কথা আওড়াইতেছিলে কেন?"

"কেন জান না? সেই দর্শনই আমার শেষ দর্শন। যত দিন তাহাকে না পাইব, তত দিন যোগের কথার ধূয়া দিয়া জগৎকে শুনাইব, দর্শন আমাকে গ্রাস করে।"

"আচ্ছা, যদি তত দূর হইয়াছিল, তবে বিচ্ছেদ হইবার কারণ?"

"বিবাহ হয় নাই।"

সময়ে ত বিবাহ হইতে পারিত।"

"বাধা পড়িয়া গেল।"

"সে কিরূপ?"

"মতমূর্ত্তি হৃদয়ে যে প্রতিবিম্ব দেখি, সেই জীবন-প্রতিমাকে দর্শন করিবার জন্য একদিন নিশাভাগে তাহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। আমার প্রাণপ্রতিমা তখন একটা বাগানে থাকিতেন। বাগানের দ্বার,—সম্মুখের ফটক, অৰ্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অনাবৃত থাকিত। প্রবেশ করিবার সময় দেখি, দ্বার অবরুদ্ধ, সঙ্কেতে আহ্বান করিলাম, বিলম্বে দ্বার উন্মুক্ত হইল, ঘরে দেখি, একজন কাপ্রীশ তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত।"

"তবে তুমি যাহাকে ভালবাস, সে তোমাকে ভালবাসে না?"

"দোহাই পরমেশ্বর! আজিও আমি সে অবিশ্বাসিনীকে অবিশ্বাসিনী মনে করি না।"

তোমরা কে? বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনাদের কথায় আপনারাই মত্ত। আমার কথার উত্তর করিতেছ না, তোমরা কে?

এই ইন্দুভূষণ মুক্তবেণীসঙ্গমে অপ্সরাসুন্দরীর সহিত একটী দিনমাত্র

দেখা করিয়াছিল। অনেক দিনের কথা, তাহার পর উদ্যানবাটিকায় আরও কত দিন কে জানে, উভয়ে রহস্যকৌতুক হইয়াছিল। শেষে এই আকস্মিক বিচ্ছেদ।

"তুমি জান সত্য, তাহার নাম ইন্দুভূষণ?"

"শুনিয়াছিলাম।"

"কাফ্রী সে ঘরে ছিল কেন?"

"ছুতর মিস্ত্রী হইতে পারে, পল্লব ঘোষ হইতে পারে, বাজার সরকার হইতে পারে।"

"তাহাকে দেখিয়া, ইন্দুভূষণের ঈর্ষা জন্মিল কেন?"

"এ কথার কথা নাই। প্রণয় বড় কোমল বস্তু, একটুতে বাড়ে, একটুতে কমে।"

আর আমরা আড়ম্বর করিব না। যাহাদের কথা হইতেছিল, তাহাদেরই কথা হোক। বিদ্যানিধি কহিলেন, "তাহার পর?"

"তাহার পর বৈরাগ্য।"

"যদি বৈরাগ্য, তবে আর সে কথা মনে পড়ে কেন?"

"জীবনে যে ভুলিতে পারিব না।"

"চক্ষু কি এত প্রবঞ্চক?"

"আগে জানিতাম না, এখন জানিয়াছি, তাহাই বুঝি সত্য।"

"যাহারে তুমি দেখিয়াছিলে, যাহারে তুমি ভাল বাসিয়াছিলে, সে তোমারে অগ্রাহ্য করিল?"

"নারায়ণ! নারায়ণ! তাহার মনে কি আছে, আমি বলিতে পারি না, কিন্তু আমি তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে ভালবাসি।"

"যদি বাস, তবে একটা কাফ্রী দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে কেন?"

"ঘৃণা হইয়াছিল।"

"সে ঘৃণা দূর করিলে কিসে?"

"মনের উপদেশে।"

"মনের কি উপদেশ আছে? একটু আগে তুমি বলিয়াছিলে, মন জড় পদার্থ।"

"মিলনে মিলন হয়। পাঁচটী অচেতন পদার্থে মানবদেহের উৎপত্তি, কিন্তু সেই মানব সকল কার্য্যই করে।"

"তুমি কি অধ্যাপক? তুমি কি দার্শনিক? তুমি কি সংসারতত্ত্ববাদী পণ্ডিত?"

"নয় কেন? শ্মশানে যখন শবদেহ থাকে, তখন কি পঞ্চভূত থাকে না? দেহের চৈতন্য তখন কোথায় যায়?"

বিদ্যানিধি কহিলেন, "পাঁচ থাকে না, চার থাকে, এক পালায়।"

"মিথ্যা কথা। আত্মার সংযোগ ভিন্ন পঞ্চ-ভৌতিক দেহের চৈতন্য থাকে না। আমি সে চৈতন্য চাই না, আমার চৈতন্য সেইখানে।"

"নাম মনে পড়ে?"

"চিরজীবনে ভুলিব না,—নাম অপ্সরাসুন্দরী। পদ্মনয়না, সুধাংশুবদনা এলোকেশী, অপ্সরাসুন্দরী।"

"আর সেই কাফ্রী?"

"তাহার মস্তকে আমি পদার্পণ করি।"

"তবে তুমি অপ্সরাসুন্দরীকে ভালবাস?"

"ভালবাসি কি না, জানি না, কিন্তু তাহাকে পলক মাত্র না দেখিলে জগৎসংসার শূন্য শূন্য মনে হয়। বুকে জপ করি গুরুদেব, হৃদয়ে ধ্যান করি ইষ্টদেবী, অন্তরে পূজা করি কালিকা,—কিন্তু মনে মনে জাগে, দিবানিশি জাগে, নিদ্রা স্বপ্নে জাগে, অপ্সরাসুন্দরী। আমার প্রাণের,—প্রাণের,—প্রাণের ঈশ্বরী শ্রীমতী পদ্মমুখী অপ্সরাসুন্দরী।"

"তবে আবার দর্শন কর না কেন?"

"মনে বড় ব্যথা লাগে।"

"আশ্চর্য্য! যাহাকে তুমি ভালবাসিয়াছিলে, স্বীকার কর আর না কর,—যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছিলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কি তুমি সুখী হইতে পারিবে?"

"পারিব।"—

পারিব বাঁচিতে সখে! ত্যজিয়ে তাহারে।
মনে হতো সে ত ভালবাসিত আমারে॥

এত যে দুর্দ্দিন হবে নাহি ছিল মনে।
একান্ত বিচ্ছেদ হবে প্রাণধন সনে!
একদিন যারে আমি ভালবাসিয়াছি।
একদিন যার প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছি॥
তারে কভু ভুলিব না এই মম পণ।
সে যদি ভুলিতে পারে ধন্য তার মন॥
প্রাণ তোরে চাহিছে না এ কথা যে বলে।
তথাপি তাহার প্রেমে প্রেমানল জ্বলে॥
কোন দোষে দোষী নই প্রেয়সি আমার!
একান্ত জানিয়েছিনু আমিরে তোমার॥
একদিনে যে প্রণয় উপার্জিয়াছিল।
একদিনে সে প্রণয় কিসে উচ্ছেদিল?
প্রেম আশা ভালবাসা ভুলিবার নয়।
ভুলিবার নয় সখি! জ্বলিছে হৃদয়॥
আমারে জ্বালায়ে যদি তুমি হও সুখী।
আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক বিধুমুখী॥
হবে না হবার নয় তেমন প্রণয়।
যথা তথা সে প্রণয় হইবার নয়॥
ভক্তিভাবে বিচ্ছেদেরে করি আলিঙ্গন।
বিচ্ছেদের সঙ্গে রব যাবত জীবন॥
ডাকিবে কোকিল পাখী নিকুঞ্জ কাননে।
উড়ে এসে বসিবে সে হৃদি-পদ্মাসনে॥
জুড়াবে পঞ্চম গানে, মন, প্রাণ, কাণ,
তথাপি তোমারে আমি ভুলিব না প্রাণ॥

বড় ভালবেসেছিনু সব আছে মনে।
কত খেলা খেলিয়াছি প্রিয়ে তব সনে॥
ভুলে গেলি সর্ব্বনাশি! নেমক হারাম!
আর ভালবাসিব না হা রাম হা রাম!!
সেই এক দিন সখি! সেই এক দিন।
যে দিনে আমার মুখ হেরিয়ে মলিন,
কেঁদেছিলি শিবিকায় আহা মরি বলি।
সেদিন কি মনে আছে? স্মরি আমি জ্বলি॥
এক দিন নদীতীরে বসিয়ে দুজনে।
হেরিয়াছি শবদেহ সজল নয়নে॥
পুড়িতে পুড়িতে এক নরশিশু-দেহ।
মাটীতে পড়িয়া গেল ধরিল না কেহ॥
কাঁদিয়া উঠিলে তুমি প্রাণের ঈশ্বরি!
তুলে দিনু শিশু-দেহ ধরাধরি করি॥
জলতীরে বসিলাম যুগলে যুগল।
চল্ চল্ করে গেল ভাগীরথী-জল॥
কোথা যাও ভাগীরথি! ডাকিলে সুন্দরি!
ছুটে গেল গঙ্গা-নদী গ্রাহ্য নাহি করি॥
অভিসার করিতেছে কি কবে তোমায়।
নিশার দুর্জ্জয় ভাটা তখন গঙ্গায়॥
সাগরে যাইতেছিল সাগর-কামিনী।
সতী যারা নাহি মানে দিবস যামিনী॥
সতী কি সে ভাগীরথী? ধিক্ সতী নামে!
সুর-রমা মন্দাকিনী বৈজয়ন্ত ধামে॥

বসু-আশে শান্তনুরে করিয়ে বরণ।
একে একে সপ্ত-বসু করিলা হরণ ॥
সেই সতী গঙ্গা সতী আমাদের কাছে।
ছুটে যান, ঢেউ ছোটে, স্রোত পাছে পাছে ॥
কেবা শোনে কার কথা ভাগীরথী সতী।
শবদেহ হেরিবে না দেবী স্রোতস্বতী ॥
কাল পেয়ে ধেয়ে এলো বেহায়া পবন।
জলে জলে পবনের ত্বরিত গমন ॥
আগুনের সখা বায়ু চিতানলে কেন
না হন সহায় আজি ? চিরশত্রু যেন !
নীরব শ্মশান-ভূমি বহিছে বাতাস।
তারামালা বুকে করি হাসিছে আকাশ ॥
বসে আছি আমি সেই তটিনীর তটে।
প্রাণের প্রতিমা মম রয়েছে নিকটে ॥
নানা দুখে দুখী তবু সেই সুখে সুখী।
মর্ত্তে মন্দাকিনী হেরি নব-শশি-মুখী ॥
নামিয়াছে মন্দাকিনী মর্ত্ত-নিকেতনে।
অগণিত তারামালা শশিকলা সনে ॥
জলে পড়িতেছে ছায়া শোভা চমৎকার।
দেখি দেখি ভুলে যাই শোভার আধার ॥
জলতলে নামিয়াছে সুন্দর আকাশ।
নীলবর্ণে তারা-চক্ষু উজ্জ্বল বিকাশ ॥
বাতাসে দিতেছে ঢেউ হেলিছে দুলিছে।
খণ্ড খণ্ড নভস্থল বাতাসে কাঁপিছে ॥

আ মরি কি শোভা হেরি স্রোতস্বতী-নীরে।
অন্যমনে বসে আছি ভাগীরথী-তীরে॥
কাছে আছে প্রিয়তমা স্বপ্নে অনুমানি।
কোথা প্রিয়তমা মম কিছুই না জানি॥
জলে অনলের ছায়া উপরে অনল।
আমি আছি তাই জানি ছুটে যায় জল॥
হায় রে প্রেমিক-চিত ভ্রান্তির নিলয়।
একা যেন সতী সনে তাই মনে হয়॥
হায় মাত স্রোতস্বতি! প্রণতি চরণে।
অপরাধ করে থাকি মুখে কিম্বা মনে,
ক্ষমা কর দয়াময়ি! অন্তর চঞ্চল।
প্রেয়সী বিহনে চিত নিতান্ত পাগল॥
হয় লও, নয় তারে দেখাইয়ে দাও।
কৃপা করি কৃপা-বতি! কৃপাদৃষ্টে চাও॥
হায় কি মনের ভ্রান্তি কারে বা কি বলি।
কোথা ভাগীরথী? এ যে ঘোর বনস্থলী॥
সখে বিদ্যানিধি! তুমি কি বলিতেছিলে?
কেন সেই নিধি-চিন্তা ভুলাইয়া দিলে?
যে নিধি হৃদয়-নিধি ভাবি নিশি দিন।
যাহারে হারায়ে তনু দিন দিন ক্ষীণ॥
তারে কি ভুলিতে পারি থাকিতে জীবন?
সেই প্রাণ-প্রিয়তমা জীবন-জীবন॥
সে আমারে ভুলিয়াছে বিশ্বাস না হয়।
ত্যজিয়াছে মায়া দয়া? কখনই নয়॥

আমি কিন্তু আশাহারা ! আশার আশ্বাস
মুহূর্ত্তের তরে বুকে করে না বাতাস ॥
অস্থিরা আশার খেলা চপলা সে আশা।
আশার মায়াতে আজো আছে ভালবাসা ॥
আছে বটে তবু যেন এই আছে নাই।
তারি তরে তারে আর দেখিতে না পাই ॥
আশা-চপলার খেলা খেলে না অন্তরে।
তবু সে হৃদয়েশ্বরী হৃদে খেলা করে ॥
হেরি সেই মুখশশী হৃদয়-দর্পণে।
হেরি আমি সেই হাঁসি জাগ্রত-স্বপনে ॥
হেরি আমি সেই নেত্র প্রেম-চিত্ত-পটে।
হেরি যেন প্রাণেশ্বরী বসিয়া নিকটে ॥
তবু তেয়াগিতে পারি। হায় রে হৃদয়—
এ কথায় তবু কেন বিদীর্ণ না হয় ?
কারে আমি তেয়াগিব ? যার অদর্শনে
জ্বলিতেছে দাবানল সদা মন-বনে ॥
হু হু করি জ্বলিতেছে না হয় নির্ব্বাণ।
আহুতি হইবে তাতে প্রিয়াশূন্য প্রাণ ॥
তবু তেয়াগিব তারে, আশা যদি নাই !
চপলা আশার কায়া জড়াতে না চাই ॥
পারিব বাঁচিতে সখে! ত্যজিয়ে তাহারে।
ভুলিব না কিন্তু কভু মানস-ভাণ্ডারে ॥
রাখিব যতনে সেই যতনের ধন।
ত্যজিব ত্যজিব তবু রাখিব জীবন ॥

পারিব বাঁচিতে সখে ! অদর্শনে তার ।
সে প্রতিমা বিরাজিবে অন্তরে আমার।।
দিবাভাগে সূর্য্য হয়ে উঠিবে আকাশে ।
নিশাকালে শশিরূপে মৃদু মৃদু হাসে
উঠিবে হৃদয়াকাশে নব শশধর ।
কৃষ্ণপক্ষে বিরাজিবে তারকা নিকর ।।
কোন দিনে কোন ক্ষণে নাহি অদর্শন ।
তাই বলি তারে ত্যজি রহিবে জীবন ।।
বাঁচিতে পারিব সখে ! বিরহে তাহার ।
রাজিবে মানসপটে প্রেয়সী আমার ।।

"পারিবে না।"

"পারিব।"

গম্ভীর বদনে হাস্য করিয়া বিদ্রূপ-ভঙ্গিতে বিদ্যানিধি কহিলেন, "মনে যখন এতখানি ভালবাসা, দিবারাত্রির মধ্যে লহমার জন্যেও যাহাকে ভুলিতে পার না, আকাশের সূর্য্যে, আকাশের চন্দ্রে, আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জে, যে প্রতিমা তুমি অহরহ দর্শন কর, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কি বাঁচিতে পারিবে ?"

"পারিব।"

"আমার বিশ্বাস হয় না।"

"তুমি দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত।"

"তাহাতে কি হইল ?"

"দর্শনে মীমাংসা নাই।"

"তোমার কি মীমাংসা আছে ?"

"অবশ্য।"

"বুঝাও দেখি ?"

"তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিব।"

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি দেবী তিমিরবসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া ধরাধামকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন। প্রয়াগের নিকুঞ্জকানন ঘোর গভীর নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সন্ধ্যাকালে এত অন্ধকার কেন? বনভূমি দিনমানেও অন্ধকার দেখায়, সেই জন্য সূর্য্যের অস্তগমনে গাঢ় অন্ধকার। না ত, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, বাতাস বন্ধ, বৃষ্টি আগতপ্রায়, মেঘ হয় ত ঝটিকাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া থাকিবে, পথিকেরা আর বনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। শঙ্কায় শঙ্কায়, সন্দেহে সন্দেহে, অনুমানে অনুমানে, বন-পথ নিরূপণ করিয়া শশব্যস্তে তাঁহারা কানন হইতে বহির্গত হইলেন। কে কাহার সঙ্গী? ইন্দুভূষণের সঙ্গী বিদ্যানিধি; বিদ্যানিধির সঙ্গী ইন্দুভূষণ। না, ইন্দুভূষণের সঙ্গী—(শ্রীবিষ্ণু!) ইন্দুভূষণের সঙ্গিনী—মানস-সঙ্গিনী কল্পনা-সুন্দরী;—বিদ্যানিধির সঙ্গিনী আশা-চপলা।

আমরা এতগুলি কথা শুনিলাম, একটীরও সমন্বয় পাইলাম না। কাহার সঙ্গিনী কল্পনা, কাহার সঙ্গিনী আশা, কিছুই বুঝিলাম না। সব যেন পাগলের কথা। একটী সত্য কথা,—স্বভাবের উপদেশে একটী সত্য কথা,—আশা-চপলা।

আশা! তুমি বিদ্যানিধির সঙ্গিনী? তুমি জগৎকে ভুলাইতে পার, কিন্তু আমারে ভুলাইতে পার না। আমি তোমারে চপলা বলিয়া তামাসা করিতেছি না। ভক্তি করিয়া তোমারে চপলা বলিতেছি।

ভক্তি ভরে মা তোমারে চপলা বলিয়া
ডাকি আমি আশাদেবি! মানসে ভাবিয়া ॥
ভণ্ডযোগী বিদ্যানিধি, তাহারে সদয়
হয়েছ মা, সুরেশ্বরি! কাঁপিছে হৃদয় ॥
আমার হৃদয়নিধি করিতে হরণ
কার সাধ্য? কেড়ে নিবে তব শ্রীচরণ?

ষোড়শ প্রবাহ।

চামুণ্ডাদেবীর মন্দির।

রক্তবীজে বধি দেবী তাণ্ডবি উল্লাসে,
আসবে হইয়ে মত্তা বিজয়ার সাথে,
উরিলা কৈলাস পুরে। যথা গঙ্গাধর,
শক্তি-শূন্য সিদ্ধিপানে বিহ্বল অন্তর,
সেই পুরে প্রবেশিলা আরক্ত-নয়না,
রক্তমাখা সর্ব্ব গায় মুণ্ডমালা গলে,
রক্তমাখা তীক্ষ্ণধার খড়্গ বাম করে,
ঘোর রূপা বিশালাক্ষী নৃমুণ্ডমালিনী।

আর্য্যরত্ন।

যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। ঝটিকাবেগে বৃক্ষশাখারা হেলিয়া দুলিয়া আশ্রয়লোভী পাখীকুলকে তাড়াইয়া দিতেছে। নিরাশ্রয় বিহঙ্গ-বিহঙ্গিনী তরুতলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছে। পশুপাখীর কথা আমরা ঠিক ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু চিরদিনের প্রবাদ আছে, পেঁচা আর বাদুড় ছাড়া আর কোন পাখী রাত্রে দেখিতে পায় না, উড়িতে পারে না। পবনের দৌরাত্ম্যে কাণা কাণা পাখী সব পড়িল আর মরিল। এ আন্দর আর এক বন। বনমাঝে একটী দেবী-মন্দির, মন্দিরে দেবীমূর্ত্তি বিরাজমান। পাষাণময়ী দেবী, কার্ত্তিকী-অমাবস্যা-রজনীতে বঙ্গ-বাসী-ভক্তেরা যে করালবদনা-ঘোরা-মুক্তকেশী-দিগম্বরী-মূর্ত্তির পূজা করেন, এ মূর্ত্তি অবিকল সেইরূপ। নীলবর্ণ কলেবর, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা, লোল-রসনা, চারি হস্ত, এক হস্তে খড়্গ, এক হস্তে ছিন্ন দৈত্যমুণ্ড, এক হস্তে বর, এক হস্তে অভয়। খড়্গ-খর্পর-ধারিণী বরাভয়া দেবীর কটিতটে দৈত্যকর-

মালা, কর্ণে দৈত্য-শিশু-কুণ্ডল, গলদেশে দৈত্য-মুণ্ডমালা। মুক্তকেশী। উভয় পার্শ্বে, বামে দক্ষিণে দুই রাক্ষসী—দুই সহচরী। রাক্ষসী সৃক্কণী পরিলেহিনী, রাক্ষসীদের হস্ত-লগ্ন ওষ্ঠে রক্তাক্ত দৈত্য-হস্ত। তিনটিই পাষাণী। দেবীর পদতলে মহাকাল। এই যে অনন্ত সংসার, ইহা কেবল মহাকালের প্রতিবিম্ব। যিনি প্রকৃতি, তিনি মহাকালের বুকে নৃত্য করেন। মহাকাল চিরদিন শয়ন করিয়া আছেন, প্রকৃতি দেবী তাঁহার বুকের উপর নাচিতেছেন। লোকে বলে, দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, মানুষ মরিতেছে, শিশু জন্মিতেছে, কিন্তু কিছুই নয়। মহাকাল নিষ্কলঙ্ক শ্বেতবর্ণ, প্রকৃতিসতী কৃষ্ণবর্ণা। জগতের ছবি এইরূপ। শিবের বুকে চরণার্পণ করিয়া, যিনি দন্তে রসনা কর্ত্তন করিয়া লজ্জা পান, তিনি উলঙ্গিনী। সংসারের খেলা সেই রূপ। দেবীর নাম চণ্ডী। এ বনে, আমাদের এখানে চামুণ্ডা।

গেরুয়াবস্ত্রপরিহিত একজন যোগী সেই চামুণ্ডা-দেবীর সম্মুখে যোগাসনে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে ধ্যান করিতেছেন। কি যে তাঁহার ধ্যান, তিনি ভিন্ন আর কেহ তাহা জানে না। কড় কড় শব্দে আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। গাছে গাছে ঝড় বহিতেছে, দুরন্ত নিষ্ঠুর মেঘ জল চুরি করিয়া রাখে। সেই জলে শিল হয়। আকাশ হইতে নীচে নামিলে, সেই শিলের নাম বরফ। পৃথিবীর বৎসরের ছয় ঋতুর মধ্যে বসন্তের শেষে আর গ্রীষ্মের প্রথমে শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে। সে রাত্রে শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। ঝড়ের সঙ্গে, বজ্রের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি।

যোগীর ধ্যানভঙ্গ। বামে একটী ঘণ্টা, দক্ষিণে পুষ্পপাত্র। সম্মুখে ঘট, ঘটের সম্মুখে হোমাগ্নি। ঘটের মাথায় দর্পণ। ভূমে জানু স্থাপন করিয়া যোগিবর হোমাগ্নিতে কি আহুতি দিতেছেন। এক একবার দর্পণের মুখে মুখ রাখিয়া কাহার প্রতিমা দর্শন করিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিবার ব্যাঘাত করিতেছে কে? রাত্রিকাল? না বৃষ্টি? না ঝটিকা? না ভ্রান্তি? না পাষাণ-প্রতিমা? তবে কে? এই কথাই বড় শক্ত। যোগিবর ধ্যান করিতেছেন। মস্তকে দীর্ঘ জটা। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা। কিন্তু এ ত ব্রহ্মচারী নয়, মুখখানি নবীন।

নিজে গোপন করিলে কিছুই গোপন থাকে না। মুখখানি নবীন। হোমাগ্নি জ্বলিতেছে, ঘৃতপুষ্প আহুতি হইতেছে, ঘটমুখে দর্পণে প্রতিমার ছায়া পড়িতেছে। ব্যস্ত হস্তে যোগী সেই দর্পণখানি উল্টাইয়া ফেলিলেন। ভূমে জানু পাতিয়া যোড়হস্তে প্রার্থনা করিলেন, "দেবি! তুমি পাষাণী। আমাকে একটী বর দাও। আমি যেন তোমার মত পাষাণী হইতে পারি।"

ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত! তোমরা প্রকৃতির সৃষ্টি। কিন্তু চামুণ্ডা-মন্দিরের এই যে যোগী, এই যোগী তোমাদের কাছে জিতিল। দুর্গাদাস, বোপদেব, অমরসিংহ, পাণিনী, মরে, লেনী, হাইলি, সকলেরি অপমান করিয়া পুরুষকে কি কেউ কখনও পাষাণী বলিতে পারে? তবে এ যোগী অবশ্যই ছদ্মবেশী।

কাজ নাই, দেখা যাউক, যোগীর যোগ কত দূরে যায়। দেবি! আমি তোমার আশ্রিত। জানি তুমি পাষাণের মেয়ে, জানি তুমি পাষাণী, কিন্তু আমার উপর পাষাণের মত ব্যবহার কর কেন? তোমার যোগী তোমাকে কি বলে? যোগী বলেন, গড়িতে অনেক দিন যায়, ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু দেবি! এক রাত্রে, এক মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে ত গড়িয়াছিলাম, ভাঙ্গিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

পাথরের প্রতিমা। কোন লোকের কোন কথায় উত্তর দিতে জানেন না, সুতরাং নীরব।

ভক্ত কহিলেন, "দেবি! আমি তোমাকে ভাঙ্গিতে পারি, গড়িতেও পারি।" জোরে বজ্রাঘাত হইল। বনস্থলী যেন জ্বলিয়া গেল। মহা-কালের সঙ্গে মহাকালী-প্রতিমা ঘন ঘন যেন কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলে শুনিলেই ভয় হয়। কিন্তু ভয়ের সঙ্গে কি হাসি আসে? না ত। ভয় আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে না। হাসি আসে আসুক; আসিতে আসিতে হাসিকে অর্দ্ধ পথে তাড়াইয়া দেয়। তবে এমন সৃষ্টি কি জন্য? হাসি ফিরিয়া গেল; দেবীপ্রতিমার সম্মুখে জটাধারী ব্রহ্মচারী যোগী। প্রার্থনা ছিল, পাষাণি! আমাকে পাষাণী কর। যাহারা যোগী হয়, তাহারা সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তবে ইনি ব্যাকরণের অপমান করিলেন কেন? যোগী

ধ্যান করিতেছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন, সংসারে যাহা আমার সর্ব্বস্ব, তাহা যেন আবার পাই।

পাষাণপ্রতিমা হিমালয় পর্ব্বতের মত অচল, অটল। কেন জান? তিনি হিমাচলের নন্দিনী;—অচল, অটল হিমাচলের নন্দিনী।

করযোড় করিয়া যোগী আবার কহিলেন, "পাষাণি! আমি তোমাকে গড়িব। গড়িয়া যদি ভাঙ্গিতে পারি, তবে জানিব, আমার প্রতি তুমি দয়া কর কি না কর।"

পাষাণ-প্রতিমা একটুও কাঁপিলেন না। তাঁহার রাক্ষসীরা যেমন জড়, তেমনি জড়। আমাদের রাক্ষসীরা জড় নয়।

"তবে বুঝি যোগশাস্ত্র মিথ্যা?"

সত্য মিথ্যার বিচার হয় না। পাষাণময়ী চামুণ্ডাদেবী উপাসক যোগীর কথায় উত্তর দিলেন না।

আশা দর্পণ উল্টাইয়া পড়িয়াছে। পাষাণময়ী দেবী অটল ভাবে স্থির হইয়া রহিয়াছেন। যোগী তবে করেন কি?

একটী জবাপুষ্প লইয়া সম্মুখস্থ হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া যোগিবর ভক্তিভাবে প্রশ্ন করিলেন, "মা! আমার কি মুক্তি আছে?"

পাষাণময়ী দেবী সমভাবে স্থির থাকিয়া ভক্তের চক্ষুকে জানাইলেন, "শান্ত হও।"

দূরে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। অগণিত নরনারী মঙ্গলোৎসবে প্রমোদিত হইয়া দেবী-মন্দিরে সমাগত হইল।

এতই কি বিপদ? এই ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগ, এ রাত্রে কালী-পূজা দিতে ভাগ্যবানে কেন আসে? আমি অভাগা, তাই আমি এখানে। আর এই যে যোগী,—জানি না যোগী কি যোগিনী,—ছদ্ম বেশে এ যে এখন এখানে? বিধাতার চাতুরী, গ্রহের নিগ্রহ। কিন্তু এ সকল লোক ঢাক ঢোল বাজাইয়া থাকে। ও দশা! এরাই তারা।

আশা তবে আমারে পরিত্যাগ করে নাই। যাহারা আসিতেছে, তাহারা আশারই অনুচর। থাক তাহারা দূরে। এখন একবার চামুণ্ডাদেবীরে মানসোপচারে ভক্তিভাবে পূজা করি।

কাতরে করুণা কর করুণা-সুন্দরি !
ও যুগল পাদ-পদ্মে প্রণিপাত করি ॥
কে আমি কোথায় আছি কিছুই না জানি।
দেখাইয়ে দেও পথ ও মা হররাণি !
হারায়ে গিয়েছি পথ ঘোর অন্ধকারে।
কারে হৃদে রেখেছিনু, হারাইনু কারে ?
পথ দেখাইয়ে দেও, ঘরে যাই ফিরে।
ভয়ার্ত্ত অতিথি আজি তোমার মন্দিরে ।।
ভয়ার্ত্ত নহি মা তত। প্রেয়সী-বিচ্ছেদে
এসেছি অতিথিবেশে বড় মনখেদে ।।
দাঁড়াইয়া আছ দেবি! মহাকাল বুকে।
ধিয়া ধিয়া নাচিতেছ আপনার সুখে ।।
এই কি প্রকৃতি ? সতি ! এই কি সংসার ?
ধিক্ তোরে মায়াময়ি ! সব ফক্কিকার ।।
শুয়েছেন মহাকাল বিশ্বে বিশ্ব-ধর।
তুমি তাঁর বুকে উঠে নিত্য নৃত্য কর ।।
কারে আমি হারায়েছি তা কি তুমি জান ?
মনে জ্ঞানে ছিল সেই পরাণ-পরাণ ।।
কত জীব খেলা করে হৃদয়ে তোমার।
সব জান সতীলক্ষ্মি ! তোমারি সংসার ।।
কালে কর সৃষ্টি-স্থিতি কালে কর লয়।
সব জান সতীলক্ষ্মি ! কোথায় কি হয় ।।
আমি মা তোমার দ্বারে হয়েছি ভিকারী।
কৃপা কর কৃপাময়ি ! সৃষ্টি-জয় কারী

পাষাণের মেয়ে তুমি পাষাণী জননি!
হৃদে ভাবি পাদপদ্ম দিবস-রজনী ॥
বাসনা পূরাও মাগো মিনতি আমার।
যোড়করে শ্রীচরণে কোটি নমস্কার ॥

"কই মা! উত্তর ত দিলে না? পাষাণের কন্যা বলিয়া সত্যই কি তুমি পাষাণী? হস্তে তোমার খড়্গ আছে, ঐ খড়্গে অনায়াসে আমি জীবনের অবসান করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না। দেখিব, এই অনন্ত জগতে এই ক্ষুদ্র জীবের অবস্থানের স্থান আছে কি না। মা সর্ব্বময়ি! আমাকে একটু মাটী দাও। মাটীতে আমি তোমারে গড়িব। এই ত গড়িয়াছি, ঠিক ত মিলিল না, ভাঙ্গিয়া ফেলি। ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আবার গড়ি। গড়িতে পারিলাম না। মা মহাদেবি! তোমাকে কি কেউ গড়িতে পারে? খেলা করিবার জন্য লোকে তোমাকে গড়ে আর বিসর্জ্জন করে। বিসর্জ্জন করে কোথায়? জলে। জলে কি তুমি থাক? কোথায় না থাক? জলে, বাতাসে, মাটীতে, আগুনে, শূন্যে তুমি থাক। এখন এ পাষাণে প্রবেশ করেছ কেন? পাষাণি! এ অভাগার কথায় কি উত্তর দিবে না?

দেবী উত্তর দিলেন না। যোগী ধ্যানমগ্ন। এ বড় আশ্চর্য্য যোগী, এই বিপন্ন পথিকের নয়নে নয়নে যোগীর চক্ষের মিলন হইতেছে। যেন কখন কখন কোথায় কোথায় দেখা!

"দূর সর্ব্বনাশি! এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, একটীও উত্তর নাই। সত্যই তুই পাষাণের কন্যা পাষাণী।"

বিরহী যাহা বলে, তাহাই সত্য, চামুণ্ডাদেবী পাষাণময়ী-প্রতিমা, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি নাই। ভক্তে উপাসনা করে, ভক্তে পূজা করে, ভক্তে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। মা! তোমার পাষাণ-চরণ-পদ্মে। গ্রহণ কর কি না কর, মা! তুমি সর্ব্বময়ী, তুমিই তাহা জান।

যোগী তোমার কাছে কি আরাধনা করে? তোমার কাছে তাহার কি প্রার্থনা?

হায়! হায়! হায়! কি ভ্রান্তি!!! পাষাণীর কাছে কি উত্তর প্রার্থনা করি? জননীর জরায়ু হইতে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাকে ধরা যায় না, পিছ্-

লাইয়া পড়ে, কিন্তু ধাত্রী তাহার নাড়ীচ্ছেদ করিতে পারে। ইহা ত আমাদের দেশের প্রথা, কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণে জগৎ তিন। যদি আরও বেশী থাকে, থাকুক। কিন্তু ছোট কথায় তিন। স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল। মহীরাবণ যে দিন রাম-লক্ষ্মণকে চুরি করিয়া পাতালে লইয়া যায়, সেই দিন অহী-রাবণের জন্ম। হনূ তাহাকে ধরিতে পারে না ; পিছলাইয়া পড়ে, আমাদের জগৎলক্ষ্মী ঘোষ, আমাদের থাকমণি (রায়) ঘোষ, আমাদের সৌদামিনী মজুমদার, নূতন নূতন সূতিকাগৃহে ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষা দেন। নবপ্রসূত শিশুর নাড়ীচ্ছেদ করেন, শিশু কিন্তু তাঁহাদের হস্ত হইতে পিছলাইয়া পড়ে না। হনূমানের হস্ত হইতে অহীরাবণ পিছলাইয়া পড়িয়াছিল। পিতাকে স্মরণ করিয়া ধূলা উড়াইয়া আনিয়া হনূ সেই বৈরীপুত্রকে নিধন করিয়াছিল। এখানে ত আর সে কথা নাই।

যোগী ধ্যানে মগ্ন। যে বনবাসী পথিক ঘোর ঝটিকাবর্ত্তে বিত্রস্ত হইয়া দেবীমন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল, সে ব্যক্তি তখন কম্পিত, স্তম্ভিত-হৃদয়ে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান, যোগী তখন দর্পণখানি উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

বিদ্যুৎ চক্‌মকি। ঘরে এক এক বার বিদ্যুতের আলো আসিতেছে। আকাশে এক একবার মিলাইয়া যাইতেছে, ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারি না। নাম জান? আশা। কে সে আশা? আশা-চপলা। চপলাকে দেখা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। তোমাদের সাহেবেরা এখন চপলাকে ধরে সত্য, কিন্তু আমি যে চপলার সহিত নিগূঢ় প্রণয়-বন্ধনে বন্দী হইয়াছি, সে চপলাকে কেহ ধরিতে পারে না। তথাপি জানি আমি, সে আশা চপলা।

সর্ব্বনাশি! কথা কহিতেছ না কেন? পাষাণে তোমার নির্ম্মাণ, সেই জন্যই কি এত নিষ্ঠুর? পিতা তোমার পাষাণ, মাতা তোমার পাষাণী, তোমাকেও দেখিতেছি পাষাণময়ী, কিন্তু কথা কহিলে কি কথার উত্তর দিতে হয় না?

পাষাণময়ী চামুণ্ডাদেবী আমার এত কথার একটীও উত্তর দিলেন না। যোগিবর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হোমাগ্নির সম্মুখে ঠিক যেন মহাযোগে বসিয়া আছেন। আগুন জ্বলিতেছে। কপটতা কি ভণ্ডতা, চতুরতা কি বিলা-

সিতা, তাহা হৃদয়ে কখনও স্থান প্রাপ্ত হয় না। সেই যোগী হোমানলে একটী অস্ফুট মন্ত্র অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিয়া একটী গোলাপ আর একটী চাঁপাফুল আহুতি দিলেন।

"মা! যাই তবে।" তীক্ষ্ণকটাক্ষে আবার দেবীর মুখপানে চাহিয়া যোগিবর রুক্ষস্বরে কহিলেন, "তিষ্ঠ।"

আবার তন্ত্রের কথা মনে পড়িল, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ়! যাবন্মধু পিবাম্যহম্।"

এ যোগী কে? ভস্ম-বিভূষিত জটাধারী একটী নায়িকা।

তবে ছদ্মবেশ কেন?

বিরহে।

কাহার?

যে বিরহী, যে বিরহিণী, তাহাদের জিজ্ঞাসা কর।

যোগী একটী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "দেবি! মন যাহারে চায়, তাহারে কি পাইব না? তোমার হস্তের খড়্গ লইয়া জীবনের অবসান করিব, আর তোমার পূজা করিব না। জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

কাহাতে কাহাতে সাক্ষাৎ?

"তাহাতে আর আমাতে।"

"দেবি! প্রার্থনার কি উত্তর দিতে জান না? তোমার কপালে চক্ষু, বামহস্তে কৃপাণ, তাহার উপরে চক্ষু, পশুবলির বধকাষ্ঠ, তাহার উপরে চক্ষু, এই প্রকার পাঁচ চক্ষু। ত্রিনয়নে! এত চক্ষু থাকিতে আমারে কি দেখিতে পাইতেছ না? পদতলে ঘট, ঘটে গঙ্গাজল, সে জলে আমি তোমার পাদ-পদ্মের ছায়া দেখিতে পাই, তবে কেন মা! কি গোপন করিবে? তুমি আমারে চরণে ঠেলিতেছ, আমি তোমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, ভাব দেখি মা! কত তারতম্য।"

বলা হইয়াছে, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, মন্দিরে লোকজন কেহই নাই, কে আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়াছে, কে আসিয়া শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিয়াছে, বিশ্বময়ী দেবী তাহা জানেন। আর একটী কথা। সন্ধ্যাকালে, মহামায়ার নাম করিতে হয়।

নমস্তে সর্ব্বাণি, ভবানি ভবরাণি,
করুণা কুরু দেবি পামরে।
তোমার শ্রীচরণ, হৃদয়ে করি স্মরণ,
জীবন মরণ সম জ্ঞান।
সেই জ্ঞানে, ত্রিলোচনে,
ও চরণ ভাবি মনে,
আছি এই মরে মর্ত্তধামে ঃ—
অনন্ত মহিমা তব, যেই মহিমায় ভব,
শুইয়া আছেন পদতলে।
সেই মহিমার বলে, তোমার চরণ তলে,
আজি আমি বসেছি মঙ্গলে!
দয়া কর দয়াময়ি, বড় দুখে ব্রহ্মময়ি,
বাঁচিয়ে রয়েছি মহীতলে।

ব্রহ্মময়ী কথা কহিলেন না। পাষাণ কি কখনও কথা কহিতে জানে? নিষ্ঠুরের উপমা পাষাণ। যে চক্ষে জল নাই, সে চক্ষের উপমা পাষাণ, যে হৃদয়ে দয়া নাই, সে হৃদয়ের উপমা পাষাণ। শোকে-দুঃখে পাষাণ কি গলে? যাঁহারা উপমা দেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু আমি বলি, তাঁহারা মূর্খ। পাষাণে জল থাকে না, তবে জল থকে কোথায়? জলের উৎপত্তি কোথা হইতে? পর্ব্বতের কন্যা নদী, পর্ব্বতের পুত্র নির্ঝর, সমস্ত জলের উৎপত্তিই পর্ব্বতে। পর্ব্বত পাষাণ, তুমি দেবী পাষাণকন্যা পাষাণময়ী, তোমার চরণ জল, তোমার চরণ-কৃপা স্বচ্ছ জল। সেই জলে আমি স্নান করিব। বৃষ্টি হইতেছে, পৃথিবী হইতে বাষ্প আকর্ষণ করিয়া বিশ্বজলচোর জলধর ঘনঘটায় বারিবর্ষণ করিতেছে। সে জলে ভিজিতে আমি ইচ্ছা করি না! জলদবরণী মহামায়ি! আমি কেবল তোমারি করুণা-বারি প্রার্থনা করি। কথা কহিলে না? কৃপাবারি বিতরণ করিলে না? কি অপরাধ করিয়াছি মা? হস্তের খড়্গ দান কর, সেই খড়্গে তোমার চরণপদ্মে আত্মাকে

আমি বলিদান করিব। জগতে কি আমার স্থান নাই? মা বিশ্বময়ি! বিশ্বজননি! আমি বাঁচিয়া থাকিলে তোমার সৃজিত বিশ্বমণ্ডলে একটুও কি আমার স্থান হইবে না? ক্ষুদ্র জীব আমি, কীটানুকীট, দাসানুদাস।

মা পাষাণি! জগতে আমি বাঁচিলে তোমার বিশ্বসৃষ্টি কি রক্ষা হইত না? একা আমি এই ভারাক্রান্ত সংসারের কি এতই ভার হয়েছিলাম?

হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। ঘটের মুখের দর্পণ উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নাই, দর্পণে মহামায়ার প্রতিবিম্ব দর্শন না করিয়া যোগিবর কহিলেন, "মহাদেবি! তোমার নাম কি আশা? তুমি কি আশা-চপলা? হও যদি, তবে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় না কেন? কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছি? পাষাণপ্রতিমা কথা কহিতে জানে না, তবে আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছি? দেবি! তুমি কি এতই নিদয়া? গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটী কাননে সীতাবিরহে সীতানাথ কহিয়াছিলেন,—

"এ দুঃখের ভাণ্ড সতি! যদি ভেঙ্গে যায়।
এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায়॥"

আজ আমার সেই দশা। করুণাময়ী চামুণ্ডা দেবী আমার সঙ্গে কথা কহিলেন না। কে আমি, একটীবারও সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না! কে আমি? অন্তর্যামিনী ভৈরব-কামিনী ভৈরবী তা জানেন। আশার নিরুদ্দেশে নিরাশা-সলিলে কেন আমি ভাসিতেছি? আশাসাগরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কেন আমি নিমগ্ন হইতেছি? আশা-প্রসূতি মহাদেবী মহাকালী তাহা জানেন। জানিয়াও আশ্বাস দিতেছেন, তবে এখন আমি কাহার আশ্রয় লইব? পাষাণে কি জল থাকে না? আমার কপাল পাষাণ, কপালে ঘাম হয়। সেই ঘামে জল দেয় কে? তুমি আমি হয় ত বলিব বিধাতা, কিন্তু সে বিধাতা কে? পাষাণ। নিষ্ঠুরের উপমা পাষাণ, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর পাষাণ হইতেই সমস্ত জলের উৎপত্তি, তবে এই পাষাণময়ী কালিকা চামুণ্ডা আমার প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন না কেন? মা! তোমার তিনটী চক্ষু, চারিটী হস্ত, নয়নে চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি। এক হস্তে সৃষ্টি-নাশা খড়্গ। এক হস্তে দেবদ্রোহী দৈত্যশির; অপর হস্তে সন্তানের মায়ায়,

মায়াময়ীর বর ; আর হস্তে অভয়। আমি তাহাই চাই। খড়্গ দিয়া আমারে ছেদন কর, তাহাও মঙ্গল, ঊর্দ্ধ হস্তে অভয় দান কর, তাহাও মঙ্গল, নিম্ন হস্তে বরদান কর, তাহাও মঙ্গল, শিবসীমন্তিনী অভয়া! তুমি যাহা কর, তাহাই মঙ্গল, তাহাই শিব।

পাষাণী কথা কহিলেন না। পশ্চাতে কে একজন যেন দাঁড়াইয়াছিল, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "আরতির দর্পণ যে কেহ ফিরাইয়া লয়, তাহার মঙ্গল অনেক দূরে।"

যোগীর হৃৎকম্প হইল। তিনি ভাবিলেন, দেবী হয় ত ক্রোধভরে কথা কহিতেছেন না। আকাশে ঘন ঘন বজ্রধ্বনি। সন্ধ্যাকালে যেরূপ দেখা গিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অন্ধকার। এমন দুর্যোগ বোধ করি, সেই নিরাশ্রয় পথিকের নয়নে আর কখনও প্রতিফলিত হয় নাই। ঘন ঘন চিকুর-ঝন্‌ঝনা। অবিরাম বারিধারা। নিবিড় মেঘ, অবিশ্রান্ত বাতাস। জগতে হুলুস্থূল। কি ছিল, কি হলো, কিছুই স্থির করা গেল না।

নমি আমি সুরেশ্বরি! তব পদাম্বুজে,
দেহ মা করুণা-ছায়া। যে ছায়া প্রসাদে,
জয়ী আমি ভবধামে। সেই ছায়া বলে
নামিনু আসরে আজি হইয়া নবীন,
দেখাব নবীন চিত্র, মোহিবে যাহাতে
ভূলোকে প্রেমিক-কুল, অপরূপ দেখি।
শ্রীমন্দিরে বিরাজিছে অপরূপা দেবী
চামুণ্ডা। নৃমুণ্ডমালা শোভে গলদেশে,
প্রখর খর্পর খাণ্ডা বামকরযুগে,
পদতলে সদাশিব মহাকালরূপী
পড়িয়া আছেন যেন, অনন্ত অব্যয়,
বুকে তাঁর নৃত্য করে, কালী নৃত্যকালী।

অনন্ত সময়-স্রোতে ভাসিছে সংসার,
সেই সংসারের মাঝে ক্ষুদ্র জীব আমি
ভাসিতেছি, ভাবিতেছি তরিব কেমনে ?

"দেবি ! লোকে তোমাকে দয়াময়ী বলে। আমার প্রতি কি একটুও দয়া হইবে না ? অন্তরে অন্তরে যাহারে আমি চির-জন্মের মত ভালবাসি, তাহারে কি তুমি দেখাইয়া দিবে না ? সে ধন আমার কোথায় ? পাষাণি ! এতই কি তুমি নিষ্ঠুরা ? তুমি না কি করুণাময়ী ? কে বলে তোমাকে করুণাময়ী ? আমি অনাথা, নিরাশ্রয়, বিরহ-বিচ্ছেদে বিচ্ছেদী !

চরণের দাসী আমি তারিণী তোমার।
তুমি বিনা অধিনীর গতি নাহি আর ॥
বিপদ সঙ্কট ঘোরে বাঁধা পড়িয়াছি।
তবু দেবি ! তুয়া পদে চিরদাসী আছি ॥
কত কি তরঙ্গ খেলা করিছে হৃদয়ে।
আসে যায় কত রঙ্গে জানি না অভয়ে ?
সাগর আমার কি মা বালিকা-হৃদয়।
কেন মা সংসার তাপে পাই এত ভয় ?
অভয়া অভয়কালী হে সুরসুন্দরি !
দয়া কর দয়াময়ি ! প্রণিপাত করি ॥
যারে ভালবাসিয়াছি জীবনে জীবনে।
সেই হার কণ্ঠহার গাঁথা আছে মনে ॥
মা তুমি অমররাণী বিরাজ আকাশে।
ভবে আমি আসিয়াছি ভব সুধা-আশে ॥
সে সুধা অমর-সুধা সদা করি পান।
তোমারে কল্পনা বলি দান করি প্রাণ ॥

আমার সহায় শুধু তুমি মা সংসারে।
এসো হৃদি-পদ্মাসনে পূজি মা তোমারে ॥
এসো মা হৃদয়াকাশে কল্পনা সুন্দরি!
মনের বাসনা যত নিবেদন করি ॥
পাষাণপ্রতিমারূপে বন-নিবাসিনী।
মহাকালী মহাকাল-হৃদি-বিলাসিনী ॥
কি আশ্বাস দিলে মোরে জানিল না মন।
তোমার হৃদয় কি মা পাষাণে গঠন?
কেন আমি বলি তোরে দেবী দয়াময়ী?
কত মায়া দেখাইবি তুই মায়াময়ী?
আমারে করুণা কর আমি মা অবলা।
সংসারের আশা তুমি, তুমি মা চপলা ॥

ভালবাসার কি এই নিদর্শন? সেই এক দিন, যে দিনে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া রক্তমাখা মুখে তুমি কল্পনাসতী আমার সম্মুখে সহাস্যমুখে নৃত্য করিয়াছিলে, সে দিন কি মা তোমার মনে পড়ে?

প্রশ্ন করিতেছি, কিন্তু উত্তর পাইতেছি না। দেবি চামুণ্ডে! মা! জগৎ তোমার কীর্ত্তি। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী তুমি। মা জগজ্জননি! জগত্তারিণি! আমার কথার উত্তর দাও।

দিবে না? কথা কহিবার তোমার শক্তি নাই? যুগে যুগে যখন জীবিত ছিলে, তখন সুরাসুর তোমায় দেখিত, মানুষে তোমায় দেখিতে পাইত না; কিন্তু দেখ দেখি সতি! কি আশ্চর্য্য তামাসা! আমি কলিযুগের মানুষ, মনের চক্ষে অহরহ আমি তোমায় দর্শন করিতেছি, এ মন্দিরে তুমি পাষাণময়ী হইয়াছ। এ কি বড় অদ্ভুত কথা? পাষাণ-নন্দিনী,—পাষাণী-নন্দিনী, তুমি যে পাষাণী হইবে, ভবিষ্যদ্বক্তার মুখে সে কথা পূর্ব্বে পূর্ব্বে,—বহু পূর্ব্বে বাতাসের সঙ্গে ধ্বনিত হইয়াছিল। তুমি পাষাণ কন্যা পাষাণী।

আবার আমি ধ্যানে বসি। যোগে তোমার আরাধনা করিতে হয়। সজীব ঠাকুর আমাদের চক্ষুগোচরে আইসেন না। আসেন কেবল পাথরে আর মাটীতে, কর্ণে যিনি মূলমন্ত্র প্রদান করেন, তিনি সজীব মনুষ্য, কিন্তু মন্ত্র দেন কি? একটী কথা, একটী বাতাস। তুমি মা সুরেশ্বরি! সেই বাতাস-মন্ত্রে আমি কি তোমার পূজা করিব? মনে পড়ে না।

"কায়েন মনসা বাচা
তত্র নান্যা গতির্ম্মম।
শরণাগত দীনার্ত্ত-
পরিত্রাণ পরায়ণী।
সর্ব্বস্বার্থ হরা দেবী
নারায়ণি নমস্ততে॥"

চামুণ্ডা-পূজার কি এই মন্ত্র? আমি ত তাহা জানি না। মা! তুমি কি শক্তি? তুমি কি নারায়ণী? তবে পাষাণে আবির্ভূতা রহিয়াছ কেন? এত করুণস্বরে করুণা প্রার্থনা করিতেছি, কথা কহিতেছ না কেন? এখন সত্য জানিলাম, পাষাণের কন্যা পাষাণী। হিমালয় হিমালয়ের রাজা। মেনকা হিমালয়ের রাণী, তুমি মা জগদম্বা, সেই পাষাণের কন্যা পাষাণী চামুণ্ডা। অহঙ্কার কর, ধিক্ তোমাকে! বৃথা তোমার অহঙ্কার, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্রী, তাঁহার কি অহঙ্কার শোভা পায়? মা! আমার কি আশ্রয় হবে না? আমি কি আশ্রয় পাব না? চিরদিন আমি কি নিরাশ্রয়ে রোদন করিব?

মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। নির্লজ্জ পবন সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া ঘন ঘন ঝঞ্ঝাকে আহ্বান করিতেছে। ঘোর অন্ধকার। কাননে দেবীমূর্ত্তি নিশ্চলা। সম্মুখে পদাবনত ভক্ত। মেঘে বাতাসে স্তুতি-নতি যেন মিলাইয়া যাইতেছে, বারম্বার প্রণাম করিয়া যোগিবর কহিলেন,—

"হবে না কি সুরেশ্বরী বাসনা পূরণ?"

পাষাণের স্পন্দন নাই। দ্বিতীয় বার যোগী কহিলেন,—

"হবে না কি সুরেশ্বরি বাসনা পূরণ ?
পাব না কি ব্রহ্মময়ি! মম প্রাণধন ?"

পাষাণ-প্রতিমা উত্তর করিলেন না।

আমরা জানি, যোগীঋষির রাগ হয় না। কিন্তু এ যোগীর রাগ হইল। রাগভরে কহিলেন,—

"পাব কি না পাব সেই হৃদয়রতন ?—
কহ সত্য, কহ সত্য, কহ সর্ব্বনাশি!"

সর্ব্বনাশী পাষাণী। এক এক সময় পাথরে ঘাম হয়, কিন্তু কথা ফোটে না, এক এক সময় পাথরে আগুন জ্বলে, কিন্তু বিরহীর হৃদয়কে শান্ত করিতে পারে না। আগুন কি শান্ত করে ? ভুল কথা। জ্বালার উপর আরও জ্বালায়। তা কেন ? পাথরে জল আছে, সেজল কি বিরহী হৃদয়কে শীতল কবিতে পারে না ? যদি সম্ভব হয়, চামুণ্ডা তাহা পারিলেন না।

পতির বুকে দাঁড়াইয়া চামুণ্ডাদেবী হাসিতেছেন। পতির নাম কি ? অনন্ত মহাকাল। সেই মহাকাল আমাদের ইহসংসার। আর সেই নৃত্য-কালী জগৎসৃষ্টিকারিণী প্রকৃতিসতী। কাল পড়িয়া রহিয়াছেন, ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। অনন্ত মহাকাল শাদা, তাঁহার বুকে কালী,. শাদা বুকে কালী কি আশ্চর্য্য! জগতের খেলা কি আশ্চর্য্য! মহাকালের শাদা বুকে মহাকালী নিত্য নিত্য নৃত্য করিতেছেন। কাল পড়িয়া রহিয়াছেন। নৃত্যকালী খড়্গহস্ত কেন ? যিনি জগৎপালিনী জগৎ নিস্তারিণী, তাঁহার হস্তে সৃষ্টিসংহারক খড়্গ কেন ?

জান না কি তা ? দেবাসুরের সংগ্রাম। সংসারের যাহারা শান্তি হরণ করে, তাহাদের বিনাশ করা প্রকৃতিসতীর ব্রত। অভিধান অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে, "সুর" অর্থে সুধাপায়ী, অমর, দেবতা। আর "অসুর" তাহা ছাড়া। মাঝে বাধা একটী "অ"। যখন সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল, তখন এই সুরাসুরের প্রভেদ বুঝাইয়া দিয়াছিল কে ? মোহিনী।

নমি আমি তাঁর পদে শত শত বার।
অনন্ত বিশ্বের কর্ত্তা বিশ্বের আধার॥

দেবী চামুণ্ডে! আমি কি এত নরাধম? আমার কথার একটীও উত্তর করিতেছ না কেন? দেবি! জবাকুণ্ডে আমি তোমার ছবি দেখিতেছি। দৈত্যকুল বিনাশ করিয়া বনমধ্যে তুমি এখন রণজয়ীরূপে বিরাজ করিতেছ, কিন্তু কেন মা! তুমি অভয়া। জগৎকে অভয় প্রদান কর। বনে কেন? রিপুকুল ধ্বংস হইয়াছে, উত্তম। তোমার ভয় কি?

হা পাষাণি! একটী কথায় একটীও কথা কহিতেছ না। একটী কথার একটীও উত্তর করিতেছ না! আমার অপরাধ? দেবী চামুণ্ডে! এক রক্তবীজ সহস্র সহস্র রক্তবীজ হইয়াছিল। কিন্তু আমি একা মাত্র। যে মূর্ত্তিতে তুমি রক্তবীজকে বিনাশ করিয়াছ, সেই মূর্ত্তিতে তুমি আমাকে বিনাশ কর; যদি না কর, প্রাণপ্রতিমাকে দেখাইয়া দাও।

যোগী এমন কথা বলেন কেন? যোগীর আবার প্রাণপ্রতিমার আশা কি! এ যোগী তবে কি ভণ্ডযোগী? না ত, যোগে যাহা ভাবিতে হয়, এ যোগী তাহাই ভাবেন। এ যোগীর মুখে তবে এমন কথা বাহির হয় কেন?

বোধ করি, কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। ইনি নবীন যোগী, নবীন যোগীদের প্রাণপ্রতিমা থাকা অসম্ভব বোধ হয় না। কিন্তু কে তবে সেই প্রাণপ্রতিমা? যোগিনী?—না। তাহা হইলে দেবীর সম্মুখে যোগাসনে বসিয়া যোগিনীকে ভাবিবেন কেন? তবে কি চামুণ্ডাদেবী? তাহাই বা সম্ভবে কিরূপে? যোগীরা এক মনে একমাত্র অদ্বিতীয় জগদীশকে ধ্যান করেন, অপর কোন দেবদেবীর উপাসনা করেন না।

হইতে পারে। ইনি হয় ত শাক্তযোগী। তাহা না হইলে দেবীর নিকটে ধ্যান-যোগে বসিয়া থাকিবেন কি জন্য? চামুণ্ডার প্রতি অবশ্যই ইঁহার ভক্তি আছে।

যোগী আবার কথা কহিতেছেন। করযোড়ে ললাট স্পর্শ করিয়া ভক্তিভাবে কহিতেছেন, "মা! তুমি পাষাণের মেয়ে,—কলিযুগে নিজেও পাষাণময়ী, আমার করুণবিলাপ তোমার পাষাণ কর্ণে স্থান পাইবে না,—পাষাণ-শ্রবণ-কুহরে প্রবেশ করিবে না, ইহা জানি; কিন্তু মা! জগতে আমার তবে কোথায় আর আশ্রয় আছে?"

ভূমে জানু পাতিয়া, আকাশের দিকে নয়ন উত্তোলন করিয়া, অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে যোগিবর স্তব করিতে লাগিলেন।

প্রণমামি মহাদেবি! চরণকমলে।
আশ্রয় লয়েছি সতি! কৃপা তরুতলে॥
বড় দুখে সুরেশ্বরি! দহিছে জীবন।
এ বিপদে রক্ষা কর দিয়া শ্রীচরণ॥
বিপত্তিবারিণী তুমি ত্রিপুরা-সুন্দরি!
বিপত্তি ভঞ্জন কর, এই ভিক্ষা করি॥
মাতা পিতা কাছে নাই, একা নিরাশ্রয়।
কার কাছে দাঁড়াইব? কে দিবে আশ্রয়?
তুমি দেবি! মাতাপিতা, তুমি সর্ব্বময়ী।
দেহি মে আশ্রয় দেহি, দেহি দয়াময়ি!
ভাসিয়া যাইছে তরি অকূল সাগরে।
তৃণ মাত্র কাছে নাই বাঁচি মা কি ধরে?
বাঁচিবার সাধ নাই, হয়েছি হতাশ।
কৃপা করি কৃপাময়ি! পূর্ণ কর আশ॥
করুণা কটাক্ষে চাও শঙ্করঘরণি!
রক্ষা কর, দাক্ষায়ণি জলদবরণী॥
একটী পল্লব ছিল, আশ্রয় আমার।
তারে হারা হয়ে হেরি ভব অন্ধকার॥
ভেসে গেছে সে পল্লব নিরাশার স্রোতে।
যোগী হইয়াছি আমি জীবনান্ত ব্রতে॥
ভবানি! ভববশরাণি! তুমি বিনা আর।
ভবধামে ভবানী গো না দেখি নিস্তার॥

চাহ মা চামুণ্ডাদেবি ! সদয় নয়নে।
শরণ লয়েছি আজি রাতুল চরণে ॥
নাহিক মা ! ফুলজল, নাহিক চন্দন।
কি দিয়ে করিব পূজা ও রাঙা চরণ ?
ভক্তি-চন্দনেতে মাখি, নিত্যশ্রদ্ধাফুল।
পূজা করি কুললক্ষ্মি ! দেহ মোরে কূল ॥
অকূলে আমার বলি, কে হবে আমার।
এ বিপদে সারমাত্র চরণ তোমার ॥
রক্ষিয়াছ দেবকুলে কতশত বার।
হরিয়াছ কত বার ভূলোকের ভার ॥
আমি মা তোমার দাসী নগেন্দ্র-নন্দিনি !
আমারে করুণা কর শিব-সীমন্তিনী ॥
পাষাণের মেয়ে বলে হয়ো না পাষাণী।
লয়েছি শরণ দেবি ! দেহ পা-দুখানি ॥
পাষাণের জলে সৃষ্টি নদ-নদীকুল।
পাষাণ কঠিন নয়, সুধা সমতুল ॥
অকূলেতে ভাসিতেছি ও মা ভবরাণি !
দয়া করি, দয়াবতি ! রক্ষা কর প্রাণী ॥
যারে হারা হয়ে আমি কাঁদি নিশিদিন।
দেহ মন হইতেছে দিন দিন ক্ষীণ ॥
তাহারে আনিয়া দাও গণেশ-জননি !
দীনের জননী তুমি মহেশ-রমণী ॥
যদি মা বাঁচাতে চাও দেহ পদছায়া।
কাতরা কিঙ্করী প্রতি চাহ মহামায়া ॥

তুমি বিনা বিশ্বমাঝে কেহ নাহি আর।
ভক্তিভাবে শ্রীচরণে শত নমস্কার ॥
যদি মা মারিতে চাও, কর মা নিধন।
চরমেতে পাই যেন চরণ-শরণ ॥

যোগী বলে কি? এই বুঝি তাহার স্তব? যোগীরা কি এইরূপে স্তব করে? রাখিতে হয় রাখ, মারিতে হয়, মার, পদছায়া দান কর, করুণা করিয়া আশ্রয়-বস্তু দেখাইয়া দাও, যোগীদিগের দেবস্তুতি কি এই প্রকার? যোগ-ধর্ম্ম কি এইরূপ কদাকার? আরও এক আশ্চর্য্য কথা, স্তুতি করিতে করিতে যোগী একবার বলিয়াছেন,—

"আমি মা তোমার দাসী নগেন্দ্র-নন্দিনি!"

কথার অর্থ কি? এ যোগী কি স্ত্রীলোক? এ যোগী কি চামুণ্ডার দাসী? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!! নিশ্চয়ই এ যোগী ছদ্মবেশী। এ কোন প্রিয়-বিচ্ছেদে বিরহিণী।

পাষাণময়ী দেবী যেমন অচলা, যেমন অটলা, তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, বাতাসে একগাছি কৃত্রিম কেশ মাত্রও দুলিতেছে না। রক্তবীজ বধের সময় দেবী মহাদেবীর চামুণ্ডা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ হয়, তাহার পরেই পদতলে মহাকাল। নবীন যোগী কতই কাকুতি মিনতি করিলেন, পাষাণের নিকটে কিছুতেই সান্ত্বনা পাইলেন না। কেনই বা পাইবেন? মানু-ষের কাছে লোকে প্রতারণা করিয়া পার পায় না। এত দুঃসাহস, দেবতার কাছে প্রতারণা? দেবতার কাছে প্রবঞ্চনা? স্ত্রীলোক হইয়া পুরুষের ভাণ? চামুণ্ডার বামহস্তের খড়্গ যদি সজীব হইত, প্রায়শ্চিত্ত বাকী থাকিত না।

নির্লজ্জ ভণ্ডযোগী,—ছদ্মবেশধারিণী চতুরা বিরহিণী আবার জোড়করে স্তুতি করিয়া কহিল, "মা চামুণ্ডে! সত্য কি তবে তুমি দয়াময়ী হইয়া আমার প্রতি নিদয়া হইলে?"

গভীর ঝন্‌ঝন্‌শব্দে মন্দিরের দরজা খুলিয়া গেল, একজন অস্ত্রধারী পুরুষ সিক্তবসনে শূন্যমস্তকে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে মন্দিরে

আর পূজা হয় না, যে মন্দিরে আর আরতি হয় না, সে মন্দিরে আজ রাত্রে এত ঘটা কেন?

জগদীশ্বরী বলিতে পারেন।

যোগিবরকে দূর হইতে সম্বোধন করিয়া সেই মূর্ত্তি কহিলেন, "অপ্সরা! আজিও তুমি বাঁচিয়া আছ?"

যোগী মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন; হৃদয়ে যাঁহাকে ভাবনা করিতেছিলেন, তিনিই সম্মুখে। দেবীকে পশ্চাতে রাখিয়া সেই মূর্ত্তির দিকে ছুটিয়া গিয়া প্রগাঢ় প্রেমভাবে স্নেহভরে যুগল হস্তে সেই নবীন আগন্তুকের যুগল হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "ভূপেশ! তুমি?—তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ? আমার মনে ছিল না, আর তুমি ক্ষণকালের জন্যও আমার নেত্র-সমীপে খেলা করিবে, আমার মনে ছিল না। আবার ঐ প্রতিমার,—প্রেমময়ী প্রতিমাব প্রেমময়ী ছায়া আমার হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবে। তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ? বিশ্বাস ত হয় না, জ্ঞান হয়, তুমি যেন কোন মায়াবী।"

"ছাড়িয়া দাও,—ছাড়িয়া দাও,—অপ্সরাসুন্দরি! জীবিতেশ্বরি! ছাড়িয়া দাও। শত্রু সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে,—আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছি,—গৃহে গমন করিয়াছিলাম, দেখিতে পাইলাম না, তোমার বিলাস-উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, দেখিতে পাইলাম না। একজন কিঙ্করী কহিল, চামুণ্ডার মন্দিরে। সেই কথা শুনিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। বিদায় কর। চামুণ্ডাদেবীর সাধ্য নাই, আজ রাত্রে আমাকে রক্ষা করেন। মহা বিপদ!"

নবীন যোগী চপলা-গতিতে যোগীবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তেজস্বিনী এলোকেশী রমণী-মূর্ত্তি বিঘূর্ণিত রক্তনয়নে প্রবেশকারীর নয়নে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সতেজে সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! চামুণ্ডা রক্ষা করিতে পারেন না? কি তোমার মহা বিপদ ভূপেশ? চামুণ্ডাদেবী রক্ষা করিতে পারেন না, এমন কি তোমার মহা বিপদ ভূপেশ? চামুণ্ডা রক্ষা করিতে না পারেন, আমি রক্ষা করিব।"

"বলিবার সময় নাই।—মহাশত্রু পশ্চাতে। ছাড়িয়া দাও, শীঘ্র পলায়ন

করি। তোমার নিকট আমার শেষ বিদায় ভিক্ষা। পলায়ন ভিন্ন তোমার আমার উভয়েরই জীবন সঙ্কটাপন্ন।"

উদাসভাবে হাস্য করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "তোমার মত আমারও কি মরিবার ভয় আছে? মরিতেই ত আসিয়াছি। তোমারে হারাইয়া সংসারে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে সেই বাঁচিয়া থাকিবারই নাম অনন্ত মৃত্যু। ভূপেশ! তোমা-হারা জীবন পরিত্যাগ করিতে অপ্সরাসুন্দরী তিলমাত্র ভয় করে না।

তোমা হারা হয়ে যদি দেহে রহে প্রাণ,
ধমনীতে বহে যদি অধীনীর প্রাণ,
রাখিব না সেই প্রাণ, জ্বলন্ত অনলে
আহুতি করিব নাথ! যাবে, যাক্, জ্বলে॥
তুমি হে হৃদয়বন্ধু! আমি হে তোমার,
হৃদি-পদ্মে পাদ-পদ্ম করিয়াছি সার॥
বাসনা হেরিতে সদা, ও চন্দ্রবদন,
না দেখিলে, পলে পলে কেঁদে উঠে মন॥
দেখা কি দিবে না কান্ত! অধীনী বলিয়া?
মনে হ'লে বজ্রানলে যাই যে জ্বলিয়া॥

তুমি কৃতান্তকে ভয় কর? তুমি ভীরু; তুমি কৃতান্তকে ভয় কর, কিন্তু এই অবলা অপ্সরা প্রিয়বিরহিত জীবনে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। ভূপেশ! ভয় নাই। মিনতি করি, আমারে পরিত্যাগ করিও না। দাসী ও চরণে কি অপরাধ করিয়াছে? ভূপেশ! যে নিধি দিবানিশি হৃদয়ে জাগে, সে নিধি হারাইয়া অপ্সরাসুন্দরী বাঁচিয়া থাকিবে, এ কথাও কি তুমি মনে ভাব ভূপেশ? তুমি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ?

"না—না—না,—ছাড়িয়া দাও, আমার জীবনের এক ব্রত আছে, প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা আছে, সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, সে ব্রত অপূর্ণ রাখিয়া

দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কুকুরের মত আমি মরিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে সবলে অপ্সরাসুন্দরীর হাত ছাড়াইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভূপেশচন্দ্র দ্রুতগতিতে মন্দির হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছেন, এমন সময় মন্দিরের সোপানে মহা-কলরব। আট দশজন অশ্বারোহী লোক হুহুঙ্কারশব্দে সোপান-সম্মুখে উপস্থিত। ভূপেশচন্দ্র নিশাকালে অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে যে পথে ধাবমান হইয়াছেন, অনুগামী অশ্বারোহী বিপক্ষদল, ক্ষণে ক্ষণে সেই পথ লক্ষ্য করিয়া যেন কৃতান্ত-বেশে, মন্দির পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছে।

ভূপেশের গতিরোধ হইল। আর পলাইবার পথ নাই, আর পলায়নের উপায় নাই। শীঘ্রহস্তে দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া সভয়-চকিত ভূপেশচন্দ্র দেবীর বামপার্শ্বে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। ছদ্মবেশিনী যোগিনী যতক্ষণ আরাধনা করিতেছিলেন, ঘটের পার্শ্বে ততক্ষণ একটী আলো জ্বলিতেছিল, সে আলো এখনও আছে, কিন্তু কিছু নিষ্প্রভ,—নিষ্কম্প।

সুস্থির ভাবে অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ভীরু কাপুরুষ! শীঘ্র দ্বার উদ্ঘাটন কর, তোমার শরীরে কি বিন্দুমাত্রও ক্ষত্রিয়-রক্ত নাই? শত্রুভয়ে লুক্কায়িত! আমি অবলা, আমি কাহাকে দেখিয়াও প্রাণভয়ে এমন করিয়া লুকাই না। ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে, ক্ষত্রিয় বীরপত্নীর জঠরে এই অপ্সরার জন্ম হইয়াছে। যদি তুমি না পার, সরিয়া দাঁড়াও, একাকিনী আমি বিপক্ষ-সমক্ষে এই মুক্তকেশে উপস্থিত হইব। আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে যদি তুমি অসমর্থ হও, এই চামুণ্ডাদেবীর কৃপাণে স্ত্রীজাতি হইয়া আমি তোমাকে রক্ষা করিব। শীঘ্র দ্বার উদ্ঘাটন কর। দুরাচারেরা যদি সবলে দ্বারভগ্ন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে দেবীর অপমান হইবে। কলিযুগে প্রায় সকল দেবদেবীই পাষাণে গঠিত। কিন্তু তাহা বলিয়া ভক্তহৃদয় পাষাণে গঠিত হইতে পারে না। আমি শুনিয়াছি, এক নদীর জলে অবগাহন করিয়া মানুষে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, পাঠকমহাশয়েরা হয় ত শুনিয়াছেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশের প্রথম খ্রীষ্টান; কিন্তু তাহা সত্য নয়, কেষ্টা ছুতোর শ্রীরামপুরের গঙ্গায় স্নান করিয়া সর্ব্ব প্রথমে, (ধর্ম্মের মর্ম্ম জানুক আর নাই জানুক), কেষ্টা ছুতোর সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্টান

হইয়াছিল। যিশু খ্রীষ্ট এখন জগতে বাঁচিয়া নাই, ছবিতে সে দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেব-দেবী পাষাণে আর মাটীতে। কেষ্টা ছুতোর যখন গঙ্গায় ডুব দেয়, (জর্দ্দানে নয়, গঙ্গায়) তখন একজন পাদরী অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "পাষাণমৃত্তিকার দেবদেবীগণ! তোমাদের একজন পরমভক্ত তোমাদিগকে পদরেণুর সঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল, ইহা দেখিয়াও কি তোমরা কাঁপিতেছ না?* সে দিনের কথা এখনও আমাদের মনে আছে। কিন্তু গঙ্গাজলের কথা, আর পাদরী সাহেবের কথা, সেই চরণরেণুর কথা, আর সেই দেবদেবীব কম্পনের কথা, সত্য যদিও মনে পড়ে, তবু পাষাণপ্রতিমা পাষাণময়ী দেবীর অপমান হইবে, তাহা আমি চক্ষে দেখিব না, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। শীঘ্র দ্বার উদ্ঘাটন কর।"

আতঙ্কে আতঙ্কে অপ্রতিভ হইয়াও কম্পিত হস্তে ভূপেশচন্দ্র মন্দিরের দ্বারমুক্ত করিলেন; সম্মুখে কৃতান্ত-দূত-রূপী শোণিত-লোভী বৈরিদল দণ্ডায়মান। তাহাদের গর্জ্জনে, লম্ফেঝম্পে আর ঝঞ্চনাসহ বীরদর্প-হুঙ্কারে মন্দির যেন দুলিতে লাগিল।

"সর তুমি।" ভূপেশচন্দ্রেব হস্ত ধারণ করিয়া বীরাঙ্গনা সদর্পে তাঁহারে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "সর তুমি। দেখি আমি কাহার সাধ্য এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া এই চিরপবিত্র দেবীমন্দির অপবিত্র করে! তোমার কটি-বন্ধের অসি আমাকে প্রদান কর;—না, তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান, তোমারে অস্ত্র-শূন্য করিব না। চামুণ্ডার হস্তের খড়্গ লইয়াই আমি এই দুরাত্মাদের নিধন সাধন করিব।" এই কথা বলিয়া দেবীর চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক অপ্সরাসুন্দরী দেবীহস্তের খড়্গখানি গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধাবৃত দ্বারপথে সদর্পে দাঁড়াইলেন। দেবীর দিকে চাহিয়া নত মস্তকে আর একবার কহিলেন, "অভয়ে! একবার অভয় দিয়াছ. আবার অভয় দাও। পাপিষ্ঠেরা যেন আমারে বিভীষিকা দেখাইয়া বিমোহিত না করে। যাহারা পাপাচার, দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিলেই ভয় হয়। মা! পাপী লোকের নয়ন হইতে আমারে পরিত্রাণ কর।"

---

* "O Gods and Goddesses of clay and stone! do you not tremble to see, that one of your devoted disciples has trumbled you away like the dust of the earth."

পাষাণী হয়েছ তুমি, করুণাসুন্দরি !
তবু মা পাষাণপদে প্রণিপাত করি ॥
কেন আমি আসিয়াছি, জান তুমি কালি !
পতিবুকে নৃত্য কর, তুমি নৃত্যকালি !
বেহায়া তোমার মত নাহি মা সংসারে।
জিব কেটে লজ্জা তুমি দেখাইছ কারে ?
লজ্জাহীনা দিগম্বরী খাণ্ডা-মুণ্ড ধরা।
ভক্তি করি শুধু দেখি বরাভয়-করা ॥
কটিতে কিঙ্কিনী তোর দৈত্যকর-মালা,
গলদেশে পরিয়াছ দৈত্যমুণ্ড-মালা ॥
তথাপি পাষাণী তুমি এখনো পাষাণ।
পাষাণচরণতলে দেহ মোরে স্থান ॥
এতক্ষণ যাহা আমি ধ্যান করিলাম,
তোমার কৃপাতে সেই নিধি পাইলাম ॥
পাষাণি ! পাষাণে কি মা এত জল থাকে ?
নমস্কার, নমস্কার করি মা তোমাকে ॥
দেহি পাদপদ্ম সতি ! দেহি মোরে কূল,
দেখি আমি পাষাণেতে ফোটে পদ্মফুল ॥
একা আমি দেখিব না দেখাব জগতে,
দেখাইয়ে ছুটে যাব নিবৃত্তির পথে ॥

ভূপেশচন্দ্র ! তুমি কোথায় গেলে ? তিরস্কার করিয়াছি, সেই নিমিত্ত কি অভিমান হইয়াছে ? জান ত তুমি, অপ্সরাসুন্দরী তোমার চরণের চিরদাসী। মানে অভিমানে দাসী কখন কি বলে, তাহা কি মনে করিতে আছে ? এই দেবী পাষাণময়ী, পাষাণে কত দয়া, তাহা ত দেখিতেছ।

কত দিন তোমারে দেখি নাই, দেখাইয়া কে দিলেন? এই পাষাণী। পাষাণে যখন এত দয়া, তখন রক্তমাংসের শরীরে কি একটুও দয়া থাকিতে পারে না?”

সে দিন মহামায়ার আরতি হয় নাই। গৃহে আলো ছিল। দুষ্ট লোকেরা মন্দিরের বহির্ভাগে আসিয়া উৎপাত করিতেছিল; ক্ষত্রিয়-সন্তান, কেন জানি না, শত্রুভয়ে ভীত হইতেছিলেন। আমাদের স্নেহময়ী নায়িকা মহামায়ার খড়্গ,—বামকরের খড়্গ, দক্ষিণ করে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধরুদ্ধ দ্বারের দিকে ধাবিত হইতেছিলেন, ভূপেশচন্দ্র ধারণ করিলেন। আর কেহ দেবীমন্দিরে থাকিলে হয় ত বাধা দিতে পারিত না, কিন্তু বাঁধার উপর বাধা হইতে পারে না, মনে করিয়া, উদাসীন ভূপেশচন্দ্র ভূপেশ-নন্দিনীকে নিবারণ করিলেন।

এ কি! কারা এরা?—দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ভূপেশচন্দ্র সম্মুখে দেখিলেন, অনেক লোক। বীরকুমারী পুনঃপুন দ্বারমুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন;—ভূপেশচন্দ্র যখন দ্বারমুক্ত করিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, আমি স্বয়ং যে কার্য্য করিতে যাইতেছিলাম, বিধাতা যেন আমার এক প্রতিনিধি আনিয়া সেই কার্য্য সাধন করিলেন। তখন তাঁহার মানসে আর এক প্রকার নবীন ভাবের আবির্ভাব। প্রতিমার দিকে চাহিয়া অন্ধকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা খড়্গধারিণি! তোমার খড়্গ কোথায়? আমি ক্ষত্রিয়কুমারী, খড়্গে আমাদের দীক্ষা হয়। তুই মা ভিকারিণী শিবরাণী, তোর হাতে খড়্গ থাকে কেন? কালি! তুমি মহাকালী; পৃথিবীর শত্রু বিনাশ করিতে তোমার উদ্ভব; কিন্তু আজ মা তুমি খড়্গশূন্য কেন? উন্মাদিনী দাসী বলিয়া ক্ষমা কর, বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, আজ তুমি খড়্গশূন্য কি জন্য?”

একটী আশ্চর্য্য কথা আছে. মাটীতে আর পাথরে আমরা দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখি, এখন কিন্তু একখানি পট আছে, সে পট কোথায় থাকে? সকলে হয় ত সকল সময় দেখিতে পায় না, সে পটে মহামায়া বসিয়া থাকেন। পাঠক মহাশয়! সে পট কি আপনি দেখিয়াছেন? শারদীয়া ষষ্ঠী যামিনী মনে পড়ে? গণেশজননী মহামায়ার সহাস্য বদন।

সত্য কিছু মাটীর প্রতিমা হাস্য করেন না। কিন্তু ভক্তের চক্ষু দর্শন করে, ভগবতী যেন হাস্য করিতেছেন। পূর্ণিমার এক পক্ষ পরে অমাবস্যা হয়, কৌমুদীসতী এক পক্ষ কাল একটু একটু করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া শেষকালে গাঢ় অন্ধকারের কোলে শয়ন করেন। কিন্তু শারদীয় মহোৎসব তিন দিনেই ফুরাইয়া যায়। বিজয়া বৈকালে ভক্তের চক্ষে ভগবতীর চক্ষু যেন অশ্রুপূর্ণ দেখায়। ষষ্ঠীতেও ভগবতী হাসেন না, বিজয়াতেও ভগবতী কাঁদেন না। কিন্তু মায়াময়ী পৃথিবীর এমনি খেলা, যাহা দেখিবার নয়, তাহা আমরা দেখি, যাহা দেখিবার, তাহা দেখিতে পাই না। আমাদের খেলা দেখিয়া প্রকৃতিসতী যেন নাচিয়া নাচিয়া হাস্য করেন। তুই? তুই বুঝি রাক্ষসী? তুই বুঝি মা আমারে দেখিয়া হাস্য করিতেছিস্? তোরে দেখিয়া আমার হাসি পায় না। বুঝিতে পারি, মায়া। হাসি সম্বরণ করিয়া নিশ্চলে নিঃশব্দে বসিয়া থাকি। কিন্তু মা! তোমারে আমি ভয় করি না। মায়া তুমি, তাহা জানি। তোমার সহচরী আশা, তাহাও জানি। কিন্তু আরও জানি, তুমিও চপলা, আশাও চপলা।"

মায়াকে আর আশাকে এইরূপ মন্ত্রে পূজা করিয়া আক্রমণকারীদলকে সম্বোধনপূর্ব্বক ভীম হুহুঙ্কারে দর্পভরে অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন ;—

"তোদের জীবন আজ আমার হাতে। এই দেবী চামুণ্ডা রক্তবীজ-বিনাশিনী, তোদের রক্তে আজ ইঁহার পাদপদ্ম পূজা করিব। অনেক দিন!—উঃ!—অনেক দিন এই দেবালয়ে নরবলি হয় নাই ; আমার পিতামহের পিতা,—উঃ!—সে বহুকালের কথা। আজ আমি সেই পিতৃপুরুষের কার্য্য সার্থক করিব, সজীব করিব। আয় তোরা! পবিত্র দেবালয়ে অনধিকার-প্রবেশ কত মহাপাপ, সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কত বড় কঠিন, তাহা হয় ত তোরা জানিস্ না। এই রাত্রেই আমার হস্তে এই দেবীখড়্গে সে ভয়ঙ্কর গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব জানিতে পারিবি। জানিস্ তোরা,—পূর্ণব্রহ্মাবতার রামচন্দ্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মহাবীর মেঘনাদের বনিতা সতীসাধ্বী রাক্ষসকুলকামিনী পতিব্রতা প্রমীলাসতী আপনার সহচরীকে কহিয়াছিলেন :—

'রাবণ শ্বশুর মোর মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি! ভিকারী রাঘবে ?'

তোরা জানিস্ না, পতির জন্য, পতির প্রাণের জন্য, পতিপ্রাণা সতীরা কি কার্য্য করিতে না পারে ?”

এলোকেশী খড়্গধারিণী আরক্তলোচনে মন্দিরমধ্য হইতে এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। বাহিরের অস্ত্রধারীদল তেজে দম্ভে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। প্রবেশ করিবার অবসর পাইতেছে না, কুমার ভূপেশ-চন্দ্র নিষ্কোষিত অসিহস্তে দরজার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন।

বাহিরের একজন সৈনিক পুরুষ ললাটে তরবারি স্পর্শ করিয়া অবনত-শিরে কাকুতিস্বরে কহিল, “দেবি! পথ ছাড়িয়া দাও, মন্দিরে রাজদ্রোহী, রাজাজ্ঞায় এই রাত্রে তাহার মস্তক লইয়া যাইতে হইবে। দেবি! তুমি কেন তাহাতে বাধা দাও? তোমার পায়ে আমরা ত কোন অপরাধ করি নাই। পথ ছাড়িয়া দাও, মিনতি করি, কৃপা কর, দ্বার ছাড়িয়া দাঁড়াও, বিদ্রো-হীকে আমরা বাহির করি।”

সেই ভক্তিমান সৈনিককে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া আর একজন সৈনিকপুরুষ তিরস্কার স্বরে কহিল, “কাহার উপাসনা করিতেছ? মন্দিরে যে কেহ কেন থাকুক্ না, সবলে প্রবেশ করিয়া রাজবিদ্রোহীকে আমরা ধরিবই ধরিব। বাধাদায়িনীকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে হয়, তাহাতেও অপ্রস্তুত থাকিব না।” সাহঙ্কারে এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিরাট অস্ত্রধারী পুরুষ সজোরে মন্দিরের দ্বারে এক ধাক্কা প্রদান করিল।

পশ্চাৎ হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আর একজন কহিল, “আরে কর কি! স্ত্রীজাতির গাত্রে অস্ত্রাঘাত! স্ত্রীজাতির গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিতে নাই।”

অগ্রগামী সাহসী পুরুষ ঘৃণাব্যঞ্জক বিকটস্বরে কহিল, “যদি প্রাণের ভয় থাকে, পলায়ন কর। ভাবিয়াছ বুঝি মন্দিরের পাষাণময়ীদেবী মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? পাষাণ অচল, পাষাণী অচলা। অচলা দেবী মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত নাই। অচলা

পাষাণী কখনও সচলা হইতে পারেন না। এ যে দেখি আর এক নারী। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, এ নারী একজন কুলকলঙ্কিনী কুলটা, পাপিষ্ঠ বিদ্রোহীর প্রণয়-বিমুগ্ধ নায়িকা; ইহাকে নিপাত করিতে কোন পাপ নাই, অস্ত্রঘাত করিতে হইবে কেন? ক্ষুদ্র পক্ষী, গলা টিপিলে যাহার প্রাণান্ত হয়, তাহার গাত্রে অস্ত্রাঘাত? তাহার সঙ্গে যুদ্ধ? এ বড় হাসির কথা! এই মুহূর্ত্তে আমি ইহাকে নিপাত করিয়া নীচাশয় রাজ-দ্রোহীর মস্তক ছেদন করিব।”

মুক্তকেশী খড়্গধারিণী চকিত মাত্র বিদ্যুতের মত নৃত্য করিতে করিতে বজ্র-ধ্বনির ন্যায় হুঙ্কার করিয়া কহিলেন, “দুরাত্মন্! যেখানে আছিস, সেই খানে দাঁড়াইয়া থাক্, এক পদমাত্র অগ্রসর হইলে তোর সঙ্গী লোকেরা দেখিবে,—এই কাননের বৃক্ষলতারা দেখিবে,—আকাশের গ্রহনক্ষত্রেরা দেখিবেন,—এই পাষাণময়ী চামুণ্ডাদেবী দেখিবেন,—সুপবিত্র মন্ত্রপূত এই দেবীখড়্গ দেখিবে, এই লহমায় তোর নিরয়গামী মৃতদেহ,—এই লহমায় তোর ঐ পাপ-মস্তক ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইবে। তুই জানিস্, আমি ক্ষত্রিয়কুমারী, পতিব্রতা বীরাঙ্গনা। আমার সম্মুখে আমার পতির গাত্রে করার্পণ করে, এমন সাধ্য কাহার? দেবীখড়্গ আমার হস্তে, আমি একে একে তোদের ঐ সমস্ত মুণ্ড তোদের ঐ ঘৃণিত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, রক্তজবাঞ্জলির ন্যায় মহাদেবী চামুণ্ডাদেবীর আরক্ত শ্রীপাদ-পদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিব।”

মহাশঙ্কিত ভাবে সকলেই স্তম্ভিত। বলিতে লিখিতে যতক্ষণ গেল, ঘটনা-ক্ষেত্রের কার্য্য হইতে তাহার দশাংশের একাংশ সময়ও লাগিল না। এক-দণ্ড কাল সকলে শঙ্কিত,—স্তম্ভিত।

বুদ্ধি সকলের সমান হয় না, জ্ঞান সকলের সমান হয় না, ভক্তি সকলের সমান হয় না, ভয়ও সকলের সমান হয় না। পাঁচজন বিপক্ষ বীর অপরাপর সঙ্গীগণকে উপেক্ষা করিয়া বীরদর্পে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বীরাঙ্গনার সম্মুখবর্ত্তী হইল। অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, “যাহা পারিবে না, তাহার চেষ্টা হইতে বিরত হও, পলায়ন কর, প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাও; আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার ভূপেশচন্দ্রের অঙ্গে,—উষার একটী মাত্র

কেশে হস্তার্পণ করে, আমার সাক্ষাতে এমন সাধ্য কাহারও হইবে না। প্রাণ লইয়া তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও। অনেক দিন চামুণ্ডাদেবীর আরতি হয় নাই, আগামী কল্য সন্ধ্যাকালে মহামায়ার আরতি হইবে। যিনি তোমাদের রাজা,—শান্ত হইয়া বলিতেছি, যিনি তোমাদের রাজা,—যাঁহার আদেশে তোমরা ভূপেশচন্দ্রের মস্তক লইতে আসিয়াছ, আগামী কল্য আরতির পূর্ব্বে যদি আমি তাঁহার দয়া আনাইতে না পারি,—

বৃথা নাম ধরি আমি অপ্সরাসুন্দরী।
হৃদয়ের পূজ্যধনে হৃদে পূজা করি॥

আগামী কল্য আরতির পূর্ব্বে যদি আমি তাঁহার দয়া আনাইতে না পারি, স্নান করিব না, সমস্ত দিন আহার করিব না, অবাধে তোমাদের দ্বার ছাড়িয়া দিব। যাহা ইচ্ছা তাহা করিও, আজ ফিরিয়া যাও।”

মিনতি রক্ষা হইল না। পাঁচজনের মধ্যে একজন রক্তাক্ত নয়নে অসি উত্তোলন করিয়া অপ্সরাসুন্দরীর প্রতি প্রধাবিত হইল।

“কি পাপাত্মন্! সতী আমি, বীরাঙ্গনা, পতি আমার প্রাণ, পতি আমার আশ্রয়, পতি আমার সর্ব্বস্ব;—তাও যদি না হয়, একজন অসহায় ভিকারী যদি হয়, দেবীমন্দিরে যিনি আজি রাত্রে আশ্রিত, আর আমি যেখানে উপস্থিত, সেখানে যিনি উপস্থিত, তাঁহাকে স্পর্শ করে, এমন লোক ত আমি,—এমন বীর ত আমি,—এমন শত্রু ত আমি জন্মাবধি দেখি নাই। এখনও ভাল কথায় বলিতেছি, ফিরিয়া যাও। যদিও আমি রাজকন্যা, যদিও আমি বীরেন্দ্রকন্যা, যদিও আমি ক্ষত্রিয়কন্যা, তথাপি রক্তপাত আমি কখনও দেখি নাই; যদি বাধ্য কর, আশ্রিতের জীবনের অনুরোধে আজ রাত্রে তাহাও আমাকে দেখিতে হইবে। তোমরা মূঢ়, তোমরা রূঢ়, তোমরা দস্যু, তোমরা রাক্ষস। তোমাদের শরীরে অনেক বল, তোমাদের সঙ্গে অনেক লোক, তোমাদের হস্তে অনেক অস্ত্র, মন্দির নিরাশ্রয়; কিন্তু সত্য সত্য তাহা নহে, এ মন্দির নিরাশ্রয় হয় না। আকাশে দেবদূত বিচরণ করে, মন্দিরমধ্যে দেবীমূর্ত্তি নৃত্য করেন, দ্বারে শিবদূত অষ্টপ্রহর প্রহরিতা করে, দুষ্টের প্রবেশের অধিকার নাই। যদি এই ভূপেশ-

চন্দ্র-সম্পর্কে আমার কেহই না হইতেন, কস্মিনকালেও যদি ইহাঁর সঙ্গে আমার দেখা শুনা কিম্বা জানা শুনা না থাকিত, অপরিচিত উদাসীন পথিকের মত যদি ইনি আজ রাত্রে এই মন্দিরে আশ্রয় না লইতেন, তাহা হইলেও তোমরা ইহাঁর একগাছি কেশ মাত্রও স্পর্শ করিতে পারিতে না। পাপাত্মন্! দেখিতেছ, আমার মাথায় কত চুল। তোদের পরমায়ু যদি এত চুলের সমতুল্য হয়, ভূপেশের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তথাপি তোদের নিস্তার নাই। কেন জানিস? ভূপেশ আমার প্রাণেশ্বর।"

"বাহির হইতে শব্দ আসিল, ভিতর হইতে শব্দ আসিল না। দেবালয়ের অতিথি, সর্ব্বগুরু অপেক্ষা মহাগুরু অতিথি, সাধ্য থাকে প্রবেশ কর! পুনঃপুন মিনতি বাক্যে আমার অন্তরাত্মা একটু একটু শান্ত হইতেছিল; আবার তোরা আগুন জালিয়া দিলি,—দেখিতেছি, তোদের আর রক্ষা নাই।

কে তোরা কাহার তরে কোন্ অভিলাষে?
পশেছিস্ পাপাশয় অ[illegible]নী নিবাসে?
দেখ্ দেখ্ দুরাত্মন্! দেখাব জগতে।
থাকে কি না পতিব্রতা সত্য ধর্ম্মপথে॥
এই অসি, যেই অসি, চামুণ্ডার করে
ছিল; আজি সেই অসি ধরিয়াছি করে॥
খণ্ড খণ্ড করিবারে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন!
পতি রক্ষিবার তরে মম প্রাণপণ!
এই দেখ্, আমি আছি, মুক্তকেশী আমি।
বিবাহের আগে তবু এই প্রাণস্বামী॥
যেমন স্বামীর বুকে নাচিছেন কালী!
নারী কিন্তু তবু দেখ্ নরমুণ্ডমালী॥
সেরূপে তোদের এই দর্প হবে চূর।
দূর দূর পাপাশয়! দূর দূর দূর!!"

"অকারণে জীব-হিংসা করিব না, এই আমার সংকল্প ছিল, আগামী কল্য সায়াহ্ন আরতির পূর্ব্বে পুনরায় সাক্ষাতে অঙ্গীকারবাক্য প্রদান করিয়াছিলাম, আমার অঙ্গীকারে তোদের অঙ্গীকার মিলিল না। বোধ করি, যম তোদের ডাকিতেছে, এই ক্ষত্রিয়কুমার যদিও অস্ত্রধারী, তথাপি ধিক্ ইহাকে! যদিও আমি ক্ষত্রিয়কুমারী, যদিও আমি খড়্গাধারিণী, দয়াধর্ম্মের অনুরোধে যদিও এতক্ষণ আমি তোদের ক্ষমা করিতেছি, তথাপি ধিক্ আমাকে! আর কাহাকে ধিক্কার দিব? আমার পিতৃপুরুষের কুললক্ষ্মী এই পাষাণময়ী দেবী! ইনি এখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। ধিক্ চামুণ্ডাকে! কে আছিস, আয় তোরা! কে বিশ্বাসঘাতক! আয় তোরা, যাহারা আমার বাক্যে অবিশ্বাস করে, আসুক তারা। আমার সত্য এক পাও টলে না। আমার প্রতিজ্ঞা অণুমাত্রও লঙ্ঘন হয় না। আমার জীবন কিছুতেই শঙ্কিত হয় না, আমার খড়্গা অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করে না।"

"কাহারে তোরা ভয় দেখাইতে আসিয়াছিস্? রাজকন্যা হইয়া আজ আমি কাঙ্গালিনী। কিন্তু এই কাঙ্গালিনী এখনও কাহাকেও ভয় করে না! ভবানী ভৈরবীর হস্তের এই ভৈরব খড়্গা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বৈরিকুলকে নির্ম্মূল করিতে পারে। কিন্তু ক্ষমা আমি ভালবাসি। ক্ষেমঙ্করীও ক্ষমা ভালবাসেন, এই খড়্গাও ক্ষমা ভালবাসে। আজ আমি ক্ষমার আদর করিব। সেই কারণে তোদের এতক্ষণ নিস্কৃতি। তাহা যদি না হইত;—

নিশ্বাসে নিশ্বাসে মম জ্বলিত অনল,
বরষিত সে নিশ্বাসে প্রাণান্ত গরল॥
সে বিষে জ্বলিয়া যেত তোদের হৃদয়।
করুণা ফিরিতে পারে হ'য়ে বিষময়॥
আছি আমি ভাল মেয়ে, ভাল হয়ে আছি,
যাহা দেখাইতে হয় দেখায়ে দিয়াছি॥
আর আমি পারিব না পাপিষ্ঠ পামর।
দূরে যারে দুরাত্মন্! সর্ সর্ সর্!

প্রলোভনে ভুলিবে না, প্রলোভন-দাসী
কখনো হবে না এই সতী সর্ব্বনাশী ॥
সর্ব্বনাশী আমি সতী, পতি-অনুরাগে ।
ভাসিব সাগর-নীরে মানস-বিরাগে ॥
তোরা কারা দুরাচার ! কেন এসেছিস্ ?
ভ্রূকুটী ভঙ্গীতে কেন কথা কহিছিস্ ?"

"নারীজাতির দর্প আর সহ্য হয় না।" এই কথা বলিয়া একজন বিপক্ষ-সেনা মন্দিরদ্বারে মস্তক প্রবেশিত করিল।

"এই তোর প্রায়শ্চিত্ত।" ইতি মন্ত্রে অপ্সরাসুন্দরী তাহার গ্রীবাদেশে চামুণ্ডার নামে খড়্গ প্রহার করিলেন।—মুণ্ড ছুটিয়া চামুণ্ডার পদতলে বিনিক্ষিপ্ত হইল।

"মরি ! সর্ব্বনাশি ! এতক্ষণ সহ্য করা গেল, আর সহ্য হয় না। এ রাক্ষসীকে ক্ষমা করিতে নাই।"

কেহ একটী কথারও উত্তর দিল না। যেমন পাষাণময়ী চামুণ্ডা, তেমনি তিনি পাষাণময়ী হইয়া থাকিলেন। "কিন্তু কেন মা ! পাষাণে ত জল হয়, তোমার হৃদয়ে এতক্ষণ জল আনিতে পারিলাম না কেন ? কি অপরাধ করিয়াছি মা ! কেন আমার প্রতি দয়া হয় না ?

পাষাণ-নন্দিনী তুমি চিনেছি তোমারে ।
পাষাণী হইয়া দয়া কর মা আমারে ॥
যার তরে কাঁদিতেছি জগত-জননি !
দেখাইয়া দাও তারে গণেশ জননি !
বড় দুখে কাঁদি আমি কল্যাণ-কারিণি !
নিস্তার ভব সংসারে ভব নিস্তারিণি !
জুড়ি হাত প্রণিপাত করি তব পদে ।
রক্ষা কর রক্ষাকালি ! এ ঘোর বিপদে ॥

আয় মা হৃদয়াকাশে পাষাণী ঈশানি!
জুড়াই তাপিত প্রাণ হেরি পা দুখানি॥
পান করি পদ-সুধা, ক্ষুধা মিটাইয়া।
বেঁচে থাকি মরধামে ও সুধা খাইয়া॥”

কৈ? কেহ ত কথা কহিতেছে না? তুই মা কি সত্য সত্যই পাষাণী? সন্তানের এত রোদনে তোর কি মা একটুও দয়া হয় না?

দ্বিতীয় মুণ্ড মন্দিরদ্বারে প্রবিষ্ট। দেবীদত্ত খড়্গের একাঘাতে বিচ্ছিন্ন। এইরূপে উপর্য্যুপরি পাঁচটী মুণ্ড চামুণ্ডার পদতলে সমর্পিত। এলোকেশী একটী একটী দীপ জ্বালিয়া পঞ্চদীপময়ী মহামায়ার শ্রীপাদপদ্মে সেই পঞ্চ মুণ্ডের রুধির উৎসর্গ করিয়া দিলেন। আর কেহ প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। ভূপেশচন্দ্র নির্ব্বাক্‌, কপালে ঘর্ম্ম, হৃদয়ে কম্প, সর্ব্ব শরীরে কাঁটা। খড়্গাহস্তা অপ্সরাসুন্দরী রক্তমাখা কলেবরে মন্দিরমধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাহিরে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, চীৎকারস্বরে তাহাদিগকে কহিলেন, “এখনও ক্ষমা আছে, প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। আগামী কল্য সন্ধ্যাকালে চামুণ্ডার আরতির পূর্ব্বে যদি আমি রাজ-মার্জ্জনা আনাইতে না পারি, ইচ্ছামত কার্য্য কালিই করিও। জীবন অমূল্য। কেন অকারণ বিঘোরে সেই অমূল্য জীবন হারাইবে? ফিরিয়া যাও।”

রাত্রে আর কোন উপদ্রব হইল না। কুমার ভূপেশচন্দ্র যেন অস্পন্দ পাষাণমূর্ত্তির মত একস্থানে এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘটনাচক্র দর্শন করিয়া অপ্সরার প্রতি তাঁহার দেবীভক্তির আবির্ভাব হইল।

যুগলহস্তে অপ্সরার চরণ ধারণ করিয়া ভক্তিভাবে কাতর বচনে তিনি কহিলেন, “অপ্সরা! তুমি ত অপ্সরা নও, মায়াবতী দেবকন্যা, তোমার প্রসাদে, তোমার কৃপায়, আজ আমার জীবন রক্ষা হইল।”

“এখনও হয় নাই। ভয় পাইয়া জীবন্ত বৈরিদল এখন ফিরিয়া গেল। কল্য আবার আসিবে।”

“এ রাত্রে এখন আমরা তবে কোথায় যাইব?”

“ইচ্ছা তোমার।”

"ইচ্ছা তোমার প্রাসাদে।"

"সচ্ছন্দে।"

"পথে যদি উপদ্রব হয়?"

"এ রাত্রে আর হইবে না।"

"মন্দির-দ্বার কি অনাবৃত থাকিবে?"

"সে ভার আমার।"

গুড়গুড় গর্জ্জনে মেঘ ডাকিতেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। গগন মেঘাচ্ছন্ন। কুমার ভূপেশচন্দ্র, কুমারী অপ্সরাসুন্দরী বনপথে বহির্গত। আকাশে হয় ত চন্দ্র ছিলেন; নক্ষত্রমালারা হয় ত তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া সেই চন্দ্রমুখ পানে এতক্ষণ চাহিয়া বসিয়াছিল, এখন আর দেখা যায় না। চাঁদকেও দেখা যায় না, তাঁর পত্নীদেরও আর দেখা যায় না। গাঢ় মেঘে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন।

মেঘ আছে কি? আছে, কিন্তু শাদা। যে মেঘে বৃষ্টি হয়, সে মেঘের এখন সঞ্চার নাই। নায়ক নায়িকা বনপথ ভেদ করিয়া পুরাতন রাজপ্রাসাদাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছেন। মনে মনে শঙ্কা আছে, কল্য চামুণ্ডার আরতির পূর্ব্বে যদি রাজ-ক্ষমা আকর্ষণ করা না যায়, তবে ভূপেশের প্রাণ যাইবে। যদি ভূপেশের প্রাণ যায়, অপ্সরাসুন্দরী বাঁচিবে না।

বনে চন্দ্র প্রবেশ করেন; কিন্তু পূর্ণজ্যোতি বিকাশ পায় না। একটু পাণ্ডু, একটু শুভ্র, একটু স্বর্ণ, একটু তাম্র, ক্ষণে ক্ষণে যেন ঢাকা পড়িতেছে। গাছেরা যেন লজ্জার খাতিরে পূর্ণজ্যোতিতে চাঁদকে বনে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছে। পূর্ণিমা রজনীতে চন্দ্রদেব যেন কাননে ম্রিয়মাণ।

ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে আমাদের নায়ক নায়িকা পুরাতন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

বড়মানুষ যখন দেউলে হয়, তখন তাঁহাদের প্রশস্ত অট্টালিকায় চাম্‌চিকে, বাদুড়, বিছে, আরসুল্লা আর মাকড়সারা বাসা করে। গাড়ীর ঘোড়ারা কঙ্কাল মাত্র সার হয়। জীবনবায়ু পলায়ন করে না, সেই জন্য খাড়া থাকে। দেয়ালের দেয়ালগিরির মুখে জাল পড়ে। নির্জ্জীব ছবিরা কাঁদে। সুখ পোষ্য পশুপক্ষী, দাঁড়ে, পিঞ্জরে, আপনাদের স্বরে কতই কাঁদে, কতই

শোক প্রকাশ করে। আমরা মানুষ, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহারা কথা কয়, তাহারা কাঁদে, তাহারা শোক দুঃখ জানায়। মানুষে বুঝিতে পারে না।

রাজপ্রাসাদ অন্ধকার। অন্ধকার পথে, ভ্রমর, বোল্‌তা, ভীমরুল, মৌমাছি, ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়িতেছে, আরস্থল্লা, চাম্‌চিকা, আর বাদুড়, পালকের বাতাস দিয়া, মুহুর্মুহু তাঁহাদের গতিরোধ করিতেছে, দেয়ালে দেয়ালে ঘেঁস লাগিয়া হস্তের ছাল উঠিয়া গিয়াছে, জ্বালা অবশ্যই আছে, কিন্তু সে জ্বালা তাঁহারা অনুভব করিতেছেন না। ঘরে উপস্থিত। ঘরে একটী বাতী জ্বলিতেছিল, বাতীর আলোতে অপ্সরাসুন্দরী দেখিলেন, এক খানি বৃহৎ দর্পণ, দর্পণের সম্মুখে এক বিরাট মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল, সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে দিকে তিনি চাহিলেন না। দর্পণে চাহিয়া দেখিলেন, ছায়া। মস্তকে এক পীতাম্বরী পাগ্‌ড়ি, গলায় কৃষ্ণফিতা, আজানুলম্বিত কৃষ্ণবর্ণ চোঘা, মুখ গম্ভীর। কটিতটে সুবর্ণ কোষবদ্ধ কিরীচ। বাম হস্ত শূন্য, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল। ছায়া দেখিয়া রাজকন্যার কিছু ভ্রম হইল, দাব-দগ্ধ কুরঙ্গিণীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভূপেশচন্দ্র নাই। এই না আমি তাঁহারে সঙ্গে করিয়া আনিতেছিলাম। কোথায় গেলেন?

ও কে? ও কাটা মুণ্ড কাহার? আমাকে দেখিয়া দন্ত বিকাশ করে কেন? মরা মানুষ হাসে কেন? ওঃ! আমি পাগলিনী হইলাম! চক্ষু বুজিয়া থাকি, সেই মুদ্রিত-নেত্র-সমীপে সেই কাটামুণ্ড নৃত্য করে। কোথাকার পাপ কোথায়! আমার প্রাণেশ্বর ভূপেশচন্দ্র কোথায়? মন্দিরে যে পাঁচ মুণ্ড আমি দেবী-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলাম, তাহারই কি এক মুণ্ড এই? এখনও যেন সেই মুণ্ড আমি দেখিতেছি। মুণ্ড আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে কেন? ভূপেশ! প্রাণের ভূপেশ! কোথায় তুমি? রক্ষা কর। তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য দেবী চামুণ্ডার মন্দিরে যে পাপ আমি করিয়াছি, ইহলোকে পরলোকে তাহার শাস্তি আছে, কিন্তু সে পাপ কাহার জন্য? প্রাণেশ্বর! জীব-জীব ভূপেশচন্দ্র! তোমারই জন্য। এখন তুমি কোথায়? মুণ্ড আমায় ভয় দেখায় কেন? বলিয়াছি, কল্যকার আরতি। যতক্ষণ সে সময় না আইসে, ততক্ষণ আর ভয় কি? তবে এ মুণ্ড হাস্য

করে কেন? ভয় দেখায় কেন? দন্ত বাহির করে কেন? ভয় নাই। তবে আমার অঙ্গ কাঁপে কেন? ভূপেশ! কাহার জন্য কাঁপি আমি? কাহার জন্য? খড়্গধারণ করিয়াছিলাম, কাহার জন্য? হৃদয়েশ্বর! কোথায় পলায়ন করিলে? এখনও কি তোমার প্রাণে এত ভয়? দাসী তোমারে রক্ষা করিবে। দাসী তোমার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তথাপি কি একটুও মায়া হইল না? হা বিশ্বাসঘাতক! কোথায় তুমি? জানি আমি, তুমি বিশ্বাসঘাতক, অবলাকে আশ্বাস দিয়া তুমি দেশত্যাগী হইয়াছিলে। ভুলি ভুলি করিয়া ভুলিতে পারি নাই। কেন পারি নাই? অবলাহৃদয় বিশুদ্ধ প্রণয় রাখিতে জানে, সে হৃদয়ে অকৃত্রিম প্রণয়ের স্থান হয়, অকপট ভালবাসা ধারণ হয়, সেই জন্য ভুলিতে পারি নাই। কখনও যে পারিব, এমন ত মনে হয় না। তোমাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে, কখনও ত ভাবিতে পারি না। বুক যেন শুকাইয়া যায়। প্রাণেশ্বর! কাটা মুণ্ড আবার আমাকে দাঁত দেখায় কেন? কাটা মুণ্ড আমাকে দেখিয়া হাসে কেন? মুখ ঢাকা দেয় কেন? হৃদয়েশ্বর! কোথায় তুমি?

কেহ উত্তর দিল না। অপ্সরাসুন্দরী নয়নে হস্তাবরণ করিয়া বারম্বার অশ্রুবর্ষণ করিলেন, পুনঃপুন অশ্রুবর্ষণে পদ্ম নেত্র ফুলিয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিয়া আপনা আপনি কহিলেন, আর ভালবাসিব না। যাহাকে ভালবাসিয়া আমার এত যন্ত্রণা, যাহার বিপদে আমার এতদূর দুঃসাহস, সে হৃদয়নিধি আমার কোথায় গেল? বিপক্ষপুরী মধ্যে আমারে নিক্ষেপ করিয়া সে আমার কোথায় পলায়ন করিল? জানাইয়া গেল না? তবে আর ভালবাসা কাহার জন্য?

সপ্তদশ প্রবাহ।

পিতা ও দুহিতা।

"পিতা বা যদি বা ভ্রাতা পুত্রো বা যদি বা সুহৃৎ।
প্রাণচ্ছেদ করা রাজ্ঞা হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥
ক্ষমা শত্রৌ চ মিত্রে চ যতীনামেব ভূষণম্।
অপরাধিষু সত্ত্বেষু নৃপাণাং সৈব দূষণম্ ॥"

হিতোপদেশঃ।

অপ্সরাসুন্দরীর পিতা রাজা বিরাটকেতু অবয়বে নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, স্থূলাকার নহেন, কিন্তু শরীরে বিলক্ষণ বল আছে। গাত্রমাংস কর্কশ। আকারে রাজ সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু অত্যন্ত দীর্ঘ দীর্ঘ দুটী কর্ণ আছে, গর্দ্দভ অপেক্ষাও দীর্ঘ কর্ণ, এত দীর্ঘ যে, মুখখানি যদি সুন্দর হইত, তাহা হইলেও সেই কর্ণ দেখিয়া লোকে ভয় পাইত। কৃষ্ণবর্ণ কেশ, কিন্তু বয়সের ধর্ম্মে কতকগুলি রজতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। চুলগুলি কপালের উপর খাড়া হইয়া থাকে। দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁফ দাড়ী। চক্ষু ছোট। ললাটে দীর্ঘ শিরা বহির্গত। শারীরতত্ত্ববিদেরা এই লক্ষণকে ক্রোধের লক্ষণ, এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের পরিচায়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ভালমন্দ উভয় বিষয়েই দৃঢ় সঙ্কল্প। স্বর কর্কশ ও অপ্রিয়। আলাপ পরিচয়ে সর্ব্বদাই বিভঙ্কভাব, লোকের সহিত বেশি কথা কহেন না, সর্ব্বদাই যেন সকলের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব,—চাপা চাপা। বয়স অনুমান পঞ্চান্ন বৎসর।

রাজা বিরাটকেতুর মহিষী নাই। অপ্সরাসুন্দরী মাতৃহীনা। যে সময়ের উপাখ্যান, তাহার পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে রাণীর মৃত্যু হইয়াছে। শৈশবে কৈশোরে, আর যৌবনের অঙ্কুরে অপ্সরাসুন্দরী জননী স্নেহে বঞ্চিত ছিলেন না। তাঁহার জননী পরম দয়াবতী ছিলেন। অন্তঃকরণ যেমন সরল, তেমনি

পবিত্র। পরিচিত লোক মাত্রেই তাঁহার যথোচিত সুনাম ঘোষণা করিত। রাজ্ঞী রীতিমত লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পূর্ব্বে সৌভাগ্য-শালী লোক ছিলেন, অবশেষে গ্রহ-বৈগুণ্যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। সেই কারণেই,—সেই দারিদ্র্যছলনেই এই দুঃশীল রাজা বিরাটকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ। বস্তুতঃ তাঁহার প্রকৃতি পতির প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। অপ্সরাসুন্দরীর প্রকৃতি ও শিক্ষা অবিকল জননীর অনুরূপ।

রাজা বিরাটকেতু আর অপ্সরাসুন্দরী উভয়ে একত্র হইয়া একটী নিভৃত-কক্ষে বসিয়া আছেন। পূর্ব্বে কি কি কথা হইয়াছিল, শ্রবণ করিবার অবসর হয় নাই, এক্ষণে রাজা কহিলেন, "অপ্সরা! তুমি ঐ দুষ্ট ভূপেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর কেন? তোমারই প্রশ্রয়ে ঐ নরাধম দিন দিন প্রশ্রয় পাইয়া উঠিতেছে। সত্যই কি তুমি ঐ শৃগালের প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়াছ?"

"পিতা! পিতা! তুমি কি বলিতেছ? ভূপেশের সঙ্গে বালিকা কালাবধি আমার ভালবাসা। পিতা! তা কি তুমি জান না?"

"ভুলিয়া যা। সে দুষ্ট বিশ্বাসঘাতকের সহিত আমি আর কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না।"

"কর না? কেন না? ভূপেশচন্দ্র নির্দ্দোষ, নিষ্কলুষ, তাঁহার শরীরে যেমন পাপ নাই, তেমনি মনেও কোন পাপ নাই। ভালবাসিয়াছি, অন্তরে অন্তরে ভালবাসিয়াছি, ভুলিতে পারিব না।"

"ভুলিতে পারিবি না? কিন্তু কাহাকে? দস্যুকে? পথের ভিকারীকে? বৎসে! অপ্সরা! তুই জানিস, তুই জানিস কে তুই?"

"আমি রাজকুমারী।"

"হাঁ! তুই রাজকুমারী। রাজকুমারী কি কখনও সামান্য পশুপুত্রকে বরণ করে?"

"পিতা! অপরাধ ক্ষমা কর। সেই ভূপেশচন্দ্র ছাড়া অপর কাহাকেও আমি প্রণয় দান করিতে পারিব না।"

"বিরাটস্বরে বিরাটকেতু কহিলেন, "রাজকন্যার এত জঘন্য প্রতিজ্ঞা? আচ্ছা! থাক তুই, থাক্ তুই, পাপীয়সি! নিষ্কলঙ্ক রাজকুলে কলঙ্ক দিলি? থাক্ তুই কুল-কলঙ্কিনি!"

"পিতা! বৃথা তিরস্কার! আমি কলঙ্কিনী নই, কুমারী কলঙ্কিনী কোন দেশে থাকিতে পারে থাকুক, কিন্তু আমি ধর্ম্মের পন্থা ভাল জানি।"

"জানিস? তবে কাফ্রি-সন্তানকে—"

"কি বলিতেছিলে পিতা! কাফ্রিসন্তানকে আমি ভালবাসি? তোমার সাক্ষাতে আমি বলিয়াছিলাম, ভূপেশ আমার হৃদয় চুরি করিয়াছে। দুষ্ট সংশয়ী চোরকে শাস্তি দিতে নাই। তবে যদি তুমি মনের কথা মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর কর, কাফ্রিসন্তানকে কি আমি ভালবাসি?"

বিরাটকেতু কহিলেন, "অপ্সরা! আর আমাকে অন্ধকারে রাখিও না। মনের ভাব,—মনের নিগূঢ় ভাব পরিস্ফুট বাক্যে প্রকাশ কর।"

"পিতা!"—বিমল স্বভাব আর সরল পবিত্রতার মধুময় স্বরে অপ্সরা-সুন্দরী কহিলেন, "পিতা! লহমার নিমিত্তও আমি তোমার কাছে সত্য গোপন করিব না। আমার হৃদয় সজীব জাগ্রত। এ হৃদয়ে চাতুরী স্থান পায় না,—ছলনা অথবা কপটতা এ হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও অন্বেষণ করে না। আমি ভূপেশচন্দ্রকে মনে মনে ভালবাসি; অন্তরে অন্তরে ভূপেশ-চন্দ্রের শুভকামনা করি; আমার অন্তরাত্মা সর্ব্বান্তঃকরণে ভূপেশচন্দ্রকে ভালবাসে। সে আত্মা এ জীবনে আর অপর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে না। আর ইহাও সত্য, আমি সেই ভূপেশচন্দ্রের হস্তে জীবনের সমস্ত বিশ্বাস সমর্পণ করিয়াছি। মন একটী ধন; সেই মনধনের আর এক ধন পরম বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস আমার ভূপেশচন্দ্রের হস্তে।"

"ওঃ! যে ভয় করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে! বিষধরি! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি!"—ভীষণ ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিয়া বিরাটকেতু কহি-লেন, "বিষধরি! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি।" সরোষে এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া স্বেচ্ছাচারী রাজা তৎক্ষণাৎ মনে মনে সংকল্প করিলেন, ক্রোধের কার্য্য নয়, কৌশলের কার্য্য। কৌশলে এই সাপিনীকে বশীভূত করিয়া রাখিতে হইবে। সংকল্প স্থির করিয়া বিরাট অপেক্ষা লঘুতর বিরাটস্বরে বিরাটকেতু কহিলেন, "অপ্সরা! তোর উপর আমার যত স্নেহ, তাহার কি এই বিনিময়? মা! তোর মুখে কি আমি ঐ কথা প্রত্যাশা করিয়া-ছিলাম? কন্যা হইয়া কাল-ভুজঙ্গিনীরূপে তুই পিতার মস্তকে দংশন

করিলি ? মা ! জন্মাবধি কখন ত তুই প্রতারণা জানিস্ না ? তবে এ প্রতারণা কে শিক্ষা দিল ? কি নিমিত্ত এই প্রবঞ্চনার সৃষ্টি ? আমি কি তোর পিতা নই ? পিতার মায়া, পিতার মমতা, পিতার স্নেহ অক্ষরে অক্ষরে দেখাইয়া দিতে কখন কি আমি ত্রুটি করিয়াছি ?"

"না।—জগৎ পিতা সাক্ষী, এই অপ্সরা-সুন্দরী,—এই অভাগিনী অপ্সরা সুন্দরী তোমার চরণের চির বশীভূত কিঙ্করী, অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, পিতৃবৎসলা কুমারী।" কথা বলিতে বলিতে কমলনেত্রপুট হইতে দর দর অশ্রুধারা কমল কপোলে প্রবাহিত হইল। সরোদনে আবার কহিলেন, "পিতা ! জান তুমি, হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করা অসাধ্য, অসম্ভব। পিতা ! জগৎসাক্ষী, এই মানব-ধামে কোন মানব, কোন মানবীর সে ক্ষমতা নাই,—"

"নাই সত্য, কিন্তু আছে, ইহাও সত্য। তোমার মত বুদ্ধিমতী বালিকার পক্ষে সহসা কোন দুরূহব্রতে প্রতিজ্ঞা করা বড় নিন্দার কথা। যেখানে বুদ্ধি আছে, সেই খানেই জ্ঞান আছে, মনে মধ্যে মধ্যে ভালমন্দ দুই ভাবেরই আবির্ভাব হয়। যাহাদের জ্ঞান আছে, তাহারা ভালমন্দ বাছিয়া লইয়া একের আদর অপরের দমন করিয়া থাকে। অপ্সরা ! তোমার শরীরে যৌবনের অঙ্কুর। নির্দোষ দেহলতায় নবযৌবন পল্লবিত। এ অবস্থায় তুমি তোমার দুষ্প্রবৃত্তি দোষের খণ্ডন করিতে পার না ?"

"পারি কি না পারি, বিচারে তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব না। সে পন্থা আমি অন্বেষণ করি না। গোপনে ভূপেশচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাহিণীতটে আমি সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করি, এ কথা আমি অস্বীকার করিব না। সে সাক্ষাতে দোষ আছে, তাহাও অস্বীকার করি না। কিন্তু পিতা ! আমি জানিতাম,—হায় ! আমি জানিতাম, কিসে কি হয়। আমি ভালরূপেই জানিতাম, ভূপেশচন্দ্র তোমার অপ্রিয়। আমি ভূপেশচন্দ্রকে ভালবাসি, তুমি সেই ভালবাসায় সম্মতি দিবে, তোমার নিকট আমি সেই সম্মতি প্রার্থনা করিব, বৃথা আশা। আশা-চপলা। ক্ষণ কালের জন্যও স্থির নয়। কিন্তু আশাকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তথাপি সর্ব্ব-

দাই,—সর্ব্বদাই, আমি মনে করিতাম, তোমার চরণে নিপতিত হইয়া আমাদের নবীন-প্রণয়ের সম্মতি ভিক্ষা করিব। যাহাতে এই অভাগিনী সুখে থাকে, তুমি পিতা,—স্নেহময় পিতা, আমি জানি, অবশ্যই সে আকিঞ্চন তোমার। মিনতি করি, সম্মতি প্রদান কর।"

"অপ্সরা!"

পিতা!"

"অপ্সরা! তুই কি মা পাগলিনী হলি? ক্রমশই আমার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে, স্নেহ-পুতলী তুই, তুই ভিন্ন সংসারে আর আমার আমার বলিবার কেহ নাই। তুই কি মা আমাকে ক্ষেপাইয়া তুলিলি? তুই কি মা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, আমার দুশ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সেই নীচাশয় অধমসন্তানের সহিত দেশান্তরে পলায়ন করিবি?"

"পিতা!" অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতার মুখপানে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "পিতা! ভূপেশচন্দ্রকে তুমি ভাল জান; শৈশব কালাবধি ভূপেশ তোমার স্নেহের পরিচিত। আর ইহাও তুমি জান, ভূপেশের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তাহার প্রকৃতি অতি সৎ। একটা ছোট কথায় বলি, ভূপেশচন্দ্র সিংহ,—জগতের সমস্ত যুবা-পুরুষের আদর্শ।"

"অপ্সরা!" স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ স্বরকে আরও কর্কশ করিয়া তুলিয়া বিরাটকেতু কহিলেন, "অপ্সরা! উপন্যাস পুস্তকের পত্রে পত্রে, আর কল্পিত নায়কের চঞ্চল রসনায় ও সকল কথা অতি উত্তম মানায়। কিন্তু বৎসে! আমরা বিশ্ব-কর্ত্তার বিশ্ব সৃষ্টির যথার্থ মানুষ; আমাদের সাংসারিক ঘটনা যথার্থই প্রকৃত ঘটনা। তোমাকে যাহা আমি বলিতেছি, তাহা সমস্তই তুমি জান! সেই দরিদ্র, নিঃসম্বল, উদাসীন, শ্রম জীবীর সহিত পলায়ন করিবার ইচ্ছা, শুদ্ধ পাগলের ইচ্ছার তুল্য। আর ইহাও তুমি শুনিয়াছ, সে লোক এখন নিষ্কর্ম্মা।"

"কেন পিতা! আমার ভূপেশচন্দ্র নিষ্কর্ম্মা কেন?"

"কেন? দুষ্ট বালিকে! তুই আমার ধৈর্য্য হরণ করিতেছিস্। স্থির ভাবে আমি তোরে সৎপথ বুঝাইতেছিলাম, তুই আমাকে ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিস্। ক্রোধ বাড়াইয়া দিতেছিস্। সুপন্থা ক্রমশঃ কুপন্থা হইয়া দাড়াইতেছে।

ভূপেশ কিজন্য নিষ্কর্ম্মা, তাহা আমি বুঝাইতে জানি না। রাজার আদেশ, তাহার উপর তর্ক বিতর্ক চলে না। অপ্সরা! আর একবার তোরে আমি বলি, উন্মাদিনী হইয়া আমার গৃহধর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। অর্থ-শূন্য উদাসীনের মায়া পরিত্যাগ কর। আমি তোমার পিতা, তুমি চিরজীবন সুখে থাক, ইহাই আমার বাসনা। তুমি আমার কন্যা; এই মানগর্ব্বে আমি গর্ব্বিত। তোমার জন্য আমাকে যাহাতে জন-সমাজে লজ্জা পাইতে হয়, তেমন কার্য্য করিও না।"

"না পিতা! না,—কখনই না।" এই ছোট ছোট কটী কথা বলিয়া অপ্সরাসুন্দরী নিস্তব্ধ হইলেন। এক প্রকার আকস্মিক ক্রোধে তাঁহার সুন্দর কপোল যুগল আলোহিত বর্ণে সুরঞ্জিত হইল।

সেই ভাব দর্শন করিয়া বিরাটকেতু কহিলেন, "অপ্সরা! তুমি কি আমার কথা বুঝিলে না? তুমি নিষ্কলঙ্ক। তোমাব আত্মা নিষ্পাপ। পলকের জন্যও তাহাতে আমি সন্দেহ করি না। তাহার সাক্ষী এই,—তুমি না,—সেই দুরাচার ভূপেশসিংহ, ধূর্ত্ত শৃগালের মত ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিয়া তোমার অনুরাগ চুরী করিতেছে।"

"পিতা! মিনতি কবি, ভূপেশের চবিত্রে অপবাদ দিও না। স্বার্থ-পরতা, বিশ্বাসঘাতকতা কাহাকে বলে, ভূপেশ তাহা স্বপ্নেও জানে না, কল্পনাপথেও আনে না।" শেষ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সেই সরলা বালার অকলঙ্ক গণ্ডস্থলে আলোহিত আভা বিকাশ পাইল।

"ওঃ! তাহার সরলতা ও সম্ভ্রমের উত্তম পরিচয় পাওয়া গেল! সুন্দর! সুন্দর! অতি সুন্দর নিদর্শন!! প্রলোভন দেখাইয়া, নির্জ্জন প্রদেশে সাক্ষাৎ করা, আর পিতার স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া, স্নেহময়ী কুমারীকে পিতার অবাধ্য করিয়া লইয়া যাওয়া, এমন সাধুতার উদাহরণ সংসারে আর কত আছে? অপ্সরা! আমি অনেক সহ্য করিতে জানি, এখনও আমি তোরে তিরস্কার করিতেছি না; মনে কর অপ্সরা! অনেক দিনের কথা, স্থির হইয়া স্মরণ কর, তোমার গর্ভ-ধারিণী সেই দয়াময়ী স্বর্গীয়া মহিষী এক মহা সম্ভ্রান্তবংশের অলঙ্কার ছিলেন; পুণ্য-সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। তাঁহার গুণ,—তাঁহার দয়া, তাঁহার শিক্ষা, যদিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে,

কিন্তু তিনি এতদূর স্বার্থপরায়ণা ছিলেন না, যে, সমস্তই নিজে লইয়া যাইবেন; সংসারে সে গুণাবলীর কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইবেন না। অপ্সরা! মা! বৎসে! এই দেখ আমার চক্ষু, এ চক্ষু চকমকি, আঘাত করিলেই আগুন হয়, এ চক্ষে কখনও জল আসে না; কিন্তু এই দেখ মা! আজ আমার চক্ষে জল আসিতেছে। তোমাতে আমি তাঁহার ছায়া দেখি, তুমি তাঁহার সমস্ত সদ্গুণাবলীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তুমি সৎপাত্রে দত্তা হও, পুণ্যবতী রাণী জীবিতাবস্থায় পবিত্র হৃদয়ে সর্ব্বদাই সেই অভিলাষ ধারণ করিতেন, পোষণ করিতেন। মৃত্যুকালেও তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, আমার অপ্সরা যেন সৎপাত্রে সমর্পিতা হয়। মা! অপ্সরা! তুই মা কি সেই স্বর্গীয় রাণীর অন্যথা করিবি? রাখালের হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়া তুই কি মা আমার বংশকে কলঙ্কিত করিবি? আমি তোর পিতা, উপর দিকে চাহিয়া দেখ, নীচে, পদতলে নয়ন নিক্ষেপ করিতে নাই। যদি সেই ঘৃণিত শৃগাল তোর এই পবিত্র হস্ত স্পর্শ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি পাগল হইয়া যাইব। নীচে না চাহিয়া উপর দিকে চাও; নিজ বংশের অপমান করিয়া যে সুন্দরী যুবতী আপন অপেক্ষা নীচপাত্রে ইচ্ছা করিয়া পাণিদান করে, তাহার তুল্য দুর্ভাগ্যবতী ধরাধামে আর দ্বিতীয় নাই। অপ্সরা! মা আমার! কথা রাখ। এখনও আমার আশা আছে। সে আশা ফলবতী হইবে, তোমা হইতে। সে আশালতা ফলশূন্য হইয়া শুকাইয়া যাইবে, সে কেবল তোমা হইতে। কিন্তু দেখিস্ মা! শেষের কথা যেন সার্থক না হয়। আশা আমার হৃদয়ে আছে, হৃদয়েই থাকুক; সফল হইবার হয়, হৃদয়েই ফল ফলুক্। আশাকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আশা এত অস্থির কেন? ভাবিয়া ভাবিয়া,—মনে মনে অনেক আলোচনা করিয়া কখনই আমি মীমাংসা করিতে পারিলাম না, আশা কেন অস্থিরা? থাকিয়া থাকিয়া কর্ণে একটী শব্দ প্রবেশ করে,—আশা চপলা।"

"ঠিক তাই। আশা আমার মানসে কখন আসে, কখন খেলা করে, কখন যায়, ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারি না। পিতা! আমি তোমার সকল কথাই শুনিয়াছি, সকল কথাই শুনিলাম। কিন্তু আশাকে বিদায় করিতে পারিলাম না। আজ আমার হৃদয় কেন এত ভারী? কি দুঃখে? আমার মনে ত কোন

দুঃখ নাই। তবে আমি আজ আপনাকে কেন ভুলিয়া যাই? পিতা তোমার অভাগিনী দুহিতাকে ক্ষমা কর। পাপপথে যাইতেছে না, সত্য পথে যাই-তেছে। সংসারী লোককে সংসার যাহা শিক্ষা দেয়, আমি সে শিক্ষার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি না।”

অপ্সরাসুন্দরী এই কথাগুলি বলিলেন বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে হাসির কথা,—পিতার একটিও কথা তিনি শুনেন নাই। অতি দুঃখে লোকে কালা হয়; অতি শোকে লোকে কালা হয়; অতি আহ্লাদে লোকে কানা হয়। এখানে অপ্সরা-সুন্দরী অতি দুঃখে,—অতি নৈরাশ্যে কালা। সেই দুঃখে পিতার একটীও কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

মতিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মতিয়া এক দরিদ্র কৃষকের কন্যা। আশৈশব অপ্সরার প্রিয় পরিচারিকা। তাহাকে দেখিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, “মতিয়া! মতিয়া! আমায় ধর। মায়াবিনী মূর্চ্ছা যেন আমারে গ্রাস করিতে আসিতেছে। গৃহে লইয়া চল। পিতা! এ অভা-গিনী চরণে বিদায় হইল। নিত্য প্রণাম না করিয়া কখনও আমি শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করি নাই, কিন্তু আজ তাহা পারিলাম না। ক্ষমা ভিক্ষা!”

মতিয়ার হস্ত ধারণ করিয়া যেন চৈতন্যবিহীনা প্রতিমার ন্যায় অপ্সরা-সুন্দরী আপনার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। স্তম্ভিত, অন্যমনস্ক ভাবে রাজা বিরাটকেতু কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা-কক্ষে প্রতীক্ষা করিয়া চঞ্চল ভাবে, চঞ্চল মানসে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া অপ্সরা একখানি ক্ষুদ্র কৌচের উপর শয়ন করিলেন। উভয় নেত্রে উভয় হস্ত আবরণ। নেত্রে যেন বন্যাপ্রবাহ। যতক্ষণ চক্ষে জল থাকে না, শোকদুঃখের বেগ ততক্ষণ কিছু বেশী হয়; শোকদুঃখের পরিমাণমত অশ্রু বৃষ্টি হইলে স্বভাবতই দুঃখবেগ লঘু হইয়া আইসে। অপ্সরার অশ্রুপাতে, অপ্সরার নৈরাশ্যদুঃখের অনেক লাঘব হইল। মতিয়া একবার বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—“রাজা অপেক্ষা করিতেছেন, আহারের আয়োজন হইয়াছে।”

নেত্র-মার্জ্জন করিয়া অপ্সরা কহিলেন, “মতিয়া! পিতার চরণে যদি আমার অচলা মতি না থাকিত, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে আমি বলিতাম,

আহারে আমার রুচি নাই। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিতেছেন, আহ্বান করিতেছেন, চল।"

বসনাঞ্চলে পুনরায় পরিশুষ্করূপে নয়ন মার্জ্জন করিয়া, যত দূর সম্ভব, তত দূর মনোবেগ সম্বরণ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী উঠিয়া বসিলেন। রোদন করিয়াছিলেন, পিতা তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে না পান, কিম্বা জানিতে না পারেন, সেই ভাবে সাবধান হইয়া মতিয়ার সহিত ভোজনগৃহে উপস্থিত।

অন্ধকার হইয়াছে। যে রঙ্গভূমে সূর্য্যদেব অভিনয় করেন, সে রঙ্গভূমের যবনিকা পতন হইয়াছে। আকাশে আলো জ্বালিয়া ছোট ছোট নক্ষত্রেরা সূর্য্যকে অন্বেষণ করিতেছে। কিন্তু কেন গা? সূর্য্য তাহাদের কে? নক্ষত্রেরা সূর্য্য অন্বেষণ করে কেন? নক্ষত্রেরা তারা। শশাঙ্ক সুধাকর তারানাথ। তারাদল তারানাথকে অন্বেষণ করে; ইহাই ত স্বভাব। সূর্য্যে তাহাদের কি প্রয়োজন? ভয়। প্রভাতে সূর্য্যদেব উদয় হইয়া অন্ধকারের সহিত দীপ্তিশালিনী তারামালাকে দূর করিয়া দেন। পাছে আবার আসেন, সেই আশঙ্কায় গগনাঙ্গনারা সহস্র সহস্র চক্ষু খুলিয়া, সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়া অস্তগত প্রভাকরের উদ্দেশে সভয়ে দশদিক নিরীক্ষণ করিতেছে। দেখিতে পাইল না, সাহস হইল, ক্ষুদ্র দীপ্তি ক্রমশই সমুজ্জ্বল।

ভোজনগৃহে বিরাটকেতু আর অপ্সরাসুন্দরী। পার্শ্বদেশে মতিয়া। রাজা বিরাটকেতু অন্যমনস্ক ছিলেন, অন্যমনস্কেই যথাসম্ভব আহার করিলেন। ক্ষুধা দমন করিতে তিনি জানিতেন না, কিন্তু অপ্সরা সুন্দরী জানিতেন। তিনি সেই সকল উপাদেয় আহার্য্য বস্তুর কণামাত্রও স্পর্শ করিলেন না।

"এখন আমাদের আবশ্যক"———মতিয়া সত্বর হস্তে ভোজনপাত্র সরাইয়া লইলে রাজা বিরাটকেতু নয়ন মুদ্রিত করিয়া ব্যগ্র স্বরে কহিলেন, "অপ্সরা! এখন আমাদের আবশ্যক, পুরাতন কথার আলোচনা।"

"অনুমতি কর।"

"যদি তোমার অপ্রিয় বোধ হয়?"

"সংসারে আমার অপ্রিয় বস্তু যাহা, তাহা আমি জানি, আমার অন্তরাত্মা জানেন, আরও বোধ করি, পিতা! তুমিও তাহা জানিতে পার।"

"বুঝিয়াছি। কিন্তু অপ্সরা! আশা এখনও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই।"

"সত্য। স্নেহময় পিতা! আশা পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই, সত্য!" অতি সংক্ষেপে শীঘ্র শীঘ্র এই কটি কথা বলিয়া নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পবিত্র কুমারী সসংশয় কৌতূহলে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। আর বাক্য স্ফুর্ত্তি হইল না। রাজা কহিলেন, "বৎসে! যে সকল কথা আমি মনে করিয়া রাখিয়াছি, আবশ্যক আসিয়াছে, প্রয়োজন আসিয়াছে, সময় আসিয়াছে, সেই কথাগুলি এখন আমি তোমারে বুঝাইয়া দিব। স্থির হইয়া মনোযোগ দিয়া শুন। তোমার গর্ভধারিণী যাহা তোমাকে শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সে শিক্ষার নিমিত্ত তুমি তাঁহার কাছে ঋণী আছ। দেশের অন্য কোন বালিকা বোধ করি সে শিক্ষার অধিকারিণী হইতে পারে না। প্রকৃতি সতী তোমার মাথার উপর নৃত্য করেন, তুমিও প্রকৃতির আদর কর,—আদর জান। কিন্তু প্রাণাধিকে! নীচ সংসর্গে তোমার অমল চিত্ত অত চঞ্চল ভাবে টলিয়া পড়ে কেন? তোমার একটী অধিকার আছে। তোমার দুটী চক্ষু আছে, সে অধিকার আর সে চক্ষু ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে পারে, আমি সেই আশা করি।"

"আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না পিতা!" কম্পান্বিত কলেবরে সচকিত হইয়া অপ্সরা-সুন্দরী কহিলেন, "আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না পিতা!" কেন যে তিনি এ কথা বলিলেন, তাহার একটী সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আছে। তিনি ভাবিলেন, হয় ত ভূপেশ ছাড়া অপর কোন পাত্রের হস্তে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিদান করিতে চাহেন। এই ভাবনায় তিনি আর বিবেচনা করিলেন না। দেহ কাঁপিতে লাগিল, মন কাঁপিতে লাগিল,—হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। মৃদুস্বরে কহিলেন, "তবে আমি অপর পাত্রে অর্পিতা হই, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা?"

"আমি তাহাই ইচ্ছা করি!" স্নেহপূর্ণ গম্ভীর স্বরে বিরাটকেতু কহিলেন, "আমি তাহাই ইচ্ছা করি। মান্য বংশের অন্যান্য যুবতী কুমারীরা

যেরূপ মনোমত পতি নির্ব্বাচনে সংসারে সুখী হয়, তুমি তাহাই হও। আমি তোমার নিমিত্ত একটী সুপাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছি; রং বাছিয়া তাস খেলা কর। বুঝিয়াছ ?”

“না পিতা! বুঝিতে পারিলাম না।”

পিতার রসনা হইতে এমন অদ্ভুত অভিনব বাক্য বিনির্গত হইবে, অপ্সরাসুন্দরী তাহা জানিতেন। যাহা শুনিলেন, তাহা বুঝিলেন, তথাপি কহিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

“তবে আরও স্পষ্ট করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতে হইল। তুমি কি এক জন অভাগা মজুরের পত্নী হইয়া ভিকারী-কুটীরে বাস করিতে ভালবাস, কিম্বা এক জন মাননীয় ধনবান বংশের সুরূপ যুবাপুরুষকে অঙ্গীকার করিয়া রাজরাণীর মত রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর? তোমার মুখে এই ক্ষুদ্র উত্তর আমি শুনিতে চাই।”

যে অন্তরে প্রেম প্রবেশ করিয়াছে, যে পবিত্র হৃদয় প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়াছে, সে অন্তর, সে হৃদয় অন্য দিকে হেলে না। পিতার দুটী কথা। অভাগা মজুর, আর ঐশ্বর্য্যশালী যুবা। প্রথমে মন টানে, প্রণয়ের আকর্ষণ বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেমভাব; সে ভাব হইতে বিচলিত হওয়া প্রেমিক মাত্রেরই অসম্ভব। সত্য বটে তাহাই, কিন্তু অপ্সরাসুন্দরী পিতার প্রশ্নে উত্তর করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ কি একপ্রকার আশ্চর্য্য বিচিত্র ভাব তাঁহার অন্তঃকরণকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। তিনি যেন নক্ষত্রের আলোতে জগৎসংসারকে চক্রে চক্রে ঘূর্ণায়মান দেখিতে লাগিলেন।

“অপ্সরা! তুমি আমার প্রাণাধিকা বুদ্ধিমতী কুমারী। কিন্তু শোন মা! দেখ মা! বারম্বার তোমার উদাসবাক্য শুনিয়া শুনিয়া আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি কি ইচ্ছা কর? আমি আরও স্পষ্ট করিয়া কথা কহিব? আচ্ছা, তাহাই স্বীকার, একটী ক্ষুদ্র বাক্য। আমার বাসনা, তুমি রাজরাণী হও; রাজপুত্রকে বিবাহ কর। তাহা হইলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। পিতাকে আর যন্ত্রণা দিও না।”

সেইরূপ উদাস নয়নে অপ্সরা তখনও পর্য্যন্ত পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। সংশয় বলবান হইল। ভাবিলেন, যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন,

মনের কল্পনা একবার ভাসিতেছে, একবার ডুবিতেছে। হৃদয়াকাশে মেঘের উদয়। গণ্ডবর্ণ পরিবর্ত্তিত। কোন কারণ নাই, অথচ মনে যেন আকস্মিক ভয়। সেই ভয় দূরে দূরে,—নিকটে নিকটে যেন আরও ভয় দেখাইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। মুখে বাক্য নাই।

বিরাটকেতু কহিলেন, "অপ্সরা! তুমি কি মা আমার কথা বুঝিবে না?" প্রশ্নের সঙ্গে ক্রোধ জাজ্বল্যমান। সেই ক্রোধে রাজা বিরাটকেতু পুনরায় কহিলেন, "যথেষ্ট! যথেষ্ট!! যদি সেই অকর্ম্মণ্য কাপুরুষের প্রতি তোমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুরাগ অর্পিত হইয়া থাকে, কি প্রকারে সেই চিন্তা ও সেই অনুরাগকে দূরে তাড়াইয়া দিতে হয়, তাহা আমি জানি। যদি না জানি, জানিবার জন্য চেষ্টা করিব। এদেশে সে আর কোন কর্ম্ম পাইবে না। সম্বল-শূন্য হইয়া শীঘ্রই তাহাকে এ দেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

"আর না!—পিতা! আর না! আর আমি শুনিতে পারি না, আর আমি সহিতে পারি না।" চঞ্চলভাবে এই কথা বলিতে বলিতে অপ্সরাসুন্দরী শশবাস্তে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া চঞ্চল নয়নে পিতার নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া সগর্ব্বস্বরে কহিলেন, "পিতা! আমার অন্তঃকরণ যদি অপর কাহাকেও ভালবাসিয়া না থাকে, তথাপি তোমার কল্পনায় আমি সম্মত হইতে পারিব না। না,—আমি না,—কখনই আমি পারিব না।"

"কিন্তু আমি বলিতেছি, তুমি পারিবে।" ভীষণ রোষপূর্ণ স্বরে বিরাটকেতু আদেশ করিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি, তুমি পারিবে। অবোধ অবাধ্য পাগলিনী বালিকা! পিতার কথা অগ্রাহ্য কর! কোথায় শিখিয়াছ? কে শিখাইয়া দিয়াছে? অপ্সরা! মনে করিতেও ভয় হয়, মনে করিলেও যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; আমার জীবনের একমাত্র আশা-যষ্টি! তুই কি মা আমারে জন্মের মত বর্জ্জন করিয়া এক উদাসীনের সঙ্গে পলায়ন করিবি? না!—তাহা ত হইবে না। হইতে ত দিব না! মহারাজ রঘুবর রাওয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গ-ভূষণ;—তাহারই সঙ্গে—"

"হাঁ পিতা! অতি উত্তম! স্বর্গ-ভূষণ রাও যথার্থই অপ্সরাসুন্দরীর যোগ্য পতিই বটে!"

তাচ্ছিল্যভাবে পিতৃবাক্যে এইমাত্র উত্তর দিয়া আমাদের স্নেহময়ী নায়িকা একটী প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা-হস্তে দ্রুতপদে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

অষ্টাদশ প্রবাহ।

সেনা-ধরা

"Softly, softly, you must not address me in this language It is full of menaces and breaches of discipline."

Reynolds.

পাঁচ সহস্র আটশত অষ্টাশীতি বর্ষ আমাদের পৃথিবীর বয়স নয়। আমাদের প্রকৃতি সতী অত অল্প দিনের ছোট মেয়ে নন। য়িহুদি-নিবাস যুদিয়ার ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশুখ্রীষ্টের আমরা শিষ্য নহি। আমাদের প্রকৃতি বহু প্রাচীনা, আমাদের পৃথিবী বহু প্রাচীনা। আমরা বহু প্রাচীনা প্রকৃতি সতীর সন্তান। কোথায় এখন কোন্ দেশে আসিয়া পড়িয়াছি, স্মরণ হয় না। উষাকালে আর সন্ধ্যাকালে, স্তিমিত অন্ধকারে যেমন একটু একটু আলো থাকে, তেমনি স্তিমিত আলো আজ আমার নয়ন-সমীপে সুপ্রকাশ। এ কি মরুভূমি? না তো, মরুভূমি হইলে বৃক্ষ থাকিবে কেন? কল্লোলিনী প্রবাহিণী স্রোতস্বতী নদী থাকিবে কেন? তবে এ কি বনভূমি? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? বনে লোকালয় থাকে না। এখানে দেখিতেছি লোকালয়। গৃহস্থ-লোকালয় কোথায়? এ যে পান্থনিবাস! এখানে কাহারা থাকে?

প্রবেশ করিলাম। কথায় কথায় জানিলাম, একজন ক্ষৌরকার প্রামাণিক এই নিবাসের অধিকারী। তাহার নাম বিতাস্থ। রাজসাহায্যে এই নিবাস প্রতিষ্ঠিত। লোকেরা আসিয়া এই নিবাসে কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন

করিয়া যায়, তাহারই বেতনে নিবাস চলে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, যুদিয়ার ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশুখ্রীষ্টের চেলা আমরা নই। তিনি মহামনা মহাত্মা মানব হইতে পারেন,—সুসমাচার প্রমাণে অচিন্ত্য অব্যক্ত নির্গুণ গুণময় বিশ্বপিতার স্নেহাস্পদ পুত্র হইতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের নবদ্বীপের চৈতন্য অপেক্ষা অনেক ছোট। বয়সে তিনি চৈতন্য অপেক্ষা বড় হইতে পারেন, কিন্তু কত বড়? তাঁহার জীবনপ্রদীপ ১৮৮৪ বর্ষ পূর্ব্বে প্রজ্জ্বলিত হইযাছিল। দেশের দুর্ভাগ্য, সে পবিত্র আত্মা, সে পবিত্র আত্মানল শীঘ্রই অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল! খ্রীষ্টাব্দ যখন ১৪৮৫, সেই সময় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব।—তাঁহার জন্মের কত পরে, কত পুরুষ অন্তরে আমরা ইহ সংসার-রঙ্গভূমে প্রবেশ করিয়াছি, মনে হয় না। কিন্তু সব কথা মনে আছে। প্রাচীনা প্রকৃতি একদিনের জন্যও আমাদের বঞ্চনা করেন না। সে কালে আমাদের দেশে ছেলেধরার ভয় ছিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়ো ধরা ছিল, উড্রোসাহেবের আমলে গুরুধরার ভয় হইযাছিল। দুরন্ত নিষ্ঠুর ব্যবসায়ী ফিরিঙ্গী দলের কৃষিক্ষেত্রে কুলিধরার ভয় হইয়াছে! কিন্তু এই এক অপূর্ব্ব অভাবনীয় নূতন ধরণের ছেলেধরা;—সেনা-ধরা!

পান্থ-নিবাসে অনেক লোক আসিতেছে, যাইতেছে। আমাদের অভাগা ভূপেশচন্দ্র এক কোণে বসিয়া আছেন। উৎসাহ গিয়াছে,—সম্বল গিয়াছে,—মান-সম্ভ্রম, আশা-ভরসা সমস্তই ফুরাইয়াছে। নিরাশ্রয়! এখন তিনি পান্থশালায় অতিথি। সেই অতিথিশালায় যথাকথঞ্চিৎ আহার করেন, অতিথিশালায় নিশাযাপন করেন, সারা নিশা জাগরণ করেন, মনে জাগে অপ্সরাসুন্দরী। দেশ হইতে নির্বাসিত হইবার আদেশ। কিন্তু সে আদেশ পালন করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। একটা শৃঙ্খল আছে, সে শৃঙ্খল অপ্সরাসুন্দরীর প্রেম-শৃঙ্খল। সে শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া পলায়ন করিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সেই নিমিত্তই ধরা পড়া।

একদিন বৈকালে নাপিতের পান্থনিবাসে একজন সৈনিক পুরুষ দেখা দিলেন। পরিধান সৈনিক পোষাক।—মস্তকে পক্ষী-লোমের টুপি।—হস্তে কিরীচ, বক্ষে সৈনিক-দলের নামাঙ্কিত উর্দ্দি।

সেই বীরমূর্ত্তি একটী অগ্রাসনে উপবেশন করিয়া সমীপবর্ত্তী লোকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক সাহঙ্কারস্বরে কহিতে লাগিলেন, "তোমরা এখানে কি কার্য্য কর? তোমাদের দুর্দ্দশা আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার হৃদয়ে অধিক দয়া। সকল লোকে সুখে থাকে, সেই আমার অন্তরের আকিঞ্চন। তোমাদের সঙ্গে আমার ভাই ভাই সম্বন্ধ। সেনাদলে চল। এ কুটীরে বাস করিয়া তোমরা সুখের মুখ দেখিতে পাইতেছ না। চল আমার বাহিরকে। সে বাহিরকের আমি সর্ব্বে-সর্ব্বা স্বামী। রাজভোগ ভোজন করি, সুকোমল পর্য্যঙ্কে শয়ন করি, কিঙ্কর কিঙ্করীরা চামর ব্যজন করে, সুগন্ধ কুসুমতরুরা মৃদুপবন-হিল্লোলে হিল্লোলিত হইয়া আমার নাসিকায় পরিমল পরিবেশন করে। কত সুখী আমি, প্রকাশ করিয়া বলিতে জানি না। আর তোমরা,—তোমরা এই সামান্য অন্ধকার কুটীরে জড় সড় হইয়া পড়িয়া থাক, দেখিয়া দুঃখ হইতেছে। আমার সঙ্গে চল। জগতের সার-সুখ সেখানে তোমাদের জন্য প্রস্তুত। তোমরা হিন্দুস্থানের লোক; সুন্দরী কামিনী কখনও তোমাদের চক্ষের সম্মুখে আসে না। তোমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে,—অমরাবতী। অমরাবতীতে সুরবালা থাকে,—অপ্সরা থাকে,—কিন্নরী থাকে। কিন্তু যে অমরাবতীতে আমি তোমাদের লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি, সে অমরাবতীতে সুরবালা অপেক্ষাও সুন্দরী বিদ্যাধরীর বাস। প্রভাতে স্নান করিয়া আমি ক্ষীর খাই। তাহার পর উপাদেয় ভোজ্য বস্তুতে জঠরানলের তৃপ্তিসাধন করি। তাহার পর মাখম-পনির। নিশাকালে বিদ্যাধরী লইয়া শয়ন করি। দিবা-শ্রান্তির শান্তি হয়। তোমরা কি সে সুখ ইচ্ছা কর না?"

কেহ কথা কহিল না। দুঃখ যখন মানব-হৃদয়ে নির্ঘাত আঘাত করে, প্রলোভন আর বিলাস তখন স্থির হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না।

লোকেরা একে একে চলিয়া গেল। থাকিলেন, কেবল একমাত্র ভূপেশচন্দ্র।

সেনাধর লিঙ্গেশ্বর আপনাকে আপনি মহাপ্রভু জ্ঞান করিয়া সতেজ স্বরে কহিলেন, "তোমার নাম কি ভূপেশচন্দ্র?"

"আমার নামে তোমার কি প্রয়োজন?"

লিঙ্গেশ্বর উত্তর করিল, "তোমার নামের সঙ্গে আমার সহানুভূতির কিছু সম্পর্ক আছে।"

"সহানুভূতি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার সঙ্গে যাহার সহানুভূতি ছিল, তাহাকে আমি হারাইয়াছি। তবে আবার কাহার সঙ্গে সহানুভূতি?"

"তুমি আমার সঙ্গে চল। নিত্য নিত্য পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। কোন কষ্ট থাকিবে না। অগ্রিম প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর? একশত মুদ্রা। কিন্তু বীরবর! দুটী কথা।—কল্য প্রাতঃকালে তুমি আমার সঙ্গে একজন হাকিমের কাছে যাইবে।"

"স্বীকার। দ্বিতীয় কথা বল।"

"সে হাকিমের কাছে তুমি অঙ্গীকার করিবে, এক বৎসরের জন্য যেখানে তোমাকে পাঠাইতে চাহিবেন, সেইখানে যাইতে হইবে।"

"হইবে? অপ্সরাকে ছাড়িয়া তোমাদের যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই আমাকে যাইতে হইবে? মার্জ্জনা ভিক্ষা করি, উপবাসে প্রাণ যায়, তাহাও শ্লাঘা করিয়া মানি, অপ্সরাকে ছাড়িয়া আমি বিদেশে যাইতে পারিব না।"

"অগ্রিম মুদ্রা গ্রহণ কর।"

"তাহা ত করিয়াছি।"

"তবে অস্বীকার কর কি সাহসে?"

"যাইব না, সেই সাহসে।"

"থাক তবে তুমি! এই রাত্রেই প্রতিফল পাইবে।"

"লেখা পড়া ব্যতিরেকে যে অঙ্গীকার, তাহা যথার্থ অঙ্গীকার নহে। অগ্রিম মুদ্রা ফিরাইয়া দিতেছি, গ্রহণ কর।"

"না, তাহা এখন আমি পারি না। ভাল করিয়া বিবেচনা কর। আবার সাক্ষাৎ হইবে।" ত্বরিতস্বরে এই কথা বলিয়াই লিঙ্গেশ্বর ত্বরিত-পদে তথা হইতে চলিয়া গেল।

ঊন-বিংশ প্রবাহ।

অর্থ-মহিমা।

"যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
খাও আর খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
পেঁচা নিয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥"

প্রভাকর।

দশ দিন অতীত। দুরন্ত লিঙ্গেশ্বর পুনঃপুন উপরোধ অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু কে তাহা শুনিতে পায়? অকপট প্রেমিকের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, সত্য, কিন্তু সে কর্ণ, সে চক্ষু অন্য দিকে ধায় না। মনে এক প্রতিমা,—হৃদয়ের প্রতিমা। চক্ষে একটী স্বচ্ছ পদার্থ আছে, যদি সম্ভব হয়, সে স্বচ্ছ-দর্পণে সে প্রতিমার ছায়া পড়ে। কর্ণ-গহ্বরে একটী পাখী বসিয়া আছে, সে পাখী কথা কহে না, কথা শোনে; কিন্তু তোমার কথার প্রতিধ্বনি করে। ভূপেশচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি হইল; সেনাধর কাপুরুষকে তিনি সরোষে কহিলেন, "বিদায় হও; আমি নির্জ্জনে আসিয়াছি, নির্জ্জনে থাকিতে দাও। অপ্সরা ছাড়া সংসারে আর আমি কাহাকেও জানি না।"

"তবে আমার টাকা?"

"আমি ঋণী থাকিব না।"

"গ্রহণ করিয়াছিলে কি জন্য?"

"মনভ্রমে।"

"এখন পরিশোধ কর।"

"অবশ্য।"

"সুদ হইয়াছে।"

"জানি।"

"একদিন মাত্র অপেক্ষা করিতে পারি; একদিনের পর আর কোন কথা আমি শ্রবণ করিব না।"

"তাহাই যথেষ্ট।"

"এ পান্থনিবাস হইতে তুমি বাহির হইতে পার না।"

"ক্ষণেকের জন্য।"

"যদি পলায়ন কর?"

"পৃথিবীর পিতা আমার রসনাকে দগ্ধ করিবেন। তুমি বিদায় হও। সূর্য্য অস্তের একদণ্ড পরেই আমি এই পান্থনিবাসে উপস্থিত হইব। ক্ষণকালের জন্য তুমি আমাকে স্বাধীনতা দান কর।"

গর্জ্জন করিতে করিতে লিঙ্গেশ্বর সে গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কুমার ভূপেশচন্দ্র সচিন্তিত ভাবে পান্থ-নিবাস হইতে বহির্গত হইলেন।

আজ দশদিন অপ্সরা-সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। সন্ধ্যাকালে সেই কাননপথে অপ্সরা কি আসিল? আমাকে দেখিতে না পাইয়া নিরাশে বঞ্চিত হইয়া অপ্সরা কি পিতৃগৃহে ফিরিয়া গিয়াছে? আমি কয়েদী। আমার অকৃত্রিম প্রণয়ে প্রিয়তমা অপ্সরাসুন্দরীর কি সংশয় জন্মিয়াছে? জন্মিতে পারে। অবিশ্বাসী না হইয়াও আমি অবিশ্বাসী। কিন্তু এখন যাই দেখি; প্রাণে প্রাণে একবার ডাকি দেখি। অর্থ-মহিমা,—তুচ্ছ কথা। দেখি দেখি আমার অপ্সরা-সুন্দরী আমার কাছে আসে কি না?"

সন্ধ্যা হইবার একদণ্ড বিলম্ব। আকাশ রক্তবর্ণ, সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ, ভূপেশচন্দ্রের মানস রক্তবর্ণ। ভূপেশচন্দ্র নদীতীরে। ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন, অন্ধকার। দশদিন, দশরাত্রি যে হৃদয় অন্ধকার ছিল, সে হৃদয় যে এখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবে, ইহা কি বিচিত্র কথা? নদীর এ তীরে বন, ও তীরে বন। ও তীরের বনে বিদ্যুতের মত এক আভা বিকাশ পাইল। প্রেমিকের চক্ষু সেই দিকে ঘুরিয়া গেল। সে আভা কাহার? অপ্সরাসুন্দরীর। নদীতে কম জল। খেয়া নৌকার প্রয়োজন করে না। পদব্রজে অপ্সরাসুন্দরী নদী পার হইয়া চিত্ত-রঞ্জনের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। মহামুনিগণকে শত, শত নমস্কার। হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ হইবার অগ্রে সংকল্পিত পতি-পত্নীতে দাম্পত্য-

ব্যবহার সংঘটিত হইতে পারে না। অপ্সরা কহিলেন, "ভূপেশ! ভূপেশ! তুমি না কি সৈ——"

প্রশ্নের আভাস বুঝিতে পারিয়া ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "তাহা ভিন্ন আর ত কোন উপায় দেখিলাম না।"

"কেন জীবিতেশ্বর! আমি ত তোমার উপায় আছি।"

"তুমি আবার এতদিন পরে কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিলে?"

"কেন প্রাণেশ্বর! হৃদয়ে হৃদযে ত আমি গাঁথা আছি। হৃদয়ে হৃদয়ে ত তুমি গাঁথা আছ। তবে আবার অমন কথা বলিতেছ কি জন্য?"

"সে জন্য না।—তুমি সে কথা কাহার মুখে শুনিলে?"

নেত্র-নীরকে বাধা দিতে না পারিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ভূপেশ! মতিয়ার মুখে আমি শুনিযাছি, তুমি এই দেশের রাজার যুদ্ধের দলে প্রবেশ করিয়া বিদেশ-গামী হইবে। ভূপেশ! যাও, কিন্তু প্রাণ আমার কাঁদে কেন? তুমি যুদ্ধে যাইবে, আমি পাগলিনী হই কেন? যেও না। কাতরে মিনতি করি,—দাসীকে ক্ষমা কর; যেও না।"

"না যাইয়া কি করি? লিঙ্গেশ্বরের শত মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছি; এমন সঙ্গতি নাই, সে ঋণের প্রতিশোধ করিতে পারি।"

"ভূপেশ! তুচ্ছ অর্থের অনুরোধে তুমি আমারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? যখন আমার বুকের সর্ব্বস্ব তোমারে আমি সমর্পণ করিতে পারিয়াছি, তখন কি সামান্য অর্থের নিমিত্ত আমি পরাভব মানিয়া যাইব?"

"কৃতার্থ হইলাম! চরিতার্থ হইলাম। পরাধীন হইতেছিলাম, হইব না। একদিন,—আর একদিন মাত্র অপেক্ষা।"

"পিতা আমারে দশদিন কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাহির হইতে পারি নাই। কল্য সন্ধ্যার পরে আমি আসি, আর মতিয়াই আসুক, পাপাত্মাদের ঋণ পরিশোধ হইবেই হইবে। এখন আমি বিদায় হই। পিতার অজ্ঞাতে চতুরা মতিয়া আমার কারাগৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। সেই সুযোগে মতিয়ার কৃপাতেই আমি পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। শীঘ্র আমি ফিরিয়া না গেলে মতিয়া বিপদে পড়িবে।"

সন্ধ্যা হইয়া গেল। দুই জনে দুই স্থানে। ইহার নাম বিচ্ছেদ। তুমি আমি যাহাকে বিচ্ছেদ বলি, সে বিচ্ছেদের হয় ত অন্ত নাই, কিন্তু এ বিচ্ছেদের অন্ত আছে। সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি আসিল, উষা আসিল,—প্রভাত আসিল,—অপ্সরা আসিল না,—মতিয়া আসিল না,অর্থ আসিল না। দিন গেল। নূতন সন্ধ্যার সমাগম। সেনাধরা লিঙ্গেশ্বর সম্মুখে আসিয়া জোরে জোরে কথা কহিতে লাগিল,—"ক্রীত-দাস! অগ্রিম বেতন গ্রহণ করিয়াছ, হয় সেনাদলে প্রবেশ কর, না হয় মায় সুদ অগ্রিম বেতন প্রত্যর্পণ কর।"

কৈ? কেহ ত আসিল না! অপ্সরা প্রতারণা করিবে? অসম্ভব। মতিয়া আসিবে না? অসম্ভব। কিন্তু যথাসময়ে কিরূপে আমি ঋণ পরিশোধ করি? লহমায় লহমায় লহমা যাইতেছে,—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্ত যাইতেছে,—দণ্ডে দণ্ডে দণ্ড অতিক্রান্ত হইতেছে,—তথাপি কেহই আসিতেছে না। ভূপেশচন্দ্র আকুল হইয়া মনে মনে ভক্তিভাবে ভাবিতেছেন,—ঈশ্বর।

হা ঈশ্বর! আমি তব চরণের দাস।
চরণে অর্পিব চিত, চির অভিলাষ॥
পড়েছি সঙ্কটে ঘোরে, সঙ্কট-ভঞ্জন!
দয়া করি দেহ দাসে অভয় চরণ॥
যারে ভালবাসি আমি, হেরিতে তাহারে!
কত যে কাতর মন কহিব কাহারে?
অর্থশূন্য আমি দেব! স্বাধীনতা ধনে
বেচিয়াছি আমি প্রভু সেই ধূর্ত্তগণে।
আজি যদি পরিশোধ করিতে না পারি,
আজি যদি পণব্রতে সত্যপথে হারি,
তবে আর মর-ধামে মুখ দেখাব না,
লজ্জাকে সম্বল করি, বেঁচে রহিব না॥

ওই বুঝি আসিতেছে অপ্সরা-সুন্দরী ?
আয় লো প্রাণের প্রিয়া ! নমস্কার করি ॥
রক্ষা কর, রক্ষা কর, দাসত্ব-শৃঙ্খলে
বাঁধা আর রহিব না, ধূর্ত্তের কৌশলে !
তুমি লো অপ্সরা মম হৃদয়ের ধন।
কৃপা করি কর মম দাসত্ব-মোচন ॥
আইলা অপ্সরা সতী অন্ধ-কারাগারে ;
কহিলা, "উদ্ধার আমি করিব তোমারে ॥"

অপ্সরা-সুন্দরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূপেশচন্দ্রের হস্তে অগণিত রজত মুদ্রা প্রদান করিলেন। প্রদান করিয়াই একটা ক্ষুদ্র যবনিকার অন্তরালে লুকাইলেন। দুরাচার স্বার্থপর লিঙ্গেশ্বর ক্ষণকালের জন্য বাহির হইয়া গিয়াছিল, ক্ষণকাল পরেই ভূপেশের অবরোধ গৃহে তাহার পুনঃপ্রবেশ ! আসিয়াই ভীম স্বরে কহিল, "প্রতিদান।" ভূপেশচন্দ্র অপ্রস্তুত ছিলেন না ;—সমভাবে প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "এই লও তোমার প্রতিদান।"

অর্থ গ্রহণ করিয়া অর্থপিশাচ যেন বায়ুবেগে কম্পিত হইতে লাগিল। কি যেন বলিবে বলিবে ইচ্ছা, কিন্তু উত্তেজিতভাবে উত্তেজিতস্বরে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "আর এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পার না। যাহা লইয়া কথা, যাহা লইয়া সম্বন্ধ, তাহা আমি প্রত্যর্পণ করিয়াছি ; আর বিভীষিকা নিষ্প্রয়োজন। মনের উৎকণ্ঠায়, মনের ঔদাস্যে মতিভ্রমে আমি তোমার খাতক হইয়াছিলাম, সে ঋণ পরিশোধ করা হইল ; নমস্কার করি, এখন তুমি বিদায় হও। সংসার-তাপন ক্রোধরিপু দয়া করিয়া সর্ব্বদা আমার নিকটে আসেন না। কিন্তু তোমারে দেখিয়া সে রিপু যেন ঘন ঘন দূর হইতে আমাকে ভীমমূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে। তুমি বিদায় হও। নেত্রপলক মাত্র অপেক্ষা করিলে বোধ করি, আমি সে রিপুর বেগ

সম্বরণ করিতে সমর্থ হইব না। অবিলম্বে তুমি আমার নেত্রপথ হইতে বহির্গত হইয়া যাও।”

বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতে বকিতে লিঙ্গেশ্বর সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। যবনিকান্তরাল হইতে অপ্সরাসুন্দরীর পুনঃপ্রবেশ। ভূমে জানু পাতিয়া করযোড়ে অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, “মনোময়! তোমারে আমি অঋণী করিয়াছি, এ বড় দুঃসাহসের কথা। দাসী তোমার চরণেই চিরঋণী। আমি অবাধ্য তনয়া হইতে পারি, অবাধ্য পত্নী হইতে পারি না। তুমি যদি এ দেশ পরিত্যাগ কর, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

যেন বজ্রাহত হইয়া চমকিত ভাবে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, “সে কি অপ্সরা! তুমি এ কি কথা বল! বিবাহের পূর্ব্বে পবিত্র আর্য্যকুলের পবিত্র আর্য্যকুমারী অসম্পর্কীয় অপর পুরুষের সহিত কোন কালে কখনও কি বিদেশে যাইতে সাহস পায়?”

“যদি না পায়, তাহাতে আমার কি? আমার প্রতিজ্ঞা, আমি তোমার অনুগামিনী হইব।”

“সে কথা এখন নয়। যে দিন আমি এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইব, সে দিন তোমাকে বিনা সংবাদে বিরহিণী থাকিতে হইবে না। অধিকন্তু যখন তুমি ঐ দুষ্ট লোকের প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিলে, তখন আর শীঘ্র আমার এ দেশ পরিত্যাগের প্রয়োজন হইবে না। তবে চক্রান্তকারী লোকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া আমাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছে, কেবল সেই এক ভয়।”

রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ আশা-কল্পনায় উভয়ে অনেক প্রকার গূঢ় অগূঢ় কথাবার্ত্তা হইল। ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া অপ্সরা-সুন্দরী বিদায় হইলেন। ভূপেশচন্দ্র গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, সংসারী লোকে যখন বিপদে পড়ে, ধর্ম্মবলে তখন এই রকমেই উদ্ধার পায়। ইহারই নাম অর্থ-মহিমা।

বিংশ প্রবাহ।

প্রস্থান।

অনলে, সলিলে কিম্বা পর্ব্বতগুহায়।
দূরদেশে পলাইব যথা ইচ্ছা যায়॥
যেখানে মিলিবে মম জীবন-রতন।
মহানন্দে সেইখানে উড়ে যাবে মন॥

ভারত-রত্ন।

গৃহে কেহ নাই। ভূপেশচন্দ্র একাকী। তাঁহার হৃদয়ে চিন্তা-দেবীর অনেক খেলা। এক খেলা, ওঃ! আমি কি ধ্বংস হইব? আমি কি আপনাকে আপনি হারাইব? ইহা কি সত্য? ইহা কি সম্ভব? কিম্বা ইহা কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন? হা পরমেশ্বর! অভাগিনী অন্নপূর্ণাসুন্দরীর দশা কি হইবে! ওঃ! আমি পাগল হইয়া যাইব, পাগল হইয়া যাইব। স্বগত বাক্যে এই কথা বলিতে বলিতে ভূপেশচন্দ্র দ্বারদেশের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া একখানি কপাটে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল হস্তে ললাট দেশ বিমর্দ্দন করিয়া আত্মগত বাক্যে আবার কহিতে লাগিলেন, যে অভাগা জল্লাদের তরবারিতে মস্তক প্রদান করিতে যায়, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যে অভাগা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে যায়, বিনা দোষে,—বিনা পাপে আমি কি তাহাদেরই পন্থানুসারী?

রাত্রের ঘড়িতে দশটা বাজিয়াছে। হা জগদীশ! এত বিলম্ব। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি? আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারা যায় না।

ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া ভূপেশচন্দ্র নীচে নামিলেন। চক্ষে তাঁহার চপলা খেলা করিতে লাগিল। যে মনের দৃঢ়তা আছে, সে মনে মহা মহা শোক দুঃখেও স্থির শান্তির উদয় হয়। কিন্তু সে শান্তি কিছু ভয় মাখা;—নৈরাশ্যের সঙ্গে ভয়। নিরাশা যেন জানে, কোন দুর্ঘটনা নিকট-বর্ত্তিনী। যাহারা কাঁদে, তাহারা সে দুর্ঘটনা বুঝিতে পারে না। ধর্ম্মরাজ

কৃতান্তদেব শয্যায় আসিয়া শয়ন করিয়াছেন, নিরাশ ভয়ার্ত্ত চক্ষু তাহা দর্শন করে না। ঠিক যেন মনে আইসে, সংসারের সমস্ত লীলা খেলা ফুরাইযা গিয়াছে। নির্জ্জন নিশাকালে ভূপেশচন্দ্রের মনে তখন যেন ঠিক সেই ভাব। যাহা থাকে কপালে অবশ্যই ঘটিবে, অদৃষ্টই বলবান; তবে আর অবরোধে থাকিয়া কি করি? চিন্তা বড় চঞ্চলা। একবার আশা দেয়, একবার নিরাশ করে। ভূপেশকে চঞ্চল করিয়া চিন্তা চলিয়া গেল। চঞ্চল পদে ভূপেশচন্দ্র নিম্নতলে নামিলেন। সেই নিম্নতলে সেই দুষ্ট লিঙ্গেশ্বর বসিয়াছিল। কিছু পূর্ব্বে যাহাকে তিনি আশ্রয়দাতা বন্ধু বলিয়া জানিতেন, সেই মূর্ত্তিতে তখন তিনি দেখিলেন, মর্ম্মভেদী শত্রু,—পরমশত্রু। ভূপেশ চন্দ্র তৎক্ষণাৎ চঞ্চলপদে অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। সংসার রঙ্গভূমে এমন মানসিক পরিবর্ত্তন অহরহই হইয়া থাকে। চিনিতে পারি না, মনে করি, তুমি আমাকে ভালবাস। চিনিতে পারি না, মনে মনে তোমাকে আমি অকপটে ভালবাসি। কিন্তু তুমি যে কুটী হইয়া শাল হইবে, তখন তখন ত আমার সে ধারণা থাকিত না। হৃদয়! আমাতে থাকিয়া তুমি আমাকে প্রতারণা কর! ধিক্ ব্রহ্মাণ্ডকে! ধিক্ জীবনকে! ধিক্ সংসারকে! ধিক্ আমাকে! ধিক্ ভালবাসার বিশ্বাসের বিশ্বাসকে!

এ আবার কে?

"ভূপেশ! ভূপেশ! আমি আসিয়াছি। আমি অপ্সরা। তোমারে বিদায় দিয়া গিয়াছি, নিশাস্বপ্ন। সেই বিদায় যেন রাক্ষসী হইয়া আমারে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। শয়ন করিতে পারিলাম না, বিশ্রাম করিতে পারিলাম না, আবার আমি আসিয়াছি। জীবিতেশ! জীবিতেশ! দেখ, চাহিয়া দেখ, আমার চক্ষে আগুন জ্বলিতেছে। সে মূঢ় পাপাত্মা পামর কোথায়? আমি অন্ধ। আমি কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। তোমাকেও দেখিতে পাইতেছি না। সে পাপিষ্ঠ এখন কোথায় অদৃশ্য?"

"প্রিয়তমে! প্রিয়তমে! অপ্সরা! আমি তোমারে—"

"পরমেশ্বর! পরমেশ্বর! ইহার মধ্যে কি বিশ্বাসঘাতকতা আছে! ভূপেশ! আজ সন্ধ্যাকালে অশ্বত্থকুঞ্জে তোমারে দেখিতে পাই নাই কেন?"

"প্রাণেশ্বরি! জান না কি তুমি? আমি কয়েদী!"

"কেন নাথ! তুমি কয়েদী কেন? আমি ত তোমারে খালাস করিয়া দিয়া গিয়াছি। সংসারে এমন আর কে আছে যে, আর তোমারে অবরোধ করিতে পারে?"

"তুমি স্বর্গ-সুন্দরী। তোমার সাধ্য জগৎসংসারের অসাধ্য। কিন্তু মতিয়া আসিল না?"

"আসিলে কি হইত?"

"সঙ্গে করিয়া পলায়ন করিতাম।"

হাস্য করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "সত্যই তুমি পাগল হইয়াছ! আমারে ফেলিয়া মতিয়ারে লইয়া তুমি পলায়ন করিতে?"

"ভুল হইয়াছে। চিন্তার তাড়নায় তোমার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, তুমিই যেন মতিয়া।"

হাস্য করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "তাহাত হইতেই পারে! কে অবিশ্বাসিনী, কে অবিশ্বাসী, এখন ভাল করিয়া বিবেচনা কর।"

"আর ত বিবেচনার অবসর নাই।"

"তবে কিসের অবসর আছে?"

"পলায়নের।"

"আবার যদি মূর্চ্ছা আসিয়া আমারে অজ্ঞান করে?"

"মূর্চ্ছা জীবন হরণ করিতে পারে না।"

"তাহাতে আমি কি বুঝিব?"

"মূর্চ্ছাকে পশ্চাতে রাখিয়া আমি তোমার জীবন দান করিব।"

"তুমি পার তা। জীবিতেশ্বর! আমি নিশ্চয় জানি, তুমি পার তা। কিন্তু কথায় কথায় রাত্রি বেশি হয়।"

"তাহা কি তুমি ভালবাস না?"

"বুঝাইয়া দাও, ভালবাসিতে পারি।"

"অন্ধকার এক সময়ে আমাদের শত্রু,—এক সময়ে সখা। রাত্রি যত বেশি হয়, ততই মঙ্গল।"

"তোমার কথা ও আমি বুঝিতে পারিলাম না,—আমার কথাও তুমি বুঝিতে পারিলে না। কালরাত্রি বলে, কোন্ কালে, কাহার, কাহাদের

মঙ্গলের জন্য আসিয়া থাকে? রাত্রিকালে রাত্রিচরেরা বিচরণ করে। তোমার আমার মঙ্গলের জন্য নয়, তাহাদের নিজের নিজের স্বার্থসাধনের জন্য। তুমি কি তাহা ভাবিতে পার না? তুমি কি তাহা দেখ নাই? নিশাচর মানুষ আছে, নিশাচর পশু পক্ষী আছে, তাহারা কি সংসারের মঙ্গল অন্বেষণ করে?" বাঙ্গালী পাঠক হয় ত বলিবেন, নিশাচর মানে, রাক্ষস! কিন্তু এই আখ্যায়িকার আখ্যায়ক কখনই বলিবেন না, যে নিশাচর মাত্রই রাক্ষস। তারতম্য অনেক। শশী-সখী কুমুদিনী।—

"কিন্তু আমাদের,—আমাদের আত্মা দিবাভাগে কমলিনীর ন্যায় ফুটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকে দেখিয়া ভয় পায়। আমাদের আত্মা রাত্রিকালে কুমুদিনী সাজে না, যে কমলিনী, সেই কমলিনীই বিদ্যমান থাকে। পলায়নের উত্তম অবসর।"

"তবে চল পালাই।"

"না।—এখন না। কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে?"

কথা কহিতে কহিতে অপসরা সুন্দরী অন্যমনস্কে একটী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। ভীষণ-দর্শন লিঙ্গেশ্বর ঠিক সেই অবকাশে ভূপেশের আবাস কক্ষে প্রবেশ করিল। সদর ফটকে শকট। লিঙ্গেশ্বর নানা প্রলোভন দেখাইয়া যে সকল লোককে ভুলাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুজন তাহার অনুগত। তাহারা শুনিয়াছিল, বারিক। বারিকের চতুর্দ্দিকে নিকুঞ্জবন। বারিকের মধ্যে সুখাসন! সুখাসনে অমরাবতীর বিদ্যাধরী বিরাজ করে। লোভে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। বিনা দ্বিরুক্তিতে তাহারা শকটে আরোহণ করিল। বলে আকৃষ্ট হইয়া ভূপেশচন্দ্র সেই শকটে আরোহণ করিতে বাধ্য হইলেন। শকটের আচ্ছাদন পরদা পড়িয়া গেল। বলবান উচ্চৈঃশ্রবা গাড়ি লইয়া প্রশস্ত রাজপথে ছুটিয়া চলিল। অপ্সরা সুন্দরী কিছুই জানিতে পারিলেন না।

একবিংশ প্রবাহ।

সৈনিক-শিবির।

" Commend me to their love, and I am proud, say,
That my occasions have found time to use them,
Toward a supply of money; let the request
Be fifty talents.————"

Timon of Athens.

পঞ্চনদক্ষেত্র পঞ্জাবের সিন্ধুনদ পারে কাবুলের অন্তর্গত গান্ধার রাজ্য;—গান্ধারে সেনা-নিবেশ। ভূপেশচন্দ্র সেই সেনাদলের নেতা। আসিবার ইচ্ছা ছিল না,—প্রণয়-প্রতিমাকে বঞ্চনা করিবার বাসনা ছিল না,—কিন্তু কেন, কি কৌশলে, কি কহকে তিনি বিদেশগামী, তখনও পর্য্যন্ত তাহা তিনি জানেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জিত হইয়াছেন, জয় পরাজয় আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে জাগিতেছে, একটী প্রতিমা। এক দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। এক দিনের যুদ্ধে ভূপেশচন্দ্রের জয় হইল। এক দিনের যুদ্ধে বীরবর ভূপেশচন্দ্র আপনাকে রণ-বিজয়ী জ্ঞান করিয়া মনে মনে শ্লাঘা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রণজয় ত তাঁহার লিপ্সা নহে। মনে তাঁহার অন্য প্রকার ভাবনা। সে ভাবনা অপর সাধারণে বুঝিতে পারে না। সৈনিক শিবিরে এক প্রকার শান্তি আছে। ঢাল তলোয়ার, কিরীচ বর্শা দেয়ালে দেয়ালে ঝোলে। কিন্তু বীরপুরুষ তাহা দেখিয়া ভয় পান্ না,—সাহস পান। দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধেও ভূপেশচন্দ্রের বিজয়। তথাপি যুদ্ধের শান্তি নাই। সন্ধ্যাকালে যুদ্ধের অবসান। সন্ধ্যাকালে অভাগা যুবা সেনাপতি আপন শয্যায় শয়ন করিয়া হৃদয়ে একটী হৃদয়প্রতিমার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানের দুটী সামগ্রী আছে,—পিপাসা আর নিরাশা। তাহারা আসিয়া কাণে কাণে কহিয়া দিল, আশাকে বেশী বিশ্বাস করিও না।—আশা চপলা।

দ্বাবিংশ প্রবাহ।

বিরাটকেতুর বাঞ্ছা।

তোমার বিপুল বাঞ্ছা কতদূরে যায়।
দেখিতে এসেছি তাই দেখিব তোমায়॥
পাপে তাপে কলঙ্কিত হৃদয় তোমার।
দূরে থাক, চক্ষুপথে আসিওনা আর॥

বঙ্গ-রত্ন।

একপক্ষ অতীত। একটী রাজকুমার ছদ্মবেশে বিরাটকেতুর নিকেতনে সন্ধ্যাকালে প্রবেশ করিয়াছেন। সঙ্গে কেহ নাই। বিরাটকেতু একাকী একটী বিশ্রাম কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজকুমার প্রবেশ করিবামাত্র যেন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অভ্যর্থনাবাক্যে সঙ্গীতের-স্বরে তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "এক পক্ষের কোন সংবাদ আমি জানি না। কিন্তু রাজা! তুমি মনে কর, তোমার কন্যাকে আমি ভালবাসি।"

"আমার কন্যাকে তুমি ভালবাস?"

"আমার বিশ্বাস এই।"

"আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"আপনি বুঝিতে পারিবেন, তেমন আশাও আমি রাখি না। কোথায় গিয়াছিলাম, কোথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, তাহাও আমার মনে নাই।"

"তবে তুমি অপরিচিত বিদেশী?"

"তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। এক মাস হইল, আমি বিদায় হইয়াছিলাম, সাত মাস পরে আমি অপ্সরাসুন্দরীকে দেখিতে আসিয়াছি। সাত বৎসরের জন্য আমি অঙ্গীকার-বদ্ধ। এক বৎসরের স্থলে সাত বৎসর। এ সাত

বৎসর আমি আর অপ্সরাসুন্দরীকে দেখিতে পাইব না। প্রাণে প্রাণে যাহাকে আমি ভালবাসি,—জান তুমি রাজা! আমি কৃষক-সন্তান,—এ সাত বৎসর অপ্সরার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না। রাজা! তুমি অপ্সরাসুন্দরীর জন্মদাতা পিতা। তোমার নিকট আমার আর কিছু গোপন কথা নাই। কিন্তু সাত বৎসর অবসানে আমাদের যৌবনের অবসান হইবে। তখন আর অপ্সরাতে আমাতে সাক্ষাৎ হইয়া কি ফল?"

রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "তুই বুঝি সেই গৃহশূন্য, বিত্ত শূন্য, সম্বল-শূন্য ভূপেশ সিংহ? এতক্ষণ পরে তোরে আমি চিনিতে পারিতেছি। অশ্বথবৃক্ষ, প্রাচীন বটবৃক্ষ, তোরে কতদিন আশ্রয় দিয়াছিল, আমি জানিতাম না। কিন্তু এখন তোর আর আশ্রয় নাই।"

"আছে, মহারাজ! অশ্বথ নয়, বট নয়, আরও একটী গাছ আছে; সেই গাছের নীচে আমার আশ্রয় আছে। সে গাছ কি তুমি আমাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

"ঝড়ে সে গাছ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

"রাজা! আর আমাকে দগ্ধ করিও না। আমি নিশ্চয় জানি, ঝড়ে সে আশ্রয়তরু ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে না।"

"তুমি সে গাছের নাম জান?"

"চিরদিন জানি। চিরদিনে সে নাম ভুলিব না,—সে গাছের নাম অপ্সরাসুন্দরী।"

"দূর হ পাষণ্ড! সে নাম আমার সম্মুখে আর উচ্চারণ করিস্ না।"

"মহারাজ! সে নাম যে আমার হৃদয়-পটে আঁকা। কি করিয়া ভুলিয়া যাইব?"

"অপ্সরাসুন্দরীকে আমি রাজকুমার জহরলালকে * বাগ্দান করিয়াছি।"

"কিন্তু মহারাজ! অপ্সরা নিজে আমাকে বাগ্দান করিয়াছে।"

"অগ্রাহ্য।"

"তুমি রাজা অগ্রাহ্য কর, অপ্সরা আমার হৃদয়ের ঈশ্বরী।"

---

* এই জহরলাল কে, পাঠক মহাশয় ক্রমে জানিবেন।

"তুই নীচবংশের কীটানুকীট। আমার রত্নপ্রতিমা অপ্সরা ঐ কীট-সংসর্গে অপবিত্র হইতে পারিবে না।"

"তবে সত্য কি আমাকে হতাশ হইতে হইবে?"

"আমি তাহা জানি না।"

"আশা কি তবে আমারে বঞ্চনা করিবে? কেন তবে সে আশাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম? অপ্সরাকে কি আর আমি দেখিতে পাইব না? অপ্সরাসুন্দরী কি আমাকে আর দেখা দিবে না? দিতে না পারে,—হইতে পারে,—তুমি রাজা! হৃদয়ের বন্ধন কি জান? যে সূত্রে হৃদয়ে হৃদয় গাঁথা থাকে, সে সূত্র ক্ষণচ্ছিন্ন কার্পাস সূত্র নয়।—দৃঢ়,—দৃঢ়,—সুদৃঢ় সূত্র। রাজা! লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমি বলিতেছি, সূক্ষ্ম প্রণয়সূত্রে যেখানে মালা গাঁথা থাকে, সেখানে তোমরা হয়ত জান, অনেক ফুল। কিন্তু আমার চক্ষু দেখে,—অনেক ফুল না হইলে ফুলের মালা হয় না।—আমার চক্ষু দেখে কেবল একটী মাত্র পদ্মফুল। পদ্মফুল সরোবরে ফুটিয়া থাকে। পদ্মের মৃণাল পঙ্কে জন্মে। মৃণালের নাম পঙ্কজ নহে, পদ্মের নাম পঙ্কজ। পদ্ম বৃক্ষ কি পদ্ম লতা, ইহা কি কখনও শুনিয়াছ রাজা? এ দুটী কথা কেহই উচ্চারণ করে না। মৃণালে পদ্ম থাকে, মৃণালে কাঁটা থাকে, কবিরা শুদ্ধ এই কথাই বলেন। বৃক্ষ কি লতা, তাহা তাঁহারা বলেন না। তাঁহারা যাহা না বলেন, আমরা তাহা প্রায়ই শুনিতে পাই না। একটী কথা শুনিতে পাই, হৃদয়ে একটী পদ্মফুল। ক্ষমা কর রাজা! এ পদ্ম সত্য সত্যই পঙ্কে জন্মিয়াছে। সেই পঙ্কজের আমি আদর করি। পঙ্কজ দল-বাসিনী দুটী দেবী আছেন, আমার হৃদয়ের পঙ্কজ সেই দুটী দেবীর পাদপদ্ম আর করপদ্মে শোভা পায়। আশা আমারে ত্যাগ করে না, আমিও আশারে ত্যাগ করিতেছি না। জানি, মায়াবিনী সত্য, কিন্তু এই বিশ্ব-সংসারে কে সেই মায়াবিনীর মায়ায় বিমোহিত নয়? জানি আমি,—আশা-চপলা।"—এই কথা বলিয়া বিরাটকেতুর তাড়নায় ভূপেশ-চন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কোথায় গেলেন, কেহই জানিল না।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ।

ডাক-ঘর।

বড় ভালবাসি তোরে ডাকের হর্কারি!
স্বদেশে, বিদেশে আমি যথা তথা থাকি,
বারতা আনিয়া দাও আমার স্বজন,
উদ্বেগ মানস চিন্তা ফেলাইয়া দূরে।
পত্রে পত্রে বল তুমি দূর দরশন,
এই দেখ হেথা আছি, দেখাইয়া দাও;
ভাবনারে সরাইয়া কর শান্তি দান।

ভারত রত্ন।

রাজা সত্যানন্দ রায় আপনার পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া উজ্জ্বল প্রাসাদ উপবেশন করিয়া আছেন। কনকমালা গাঁথিয়া রাণী বিরজাসুন্দরী তাঁহার হস্তে হস্তে প্রদান করিতেছেন, তাহাদের মনের আলিঙ্গন বিনা বাতাসে যেন সমুদ্র-সলিলে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। অকস্মাৎ একজন হরকরা আসিয়া রাজার হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল। শিরোনামে লেখা,—

"রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র।"

রাজা সেই নাম দেখিবা যেন আত্মবিস্মৃত হইলেন। মনে মনে তর্ক করিলেন, ভূপেশচন্দ্র তবে কি রাজকুমার? অসম্ভব! অসম্ভব!! পত্র কৃত্রিম। ভূপেশচন্দ্র ভিকারী,—অপরিচিত পথিক,—ইহাকে রাজপুত্র বলিয়া গ্রহণ করে, এমন পাগল এ দেশে কে আছে?

পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া রাজা পাঠ করিলেন,—'বৎস ভূপেশ! তুমি কোথায় আছ? বহুদিন আমি তোমাকে দেখি নাই। বার্তাবহ আসিয়া সংবাদ দিল, তুমি এক নীচ লোকের কন্যাকে বিবাহ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। বৎস! ইহা কি তোমার মানসম্ভ-

মের অনুরূপ? যদি তুমি কোন কুলাঙ্গনাকে ভালবাসিয়া থাক,—বাসিতে পার; কিন্তু বংশের অপবাদ করিও না। সম্ভ্রমের অমর্য্যাদা করিও না। সূর্য্যদেব এক দিন অস্তগত হন, নূতন প্রভাত আবার আসিতে পারে, তোমার সৌভাগ্যসূর্য্য আবার সমুদিত হইতে পারে. কৃষক-কন্যাকে তুমি প্রতিগ্রহ করিও না।"

পত্রে নাম স্বাক্ষর ছিল না। রাজা সেই পত্র পাঠ করিয়া মহা আকুলিত হইলেন। প্রথমাবধি ভূপেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যে অশ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছিল, এখন তাহা মহা-সংশয়ে পরিণত হইল। মনে মনে আলোচনা করিলেন, ডাকঘর কি প্রতারণা করিতেছে? ডাকঘর কি প্রতারণা করে? ইহা ত কখন বিশ্বাসযোগ্য নহে। কুকুর পথে পথে কলহ করে, কিন্তু এই কুকুর লোকালয়ে প্রবেশ করিয়াছে; ইহাকে দমন করিবার যত্ন কি কিছুই নাই?

* * * * * * *

* * * * * * *

পত্রখানি আবার পাঠ করিতে হইল। শোকে, দুঃখে, বিরহে, প্রজ্জ্বলিত হইয়া রাজা সেই পত্রখানি আবার পাঠ করিলেন। ডাকঘর প্রবঞ্চনা করে না, এই বিশ্বাসে পুনর্ব্বার,—বার বার সে পত্রখানি পাঠ করিলেন। কিন্তু বেনামী পত্র, পত্রে স্বাক্ষর নাই। নির্ঘণ্ট যাহা, তাহা যেন জানা। কিন্তু কে লিখিয়াছে, তাহা জানিতে পারিলেন না। আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

রাজমহিষী সেই পত্রখানি পাঠ করিলেন। শিহরিয়া কহিলেন, "আবার এ কি? এ পত্রে আরও এত কথা লেখা আছে। অক্ষরে অক্ষরে অশ্রুবিন্দু পড়িয়াছে। এ সকল অক্ষর কাহার লেখা? এত কথা এতক্ষণ কোথায় লুকাইয়া ছিল? সর্ব্বনাশি লেখনি! তুই সর্ব্বনাশী। অবলার সঙ্গে কি প্রতারণা করিতে আছে? আমি ডাকঘরে যাইতে জানি না, ডাকঘর আমার কাছে আসিয়াছে। ডাকঘরের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? কেহ জানে না; আমি জানি না, ডাকঘরও জানে না। কিন্তু তবু একটী কথা আছে। আশা। আশা আমাকে ছাড়ে ছাড়ে

ছাড়ে না। আশাকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি, আশাকে আমি ভালবাসি; আশা আমারে পরিত্যাগ করিলেও আশারে আমি পরিত্যাগ করি না। ডাকহরকরা?—কে সে? ডাকঘর আমারে আশা দিল! তাহার সঙ্গে আমার মনের কথা হইল। কিন্তু বল দেখি, মনের পাখি! এখন কে কোথায়? আশা আসিতেছে আর যাইতেছে। আশ্বাস দিতেছে আর বঞ্চনা করিতেছে। আশা বড় চঞ্চলা। মনে আমি সেটী ধারণা করি, এক দণ্ড রাখি, দুই দণ্ড রাখি, ইচ্ছা করিলে সমস্ত দিন রাখি; সমস্ত রাত্রি রাখি; কিন্তু আবার ভুলিয়া যাই। আশা আমার প্রিয় সখী;—প্রিয় সহচরী। আশাকে আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু আশা আমাকে এত প্রবঞ্চনা করে কেন? আশা চপলা।

চতুর্ব্বিংশ প্রবাহ।

পিতা না দস্যু?

মাতা যদি বিষ দেন আপন সন্তানে,
বিক্রয়েন পিতা যদি অর্থ প্রতিদানে,
রাজা যদি অবিচার করেন আক্রোশে,
দেবতা যদ্যপি তুষ্ট বলি পরিতোষে,
তবে বল ধরাধামে সেই অভাগার
রক্ষাকারী প্রিয়মিত্র কে হইবে আর?

নবরত্ন।

ছদ্মবেশী ভূপেশচন্দ্র রাজা বিরাটকেতুর গৃহ হইতে প্রস্থান করিবার পর আরও পাঁচ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। বিরাটকেতু মনে মনে কতই মন্ত্রণা, কতই কল্পনা অবধারণ করিতেছেন; বায়ু-প্রতিহত বাষ্পের

ন্যায় তাহা এক একবার দূরে দূরে উড়িয়া যাইয়া নির্ব্বাতস্থানে যেন স্তূপে স্তূপে সঞ্চিত হইতেছে। অভাগিনী অপ্সরা ইহার কিছুই জানেন না। তাঁহার মনের যে কি ভাব, তাহা নির্ণয় করা বিরাটকেতুর সাধ্য নয়। অপ্সরাসুন্দরী সর্ব্বগুণে গুণবতী। শীবতী তাঁহাকে যেন জননীর ন্যায় পালন করে। অপ্সরা এখন অনেক শান্ত। তিনি জানেন, সিদ্ধেশ্বরের প্রদত্ত অর্থ পরিশোধ হইলেও ভূপেশ যখন পুনরায় সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আর সাত বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশা নাই। যে সুখসৌভাগ্য প্রায় হস্তগত হইয়াছিল, তাহা এখন বহুদূরগামী। শীঘ্র আর সুখের মুখ দর্শন করা অসম্ভব। ভূপেশচন্দ্র অকপট সত্যব্রতী। তিনি সিদ্ধেশ্বরের নিকট স্বীকার করিয়াছেন, সৈনিক জীবন পরিত্যাগ করিবেন। গৃহীত অর্থ প্রত্যর্পিত হইলেও যে অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপ আছে, ইহা ভাবিয়াই হয় ত ভূপেশচন্দ্র পরাধীন,— ইহা ভাবিয়াই হয় ত ভূপেশচন্দ্র দেশত্যাগী। এইটীই অপ্সরার বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক কি কৌশল হইল যে ভূপেশচন্দ্র সিদ্ধেশ্বরের, সরলা অপ্সরা তাহার কিছুই জানেন না। কখন উপবেশন করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, সাত বৎসর! উঃ! সাত বৎসর! প্রণয়ীর হৃদয়ে ইহা কি এক যুগ বলিয়া বোধ হয় না? হয় সত্য, কিন্তু আশা স্বর্গী নিয়তই অবিচ্ছেদে প্রণয়ের প্রিয় সঙ্গিনী। সেই প্রিয় সঙ্গিনীর উপদেশ, যেখানে সুদৃঢ় হৃদয়-বন্ধন, সেখানে শেষে সুখ আছেই আছে। অকপটতার পুরস্কারই এই প্রকার। সেই আশাতেই মধুমতী অপ্সরাসুন্দরী সেই সুদীর্ঘ সপ্ত বর্ষের অবসান কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। কখন ভাবে এক একবার ভাবিতেছেন, তখন আমার বয়স আরও সাত বৎসর বেশি হইবে। ভূপেশেরও বয়স তখন আরও সাত বৎসর বেশি হইবে। এই যে দীর্ঘকালের মিলনাশা, পবিত্র প্রেমপূর্ণ অন্তরে ইহাও পরম সুখ। বিচ্ছেদ এক প্রকার পরীক্ষা। যখন সেই বিচ্ছেদ সমাপ্ত হইবে, তখন আর সুখের সীমা থাকিবে না। আশা এমনি বস্তু একগাছি ক্ষুদ্র তৃণ অবলম্বন করিয়া মহা বিচ্ছেদসাগরে সাঁতার দেয়। কত শত সুখস্বপ্নই সেই হৃদয়ে খেলা করে! সে আশা যদি আশা না থাকিত, তাহা হইলে অভাগা কষ্টক্লান্ত

মানবজীবনের যে কি দশা হইত, বলা যায় না। প্রস্থানের পূর্ব্বে,—কে জানে কোন্ অবসরে, ভূপেশচন্দ্র মতিয়ার হস্তে একখানি প্রণয়পত্রিকা অর্পণ করিয়া যান। অপ্সরাসুন্দরী নিত্য নিত্য সেই পত্রখানি পাঠ করেন। ভূপেশ যখন সেই পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার নিজের চক্ষের জলে অনেকগুলি অক্ষর মুছিয়া গিয়াছিল। অপ্সরা যখন পাঠ করেন, তখন তাঁহার চক্ষের জলেও অনেক অক্ষর ভিজিয়া যায়। তথাপি প্রণয়ের এমনি ধর্ম্ম, এমনি আকর্ষণ, পাঠের বিরাম হয় না।

ভূপেশ বিদায় হইয়াছেন, অপ্সরা শান্ত হইয়াছেন এই সময় এই বিশ্বাসে নিজের অভীষ্টসিদ্ধি কল্পে রাজা বিরাটকেতু পরম উৎসাহে সমধিক যত্নবান হইলেন। কিন্তু বিরাটকেতুর এই বিশ্বাস যে ভুল, তাহা আর পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিবার অপেক্ষা নাই। ভূপেশ যদবধি দেশান্তরিত হন নাই, তদবধি রাজা বিরাটকেতু আপন কন্যাকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে এক প্রকার অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ভূপেশের দেশত্যাগের পর পুনর্ব্বার স্বাধীনতা দিয়াছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অপ্সরা-সুন্দরী একাকিনী সেই নদীতীরে বটবৃক্ষতলে গমন করেন। যাহাকে দেখিতে যান, তাহাকে দেখিতে পান না। কত দিন কত সন্ধ্যাকালে যে প্রদেশে যুগলমিলনে অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই প্রদেশ অন্ধকার! পূর্ব্বে সেখানে প্রেমবর্ষণ হইত, এখন সেখানে কেবল অশ্রুবর্ষণ হয়। অগত্যা আশায় বুক বাঁধিয়া ফিরিয়া আসেন। এই রকমে আরও এক মাস যায়। অপ্সরার সে শশীমুখে আর সে সরলতার হাসি নাই। সে হাসি যেন চিরজীবনের জন্য ওষ্ঠাধরে মিলাইয়া গিয়াছে, ঠিক এমনি ভাব মনে হয়।

একদিন প্রাতঃকালে রাজা বিরাটকেতু একটী শস্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সহসা কন্যার স্বর্ণ ভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সঙ্গে দুটী প্রিয়তম কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর। রাজা বিরাটকেতু পরস্পর নির্জ্জন সাক্ষাতের এইরূপ অবসরই অন্বেষণ করিতে ছিলেন। ঠিক সুযোগ হইল। যথারীতি অভিবাদন প্রত্যভিবাদনের পর উভয়েই একটী তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইলেন।

কুমার স্বর্গভূষণ কিছু কৃশ। গঠন খর্ব্ব। স্বর অত্যন্ত মৃদু, কথা কহিবার সময় ক্ষণে ক্ষণে স্বর বদ্ধ হইয়া যায়। লক্ষণে বোধ হয়, হাঁপকাশি আছে। কিন্তু অহঙ্কার অত্যন্ত প্রবল। তদ্ব্যতীত কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদে তাঁহার অত্যন্ত আনুরক্তি। সেই ক্ষীণ কলেবরে প্রত্যহ অর্দ্ধনিশা জাগরণ, তীব্র তীব্র মাদকের পরিসেবন, এবং আনুসঙ্গিক অপরবিধ অত্যাচারের অবিরাম স্রোত প্রবাহিত।

ক্ষণকাল অন্যান্য বাক্যালাপের পর বিরাটকেতু গম্ভীরস্বরে স্বর্গভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার! তুমি না কি সেনাদলে প্রবেশ করিতে যাইতেছ?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন, "হাঁ, তাহারাত এই কথাই বলিতেছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সামরিক নিয়োগপুস্তকে তাহারা আমার নাম লিখিয়া লইবে।"

"সেই সময়েই বুঝি তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে?" মুখপানে চাহিয়া ব্যগ্রস্বরে রাজা বিরাটকেতু এই প্রশ্ন করিলেন। এ প্রশ্নের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, বোধ করি পাঠক মহাশয়কে সে কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

স্বর্গভূষণ কহিলেন, "তাহার পূর্ব্বেই আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইব। রাজার ইচ্ছা, সেই দিন নৃত্যগীত, মহোৎসব, ভোজ, অগ্নিক্রীড়া ইত্যাদি মহা ধূম-ধাম করেন; কিন্তু আমি তাহাতে বাধা দিতেছি। কারণ আমি ও সকল নিরর্থক আমোদ ভালবাসি না।"

"ঠিক কথা।" কিঞ্চিৎমাত্র বিবেচনা না করিয়াই বিরাটকেতু টিপ্পনী করিলেন, "ঠিক কথা! আমিও ও সকল বাহ্যাড়ম্বর ভালবাসি না।"

"কেবল আমি বলিয়াও না; আমার জননীও আমার মতে সায় দেন! তুমি বিবেচনা কর দেখি রাজা! আমি এই সুশ্রী যুবাপুরুষ, তাহাতে রাজপুত্র; আমি কি একটা পল্লীগ্রামের কুৎসিৎ কামিনীর সহিত অনাবৃত প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে পারি? আমাকে কি তা শোভা পায়? হয়ত তাহার মুখে পেঁয়াজের দুর্গন্ধও থাকিতে পারে!"

"ওঃ! অবশ্যই থাকিতে পারে। তাহার সহিত নৃত্য করা তোমার কখনই সাজে না।" এইরূপ বাক্যভঙ্গী করিয়া রাজা বিরাটকেতু পুনরায়

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রাজকুমার! কোন্ সেনাদলে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহা তুমি বোধ হয় জান না?"

"না, তাহা জানিবার উপায় নাই। যদবধি নিযুক্ত হওয়া না যায়, নিয়োগপত্রে নাম না উঠে, তদবধি সেটী জানা যায় না। কিন্তু এটী জানা হইয়াছে যে, আমাকে অশ্বারোহীদলে যাইতে হইবে না। আমি পদাতি-দলের সেনাপতি হইব। আরও জানা হইয়াছে, আমাকে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে না।"

"উত্তম। কিন্তু লাল পোষাক পরিধান করিতে হইবে?"

"অবশ্য! নীল পোষাক বড় ভারী। আমি তাহা বহন করিতে পারি না।"

"উত্তম। লাল পোষাকে তোমাকে বেশ মানাইবে। অপর কাহাকেও তেমন মানায় না।" সেই রুগ্ন রাজপুত্রের এইরূপ প্রশংসা করিয়া রাজা বিরাটকেতু একটু ছলের হাসি হাসিয়া পুনরায় কহিলেন, "তোমাকে রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত দেখিয়া রাজ্যের সুন্দরী যুবতী কামিনীরা অন্যদিকে আর নয়ন ফিরাইতে পারিবে না।"

"বল কি রাজা! তুমি কি ঠিক তাহাই বিবেচনা কর? আমি কিন্তু সে পোষাকের অপমান করিব না।"

"তুমি অপমান করিবে কেন? তোমার অঙ্গে উঠিয়া পোষাকেরই অপমান হইবে। ভাল কথা কুমার! আমি শুনিয়াছি, তুমি শিরাজী সরাপ বড় ভালবাস। এ কথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে এক পাত্র গ্রহণ করিলে আমি চরিতার্থ হই।"

কুমার স্বর্গভূষণ একবার ভাবিলেন, অস্বীকার করি। আবার ভাবিলেন, রাজা বিরাটকেতুর পরমসুন্দরী এক কন্যা আছে; এই অছিলায় তাহাকে একবার দেখিয়া লইব। শেষের ভাবটী স্থির করিয়া বিলাস-লোলুপ স্বর্গভূষণ রাজা বিরাটকেতুর সঙ্গে তাঁহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইলেন। যে গৃহে তাঁহারা প্রথম প্রবেশ করিলেন, সেই গৃহে অপ্সরা-সুন্দরী বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতে ছিলেন। সহসা অপরিচিত পুরুষকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে, সলজ্জভাবে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক

মন্থরপদে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, তাঁহার পিতা বাধা দিয়া মিষ্টবাক্যে কহিলেন, "অপ্সরা! লজ্জা কি মা! ইনি আমাদের রাজকুমার। ইহাঁকে দেখিয়া লজ্জা করিতে হয় না। ইনি আর কখন আমাদের গৃহে আইসেন নাই। নূতন অতিথি। যাহাতে ইহাঁর সেবা যত্নের ত্রুটি না হয়, তোমাকেই তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।"

অপ্সরার মন সরিল না। লজ্জার সহিত সুকোমল কপোল যুগলে যেন এক প্রকার রোমরাগ রঞ্জিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এ যে অতিথি, ইনি কিছু হঠাৎ উপস্থিত হন নাই। কোন নিগূঢ় অভিপ্রায়ে তাঁহার পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাকে আনয়ন করিয়াছেন। পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে যে যে কথা হইয়াছিল, অপ্সরাসুন্দরী তাহা ভুলিয়া যান নাই।

অপ্সরাকে তদবস্থায় লজ্জাবতী দেখিয়া প্রকৃতিসিদ্ধ মৃদুস্বরে স্বর্ণভূষণ কহিলেন, "রাজকন্যে! যদি তুমি বিরক্ত হও, তাহা হইলে আমি চলিয়া যাই।"

অপ্সরা অকূলপাথারে পড়িলেন। কি করেন, এক দিকে পিতার অনুরোধ, অপর দিকে অতিথি-সেবার অনুরোধ। সুতরাং কুমারীসুলভ লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া অগত্যা অবনত বদনে আপন আসনে উপবেশন করিলেন। কুমার স্বর্ণভূষণ সুরক্ষিত অপর একখানি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ক্ষণ-কালের জন্য রাজা বিরাটকেতু সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

স্বর্ণভূষণ সর্ব্বদাই শুনিতেন, বিরাটকেতুর কন্যা অপ্সরাসুন্দরী সংসারে অতুল্য রূপবতী। চক্ষে কখনও দেখেন নাই। এই তাঁহার প্রথম দর্শন। কর্ণ যাহা শ্রবণ করিয়াছিল, চক্ষু তদপেক্ষা অধিক রূপ, অধিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিল। রূপ দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন। অপ্সরাসুন্দরী পিতার প্রপীড়নে, রাজকুমার স্বর্ণভূষণের প্রশ্রয় চিন্তা আর সেই—ভূপেশ-চন্দ্রের অনুরাগ চিন্তা করিতেছেন,—জীবনেশ্বর সঙ্গে হৃদয়ের অনুরাগ। কেবল সেইচিন্তা, ভূপেশচন্দ্র কোথায়? বিদায় দান করা হইয়াছে, ভূপেশচন্দ্র বিদেশে গিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়ের অগ্নি নিবিয়া যাইতেছে না কেন? এই কি চিন্তা? চিতায় শবদাহ হয়, দাহ হইলেই নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু তাহাই কি

নির্ব্বাণ ? তা জানি না। নির্ব্বাণ কাহাকে বলে, জানি না। মায়ার নির্ব্বাণ আছে, কে বিশ্বাস করে ? যাঁহাদের পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস, তাঁহারা যে নির্ব্বাণকে অবিশ্বাস করিবেন, ইহা কিছু নূতন কথা নয়।

তুই না আমার কোলে ছিলি মা! দেখি দেখি করিয়া কোথায় তোরে আমি হারাইলাম ?

কোথা ছিলি কোথা গেলি প্রতিমা আমার,
তোরে হারাইয়া হেরি সব অন্ধকার।
যতনের ধন তুই, হৃদয় রতন,—
দিশি দিশি খুঁজি খুঁজি নাহি দরশন।
হৃদয়ের পাখী তুই হৃদে পুষিতাম,
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ শিখায়ে দিতাম।
কেন রে শিকল কেটে উড়ে গেলি পাখি!
আয় রে পিঞ্জরে আয়, মা বলিয়ে ডাকি॥
কোথায় জননী মোর শুনাইয়া দাও।
পাখি রে আমারে তুমি কৃপাদৃষ্টে চাও॥
এ কি রে ভীষণ হেরি ভীষণ শ্মশান!
পালে পালে চরিতেছে গাইতেছে গান,
ফেরুপাল, সারমেয়, এই শান্তি ধামে,
ডাকিছে তোমারে নাথ ! দয়াময় নামে।
এই কি শ্মশানক্ষেত্র ? সমাধির স্থান ?
প্রাণশূন্য প্রাণী যথা শান্ত করে প্রাণ ?
মহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হস্তিনা নগরে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ যথা ভীষণ সমরে,
রণশায়ী ; রণশয্যা করেন আশ্রয়,

এই কি শ্মশান সেই ? হেরি ভয় হয়।
ভয় কেন ? শান্তিধাম কে না ভালবাসে ?
ভবে আসে জীবকুল সমাধির আশে।
আমি কি মরিতে ডরি ? এসেছি মরিতে।
তুমি যাবে আমি যাব স্থির আছে চিতে॥
মহারথী ভীষ্মদেব যে পথের পথী।
যে পথের অনুগামী দ্রোণ মহামতি॥
যে পথেতে কুরুপতি রাজা দুর্য্যোধন।
করেছেন রণক্ষেত্রে অনন্ত শয়ন॥
সেই কি-শ্মশান এই ? শুনে ভয় হয়।
ভয় কেন ? এই ভূমি শান্তির আশ্রয়॥
সংসারে থাকে না শান্তি. শান্তি নিকেতন,
থাকে যদি, আছে কিছু শ্মশান ভবন॥
জীবের সমাধিক্ষেত্র নীরব শ্মশান।
মহা মহা পীড়িতের জুড়াবার স্থান॥
দারুণ যন্ত্রণানলে জ্বলে যায় যারা।
শ্মশানের চিতানলে শান্তি পায় তারা॥
অবীরা বিধবা নারী পতিপুত্রহারা।
অহরহ মায়াপাশে কেঁদে কেঁদে সারা॥
তাহাদের শান্তি দিতে কেহ নাহি আর।
আছে শুধু চিতাবহ্নি, সুধাশান্তি সার॥
শান্তি নিকেতন সেই, সমাধি শ্মশান!
সমস্ত যন্ত্রণা ছাড়ি শান্তি পায় প্রাণ॥
হৃদয়ে ভাবনা করি শেষের সে স্থান।

নমস্কার করি পদে শ্মশান শ্মশান!!
ছোট ছেলে খেলা করে জননীর কোলে।
আয় চাঁদ আয় চাঁদ বলি কোলে দোলে॥
কিন্তু মা কোথায় সেই ছেলেটী তোমার?
হারায়ে তাহারে হেরি হৃদি অন্ধকার॥
দাও মা দেখায়ে দাও বাছারে আমার।
যাহারে না হেরে দহে হৃদয়-আঁধার॥
তুই বুঝি প্রাণাধিকা? কোথা এসেছিস্?
পাষাণপিতারে বুঝি ভুলে গিয়াছিস?
কোথা ছিলি কোথা গেলি জীবননন্দিনি!
তোরে কি ভুলিতে পারি জীবনসঙ্গিনী!
আর মোর কেহ নাই নয়নের তারা!
তোরে হারা হয়ে সতী আমি দিশা হারা।
আয় মা মা খেকো মেয়ে! কোলে তুলি আয়,
কেঁদো না মা, দহিও না, জুড়াও আমায়।

কেহ কথা কহিল না। রাজা বিরাটকেতু কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুই মা কি পিতৃঘাতিনী হইবি? দেখ্ আমার এই পিস্তল, গুলি ভরা প্রস্তুত, যদি তুই না বলিস, এই পিস্তল এইক্ষণে অগ্নিবর্ষণ করিয়া আমার জীবনকে ধূমে ধূমে বাতাসে বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যাইবে।"

উভয়েই নিস্তব্ধ। কে কাহাকে কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এক দিনে যেন আকাশে আর পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ। হইতে ত পারে না, জানি,—পূর্ণিমা আর অমাবস্যা এক তিথিতে হয় না জানি, কিন্তু পিতা দুহিতার মনে ঠিক যেন সেই ভাব।

একটী কবিবাক্য স্মরণ হইল। অনেক দিনের পুরাতন, তবু আজ যেন নবীন নবীন নবীন জীবনের ন্যায় দর্শন করিতেছি। নবীন নবীন

নবীন সেই প্রণয়সঙ্গীত আমার মনে যেন,—প্রাণের সঙ্গে আমার মনে যেন, নবীন নবীন নবীন সুমধুর প্রেম সঙ্গীত-সুধা বিতরণ করিতেছে :

কবির গীত।

সুপর্ব্ব শুভ দিন— সূর্য্য গ্রহণের দিন,
প্রভাসে যজ্ঞ করেন শ্যাম।
শুভ সংবাদ শুনে তাই, নারদের ঠাঁই,
অধিষ্ঠান রাই, কুরুক্ষেত্র ধাম।
শ্যামচাঁদের চন্দ্রাধর, দেখে অনেক দিনের পর,
রাধার হ'লো মানোদয়, প্রেমোদয়, ব্রজের ভাবোদয়,—
বোস্‌লেন প্যারী গরব করে, বদন ঢেকে নীলাম্বরে,
রাহু যেমন চাঁদকে ঘেরে, গ্রহণের সময়;—
রুক্মিণী রাজমহিষী, সেই যজ্ঞ স্থলে আসি,
কৃষ্ণকে হাসি হাসি বোল্‌তেছে;—
বল মদন-মোহন! এমন নূতন নূতন গ্রহণ,
কোথায় কে দেখেছে।
দেখ, দিবাকর ওই, রাহুর ভয়ে শশব্যস্ত,
আবার প্যারীচাঁদ এই, মানে রাহুগ্রস্ত,
গগনে সূর্য্য-গ্রহণ, ভূতলে চন্দ্র-গ্রহণ,
এক দিনে যুগল গ্রহণ হয়েছে।
গোবিন্দ তাই সন্ধ হতেছে।
কে দেখেছে এমন জ্বালা, চন্দ্রগ্রহণ দিনের বেলা,
অমাকলায় পূর্ণকলা, একি সর্ব্বনাশ!
সর্ব্ব গ্রাস! কি হুতাশ, (চক্রপাণি হে)

(দেখ) অরুণের ঘুচ্‌লো গর্ব্ব, রাই চাঁদের কিরণ খর্ব্ব,
অসম্ভব পর্ব্বের পর্ব্ব আজ ঘটেছে।
বনমালি বলি তাই,
তোমায় বলি তাই বলি তাই, বলি তাই,
কাছে যাই কি না যাই;—
পাছে গেলে নিকটে, কুগ্রহ ঘটে,
রাহুচক্রে প'ড়ে মারা যাই।

এ গীত আমার হৃদয় তন্ত্রে সুরে সুরে বাজিতেছে। অপ্সরা! সে লোককে তুমি পরিত্যাগ কর। দীন-দরিদ্র, তাহারে বরণ করিলে আমার উন্নত মস্তক নীচু হইবে। তুমিও সুখী হইতে পারিবে না। আমি যাহারে তোমার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া আদর করিতেছি, সে তোমারে অদর্শনে ভালবাসে। দর্শনে, কি অদর্শনে তুমি জান, সে জানে, কিন্তু বড় লোক। তাহাকে পাণি দান করিলে তুমি বড় লোকের কাছে আদরিণী হইবে। রাজরাণীর মত গৌরবিণী হইয়া পরম সুখে থাকিবে। সংসারের অগ্রাহ্য দীনহীন পামরকে পরিত্যাগ কর।"

"পিতা! পিতা! তাহা আমি পারিব না। এক দিন এক রাত্রে,—সহস্র দিন সহস্র রাত্রে, নারায়ণ সাক্ষী করিয়া যাহারে আমি হৃদয়দান করিয়াছি, পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, তাহাকে আমি কদাচ ভুলিতে পারিব না।"

"অপ্সরা! তুই মা মাতৃহীনা। পিতার অবাধ্য হইয়া যদি এক জন নীচ লোককে বরণ করিস্, তাহা হইলে আমার কুলে কলঙ্ক হইবে। জানিয়া শুনিয়া পিতার বাক্যের অবাধ্য হইলে আমি আর পৃথিবীতে থাকিব না। এই দেখ, আমার হাতে পিস্তল। যদি আর একটী বার বল, ভূপেশচন্দ্র আমার, স্বর্ণভূষণ কেহ না, তাহা হইলে এই পিস্তলের গুলি এই দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তে, আমার জীবন হরণ করিবে।"

"পিতা! আমারে ক্ষমা কর। আমি অপরাধিনী কন্যা হইব না।

শৈশবাবধি যাহারে ভালবাসিয়াছি, প্রাণে প্রাণে যাহারে আমি প্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছি, সেই ভূপেশ আমার কণ্ঠমালা, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহাকেও আমি বরণ করিতে পারিব না। আমার বলিয়া আর কাহাকেও আমি স্বীকার করিতে পারিব না। তুমি আনিয়াছিলে, দেখিয়াছি। কিন্তু আমার চক্ষু, ফিরিয়া চায় নাই। মানব মানবীর চক্ষু আপনাদের মুখ আপনারা দেখিতে পায় না। মুখে থাকে, তথাপি মুখ দেখাইয়া দেয় না। আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিব না। জান তুমি, হৃদয়ের চক্ষু নাই, আমি জানি, হৃদয়ের চক্ষু আছে। সর্ব্ব শরীরের চক্ষু আছে। যে চক্ষু যাহারে দেখে, সে চক্ষু তাহারেই ভাবে। হৃদয়ে তাহার ছায়া পড়ে। পবিত্র চক্ষু প্রবঞ্চনা জানে না। পিতা! রাজপুত্রে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। দরিদ্র-কুটীরে বাস করিব, উপবাস করিয়া প্রাণধারণ করিব, তথাপি প্রাণের বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অপর কাহাকেও অঙ্গীকার করিব না। যদি কপালে থাকে, সেই ভূপেশচন্দ্রই আমার রাজপুত্র হই-বেন।"

"অপ্সরা! সত্যই কি তুই পিতৃঘাতিনী হইবি? আচ্ছা! থাক্ তুই! জগৎ-পিতা সাক্ষী, চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ তারা সাক্ষী, জগতের জীবকুল, বৃক্ষলতা সাক্ষী, আমার প্রতিজ্ঞা অচল, অটল। মা! মা! অপ্সরা! তুই আমার প্রাণাধিকা দুহিতা। যাহার হস্তে অর্পণ করিয়া জগতে আমি সুখী হইতে পারিব, তুই তাহাতে বাধা দিতেছিস্। তোরে আমি দীনহস্তে সম্প্রদান করিব না। তুই——"

"আমিও অপরের হস্তে অর্পিত হইবনা। পিতা! তুমি জান, স্বর্গভূষণ রাজকুমার। তুমি জান, ভূপেশচন্দ্র দরিদ্র-সন্তান। কিন্তু সময়ে আমার সেই ভূপেশচন্দ্র যদি রাজপুত্র হয়, তবে সেই বনফুলের মালা, কোন্ কুস্থানে আমি ছড়াইয়া ফেলিব? মালা আমি গাঁথিয়া রাখিয়াছি। কাহাকে পরাইব, কাহার গলায় দুলাইয়া সেই মালাকে আমি মনোমালা বলিয়া আদরিণী হইব, কেবল আমিই তাহা জানি।"

"জানিস্ তুই সর্ব্বনাশি! তোর গর্ভধারিণী স্বর্গবাসিনী হইয়াছে। আমি তোর জন্মদাতা রক্ষাকর্ত্তা। আমার কথার অবশবর্ত্তিনী হইয়া যদি আমার

তুই সর্ব্বনাশ করিস্, তাহা হইলে একটু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, পিস্তলের গুলিতে এই জীবনেব অন্ত কব্বিব!'''

পাঠক মহাশয়! স্মরণ রাখিবেন, পিস্তলে গুলি পোরা ছিল না। শূন্যে শূন্যে বক্তচক্ষে কেবল ভয়-প্রদর্শন মাত্র।

অপ্সরাসুন্দরী উদাস নয়নে পিতার মুখপানে চাহিয়া অনবরত অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নেত্রবাষ্প, কণ্ঠবাষ্প এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে, সুললিত ললনা-রসনা একটীও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিল না। অল্প বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় পিতার চরণতলে নিপতিতা হইয়া অভাগিনী তনয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গদ্গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভিক্ষা! ভিক্ষা! পিতা! করুণা ভিক্ষা! দুঃখিনী কন্যাকে ক্ষমা কর। আমার গর্ভধারিণী জননী আমার অজ্ঞানে জগৎসংসারকে অন্ধকার দেখাইয়া জগৎসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। জগৎ একপ্রকাব আমার চক্ষে শূন্যময়, অন্ধকারময়। সূর্য্য আমারে আলো দিতে পারেন না, চন্দ্র আমারে আলো দিতে পারেন না,-আলো আছ, এক মাত্র তুমি। তুমিই আমার মহা অন্ধকারের একটী মাত্র প্রদীপ। নিরাশা ঝড়ে যদি এই এক মাত্র প্রদীপ নিবিয়া যায়, তাহা হইলে এই অনাথিনী অপ্সরাসুন্দরীর কৃষ্ণতারকা-যুক্ত নিরর্থক নয়ন চতুর্দ্দিকে আব কি দেখিতে পাইবে? দিশি দিশি নক্ষত্র জ্বলে, দিশি দিশি জোনাকি পোকা উড়িয়া বেড়ায়, দিশি দিশি মানবকুল, পশুকুল, পক্ষীকুল সঞ্চারণ করে, অপ্সরার চক্ষু তাহা ত দেখে না। দেখে কেবল তোমাকে। দীপনির্ব্বাণ করিয়া যদি তুমি অন্তরে চলিয়া যাও, জগতে কেবল অপ্সরার নাম মাত্র থাকিবে। অপ্সরা থাকিবে না। মিনতি করি, ঐ প্রাণঘাতক অস্ত্র সম্বরণ কর। জন্মাবধি এখনও আমি কলঙ্কিনী হই-নাই। উঃ! একেবারে পিতৃঘাতিনী! না, না, পিতা! অপ্সরাসুন্দরী পিতৃ-ঘাতিনী হইবে না। উঃ! কথা কি অসহ্য! কল্পনা কি অসহ্য! আমার চক্ষের জল কোথায় গেল! চক্ষে আমার নদী ছিল; একেবারে পাষাণ! পিতা! এই অভাগিনী কন্যাকে আরও আরও অভাগিনী করিয়া তুমি এই মায়াধাম পরিত্যাগ করিও না। একজনকে আমি ভালবাসিয়াছি, মায়ার উপদেশে সেই আমার ভালবাসাপাত্র হৃদয়সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে। কিন্তু পিতা!

মায়াদয়া কেবল মাতাপিতার হৃদয়ে অবিচ্ছেদে বাস করে। সে মায়াদয়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তুমি যদি এই অভাগিনীরে পরিত্যাগ করিয়া যাও, সংসারে অভাগিনীর তবে আর কি প্রয়োজন? চরণধারণ করিয়া মিনতি করি, সাংঘাতিক অস্ত্রের প্রতিসংহার কর!"

গাত্রবসনে পিস্তল গোপন করিয়া কপট গাম্ভীর্য্য সহকারে রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "আমার পুত্র নাই। তুই মা আমার সর্ব্বময়ী কন্যা। তুই যদি আমার অবাধ্য হইয়া অপাত্রে ন্যস্ত হইবার প্রতিজ্ঞা করিস্, তাহা হইলে জীবনে আমার কি প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন? তোমার জীবনে যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার জীবনে কি প্রয়োজন?"

"দুঃখে বড় হাসালি সতি! যে কথা আমি বলিতেছি, যে অঙ্গীকার আমি করিতেছি, সে কথায়, সে অঙ্গীকারে তোমার ছাড়া ছাড়া প্রতিজ্ঞা,"

"না পিতা! তোমার কথায় আমার ছাড়া ছাড়া প্রতিজ্ঞা নাই। কেবল একটী মাত্র ভিক্ষা, চরণে আমার একটী মাত্র প্রার্থনা, বিশাল রাজ্যের রাজা তুমি, আমার হৃদয়রাজ্যের একজন রাজা আছে, তাহারই কারণে অনুমতি ভিক্ষা।"

"পাপীয়সি! আবার সেই কথা? কুল কলঙ্কিত করিলি? যে কথা স্মরণে শিরায় শিরায় আমার হৃদয় জলিয়া যায়, পলকে পলকে, লহমে লহমে যে কথা আমাকে স্তবকে স্তবকে দগ্ধ করে, সেই কথা পুনর্ব্বার?"

"না পিতা! সেই কথাই আমার এক কথা।"

"তবে সর্ব্বনাশি! প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আমারে নিবারণ করিতেছিস্ কেন?"

"চক্ষে দেখিতে পারিব না। সংসারে যাহার কেহ নাই, সংসার যাহার চক্ষে অন্ধকার, সে অভাগিনী কি ইচ্ছা করিয়া জগতের একমাত্র পূজনীয়, জন্মদাতা পিতাকে নিজের জন্য অকালে বিদায় দান করিতে পারে?"

কপটে ক্রোধ গোপন করিয়া রাজা বিরাটকেতু বিত্রস্ত গম্ভীরস্বরে অতি সংক্ষেপে কহিলেন, "প্রাণাধিকা দুহিতা বশীভূত থাকিলে অভাগা

পিতা কখনও স্বইচ্ছায় জীবন পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করে না। কিন্তু মা! তোর এই অভাগা পিতা কি তোরই জন্য স্বইচ্ছায় জীবন পরিত্যাগ করিবে?"

"পিতা! স্বইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, তাহা আমি জানি না, কিন্তু পিতা! মাতৃহারা অপ্সরাসুন্দরী তোমারে না দেখিলে জগৎসংসার অন্ধকার দেখে। তুমি পৃথিবীতে আছ, সেই জন্যই আমি পৃথিবীতে আছি। রাজা! আমি রাজকুমারী। রাজকুমারী হইয়া এমন অনাথিনী হইতে হইবে, তাহা জানিতাম না।"

"দূর্ সর্ব্বনাশি! এখনও তুই রাজকুমারী বলিয়া অহঙ্কার করিস্? আমি অভাগা—"

"কেন পিতা তুমি অভাগা বলিয়া ক্রন্দন কর?"

"তোমারি জন্য।—তুমি ———"

"আমি? আমি তোমার আদরিণী তনয়া। তুমি আমার আরাধ্য দেবতা। কিন্তুঃ—

তব আশীর্ব্বাদে পিতা! চরিতেছি এ সংসারে।
আর মোরে কাঁদায়ো না, মিনতি করি তোমারে॥
জগত আরাধ্য ধন, জনকেরি শ্রীচরণ,
চরণ শরণ করি বাঁচিতেছে এ জীবন।
পিতা গো চরণে ধরি, শ্রীচরণে ভিক্ষা করি,
মিলাইয়ে দেহ তারে, প্রাণে ভালবাসি যারে।"

"সর্ব্বনাশি! আমারে দগ্ধ করিবার জন্যই কি তোর জন্ম হইয়াছিল? অঙ্গারে অঙ্গারে অগ্নি উৎপত্তি হয়, লৌহে পাষাণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, বিনা অগ্নিতে পর্ব্বতের গায়ে অনল প্রজ্জ্বলিত হয়, কিন্তু মানুষের বুকে যে আগুন জ্বলে, তাহার উৎপত্তিস্থান কোথায়?"

রাজা বিরাটকেতু মূর্খ। তিনি একটী ছোট মেয়েকে আগুনের কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। আগুনের কোথায় জন্ম, কোথায় স্থিতি, কোথায় লয়, বিরাটকেতু তাহা জানেন না। তুমি আমি সকলেই জানি, জল দিলেই আগুন নির্ব্বাণ হইয়া যায়; কিন্তু জলরাশি যে সমুদ্র, তাহার ভিতরে আগুন জ্বলে কেন? সমুদ্রকে পুড়াইবার জন্য।—আহা! শীতল জলনিধি! তোমাকে পোড়াইতে পারে কে? হৃদয়ে তুমি বাড়বানল

ধারণ কর। মূর্খ নরপতি বিরাটকেতু তোমার শীতল মহিমা জানেন না। মহাপ্রলয়ে বিষ্ণু যখন বটপত্রে ভাসিয়াছিলেন, রত্নাকর! তখন তোমার বাড়বানল তাঁহারে দগ্ধ করিতে পারে নাই। সূর্য্যের উত্তাপে, অনলের উত্তাপে তরুচ্যুত পল্লব বিশুষ্ক হয়। আমার কাছে একটী পাতা আছে, আমি তাহাকে সবুজবর্ণ দর্শন করিতেছি; কখন্ কোন্ ভাবে থাকে, মিলাইয়া দেখিবার জন্য, দিনে দিনে সেই দিকে দৃষ্টি রাখি। কখন্ ম্লান হয়, কখন্ বিবর্ণ হয়, কখন শুষ্ক হয়, উপযুক্ত ক্ষণে তাহা পরীক্ষা করি। কন্যা একটী গাছের পাতা। তাহার মনের ভাব কখন্ কিরূপ হয়, রাজা বিরাটকেতু তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিলেন না। কখন্ কথা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা হয় ত তাঁহার স্মরণ নাই। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আকাশের নক্ষত্রেরা উজ্জ্বল চক্ষু বিস্তার করিয়া কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকে দিশি দিশি অন্বেষণ করিতেছে। কি মাস, কে জানে? সব কথা মনে পড়ে না,—কিন্তু অল্প অল্প শিশির পড়িতেছে। ধরাতলে কৌমুদী নাই। জলে কুমুদিনী ফুটিয়াছে, ছুঁড়ী বড় নির্লজ্জ! কুমুদ পতি-বিরহ। তথাপি কুমুদিনী জলে ভাসে, জলে হাসে। প্রকৃতির কন্যা। ভর্ৎসনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের অপ্সরাসুন্দরী জগৎকান্তিপ্রদায়িনী পদ্মিনীর মত সুশীলা। সূর্য্যকে না দেখিলে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয় না। দিনমানে সূর্য্য যদি মেঘে ঢাকা থাকেন, তথাপি পদ্ম জানে দিন। সূর্য্য অস্ত হইলে কমলিনীর হাসি থাকে না। কিন্তু চাঁদের অভাবে কৃষ্ণপক্ষে কুমুদিনী ফুটিয়া থাকে। সংসারে এমন বিপর্য্যয় আমরা দেখিতে ভাল বাসি না। দেখিতে হয় দেখি, কিন্তু মনে বড় কষ্ট হয়। অপ্সরাসুন্দরীকে দেখিয়া কষ্ট হইতেছে। দস্যু-পিতা, পবিত্র কন্যা, নিশাকালে উভয়ে একত্র।

রজনী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ক্ষণকাল যেন কি চিন্তা করিয়া বিরাটকেতু কহিলেন, "অপ্সরা! আমি আর দেশে থাকিব না। বাঙ্গালা দেশে জগন্নাথক্ষেত্র নামে একটী তীর্থ আছে। তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি সেই তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিব। এই আমার সংকল্প। তোমার কি তীর্থযাত্রায় ইচ্ছা আছে?"

"আছে, কিন্তু একাকিনী যাইতে মন সরে না।" কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, বিরাটকেতু কহিলেন, "একাকিনী কেন মা! আমার সঙ্গে যাইবে।"

কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "জগন্নাথ দর্শনে আমার অভিলাষ আছে। তুমি যদি লইয়া যাও——"

"যদি যাই, রজনী প্রভাতে।"

পিতা পুত্রী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষে নিদ্রায় কি অনিদ্রায়, চিন্তায় কি অচিন্তায় রজনী যাপন করিলেন। কেহ বাধা দিল না। স্বপ্ন আসিল না।

উষা আসিয়াছে। ছি মা! তুই কি উলঙ্গিনী! না তো, ধূম্রবর্ণ বস্ত্র পরিধান। ধূম্র বর্ণ মূর্ত্তি, ধূম্রবর্ণ মুখ। কে মা তুই? যদি উলঙ্গিনী না, তবে পাখীরা তোরে দেখে ছি ছি করে কেন? ঐ যা! ঐ গেল! অন্ধকার পলাইয়া গেল! কাকেরা কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিল। কাকেরা আগে হিন্দুস্থানী খোট্টা ছিল। প্রভাতের অগ্রে কাঁহা কাঁহা বলিয়া চীৎকার করিত। এখন বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা বুলিতে,—"কা কা"! কিন্তু অপ্সরা-সুন্দরী ত বাঙ্গালা দেশে নাই। তবে "কা কা" শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল কেন? বিরহ-বিধুরা অবলার কর্ণে সকল কথা সুস্পষ্ট প্রবেশ করে না। সেই জন্য।

"জাগিয়াছ? বেলা হয়। এই লগ্নেই যাত্রা করিতে হইবে।"

নিদ্রা আর জাগরণ। যাহার নিদ্রা নাই, তাহার জাগরণ কি? অপ্সরা জাগিয়া ছিলেন, উত্তর করিলেন, "প্রস্তুত।"

সিঁড়িতে মানুষের পায়ের শব্দ হইল। অপ্সরা-সুন্দরী গৃহের দরজা খুলিয়া দিলেন। চিবুকে হস্তার্পণ করিয়া রাজা বিরাটকেতু প্রাণাধিকা দুহিতাকে একটী চুম্বন করিলেন: হস্তে হস্তে চুম্বন।

অপ্সরার সজ্জা অপূর্ব্ব। কবরী ছিল না, পৃষ্ঠ দেশে বিলম্বিত বেণী। ঢুলু ঢুলু চক্ষু,—নিশা জাগরণে কমল আস্যদেশ প্রভাকর বিরহিত নলিনীর মত বিম্লান। পরিধান একখানি রক্ত বাস। হস্তে সুবর্ণ বলয়। কর্ণপার্শ্বে অলক। অলকপার্শ্বে দুকাণে দুটী কুণ্ডল। মূর্ত্তি তেজস্বিনী। হস্তে বস্ত্রাবৃত কি বস্তু, পিতা দেখিলেন না, আমরাও জানিলাম না।

পিতা পুত্রী উভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শুভক্ষণে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। মনে আশা আছে, সর্ব্বার্থসিদ্ধি। পিতার আশা,—স্বর্গভূষণ। দুহিতার আশা,—ভূপেশচন্দ্র। উভয়েব আশা, ছল, কপটতা, শঠতা। (শ্রীবিষ্ণু!) অপ্সরাতে ছল, কপটতা, শঠতার লেশ নাই। কিন্তু পিতাতে সম্পূর্ণ বিদ্যমান। শ্রীক্ষেত্রযাত্রা। মনের আশা মনেই আছে; মনে মনে তাঁহারা ভাবিতেছেন, আশা একবার চক্ষের কাছে নৃত্য করিবেন। আছেন কোথায়, জানিতে পারা যায় না। কমলার মত তিনিও চপলা। যাত্রা করিতে করিতে অপ্সরা-সুন্দরী মনে মনে ডাকিলেন :—

এসো মা হৃদয়াকাশে আশা অমর-সুন্দরি!
উর হৃদিপদ্মাসনে শ্রীপদে প্রণতি করি॥
যাই গো মা দেশান্তরে, ডাকি তোরে সকাতরে,
আশা কল্পতরু তলে, সদা আকিঞ্চন করি।
সে তরু পাইবে যথা, জড়ায়ে ধরিবে লতা,
মানসে প্রেমেরি কথা, কহিবে স্থর-সুন্দরী।
তুমি আশা মায়াবিনী, আমি প্রেম কাঙ্গালিনী,
ওমা বিশ্ব-বিমোহিনী, পূর্ণ কর আশঃ—
প্রাণে যারে ভালবাসি, যারে দেখিবারে আসি,
দেখাইয়ে দেহ তারে, তোমারি চরণে ধরি।
তুমি দেবী মহামায়া সংসারেরি সার।
তোমারি চরণ-পদ্মে কোটি নমস্কার॥
দীন হীন অকিঞ্চন দীন দয়াময়ী।
তোমারি করুণা ভিক্ষা করি কৃপাময়ী॥

পঞ্চবিংশ প্রবাহ।

জগন্নাথক্ষেত্র।

"শেষঃশয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ।
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূত মুরারিঃ॥

কাব্য সংগ্রহ।

তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি দীননাথ!
প্রণিপাত করি পদে যুড়ি এই দুটী হাত॥
অকূল কাণ্ডারী তুমি, সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানে।
রক্ষা কর রক্ষাময়! রক্ষ ভব তুফানে॥
যার তরে তীর্থবাসী সে আমার কোথা হে!
পাইব কি দীনবন্ধু তব পদ কৃপা হে।
মনে মনে যারে আমি সঁপিয়াছি জীবন।
দেখাও কমলাকান্ত সেই মম প্রাণধন।
সমুদ্র গর্জ্জন ভয়ে বুকে করি রাখিয়া।
লুকায়েছ সুভদ্রারে, প্রিয় ভগ্নী ভাবিয়া॥
আমি হে চরণদাসী রক্ষা কর আমারে,
অগতির গতি তুমি জানি আমি তোমারে॥
বিপদে পড়েছি নাথ! বিপদকাণ্ডারী হে!
চরণেরি দাসী আমি একান্ত তোমারি হে।
দ্রৌপদীর লজ্জা রাখ, তুমি লজ্জা নিবারণ।
দাসীরে করুণা করি দেহ নাথ শ্রীচরণ।

পিতাপুত্রী উভয়েই জগন্নাথক্ষেত্রে। কি অভিপ্রায়ে বিরাটকেতু তাহা জানেন, অপ্সরাসুন্দরী তাহা জানেন না। মতিয়া প্রথমে নিষেধ করিয়াছিল, জন্মশোধ বিদায় হইতেছি বলিয়া সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পিতার সহিত অভাগিনী অপ্সরা গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। এখন সেই কথা মনে হইতেছে। কে যেন কাণে কাণে কথা কহিতেছে, পরামর্শ বলিয়া দিতেছে, অপ্সরা যেন একটী দৈব বাণী শুনিলেন, কে আসিয়া যেন তাঁহার পবিত্র হৃদয়কে আকুলিত করিয়া তুলিল। সাগরে তরঙ্গ হয়, নদীতে বান্ আসে, অপ্সরার হৃদয়-সাগরে তরঙ্গ আর বান উভয়ই এক সঙ্গে খেলা করিতে লাগিল। দারুণ সংশয়। যে যাত্রাকে শুভ যাত্রা মনে করিয়াছিলেন, সে যাত্রা যেন তখন অভাবনীয় কু যাত্রা জ্ঞান হইতে লাগিল। বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। পিতার মনে কি আছে, স্পষ্ট জানিতে পারিলেন না; তথাপি প্রিয়চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে বিহ্বল হইতে লাগিলেন।

বিরাটকেতু কহিলেন, "তুই কি মা পিতার অবাধ্য কন্যা হইয়া, অস্থিতে অস্থিতে, চর্ম্মে চর্ম্মে, শিরায় শিরায় পিতাকে দগ্ধ করিবি?" গম্ভীর ভাবে এই কটী কথা বলিয়া পুনর্ব্বার আরও স্থির সঙ্কল্পে আরো "গম্ভীর ভাবে কন্যাকে কহিলেন, "প্রাণাধিকে! আমার একটী মনের কথা আছে; সে কথা আমি আজ অসংশয়ে প্রকাশ করিব। অন্যমনস্ক হইও না, অন্য-দিকে মন রাখিও না, আমি তোমার পিতা, যাহা বলি, স্থির কর্ণে এক মনে শ্রবণ কর। আগে সাবধান করিয়া রাখি, অবশীভূত তনয়া হইও না। শোন! এমন একটী কথা শুনিবে, নূতন কথা, শুনিবা মাত্র তোমার হৃদয় চমকিয়া উঠিবে; শুনিবার জন্য প্রস্তুত হও। এত দিন যাহা আমি চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা আর রাখিতে পারিলাম না; মনের কথা, মনের ইচ্ছা আজ আমি প্রকাশ করি। ভূপেশচন্দ্রকে তুমি ভালবাস। জান তুমি সে কে? ভিকারী-সন্তান। দরিদ্র-কুলের কুলাঙ্গার। সে আশা পরিত্যাগ কর। শোন অপ্সরা! স্নেহপুতলি কুমারী-বদন দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইবে না। আমি সংকল্প করিয়াছি, আমি

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্বর্গভূষণের হস্তে আমি তোমারে সমর্পণ করিব। পিতার অনুরোধে তুমি স্বর্গভূষণকে পাণি দান কর।"

"না পিতা! কখনই না! মনে মনে যাঁহারে আমি হৃদয় দান করিয়াছি, তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া, আর কাহাকেও আমি মনে ভাবনা করিতে পারিব না।"

"অপ্সরা! তুমি কি তোমার পিতার অভিসাপকে ভয় করো না? কত দিন পূর্ব্বে আমি তোমারে একটী কথা বলিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার মনে আছে? স্বর্গভূষণ তোমারে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার নামের পত্রের মধ্যে সেই পত্রখানি ছিল; প্রাপ্ত মাত্রে তোমায় অর্পণ করি, তাঁহার সেই ইচ্ছা। কিন্তু অপ্সরা। মনের নানা উপদেশে নানা কারণে তখন আমি তোমারে তাহা দিই নাই, দেখাই নাই; এখন দেখ, পাঠ কর।"

অপ্সরাসুন্দরী মস্তক সঞ্চালন করিলেন, উৎসাহিত ভাবে নয়, উত্তেজিত ভাবে নয়, সুস্থির প্রশান্ত ভাবে। কবিরা ধৈর্য্য আর সহ্য গুণকে সমরের অস্ত্র বলিয়া বর্ণনা করেন, মনোভাবে কখন কখন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই ভাবের নাম সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। পিতার বাক্য শুনিয়া অপ্সরাসুন্দরী সেই সময়ে সেই অস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হা পরমেশ্বর! এই কথা কি আমারে শুনিতে হইল?"

রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "বালিকা-হৃদয়ে কি স্নেহভক্তি থাকে না?"

"থাকে, কিন্তু থাকিতে পায় না। ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর! পিতা! তুমি অমন কথা বলো না। চরণ ধারণ করিয়া মিনতি করি, আমারে ক্ষমা কর।"

"অপ্সরা! তুই কি মা আমারে পাগল করিয়া দিবি? আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, স্বর্গভূষণকে———"

"কি পিতা! আবার কি কথা বলিতেছ? ও নাম আমার পক্ষে অভিসম্পাত। তিক্ত, তিক্ত বিষাক্ত অভিসম্পাত।"

"অপ্সরা! যদি তুমি সেই স্বর্গভূষণকে পতিত্বে অঙ্গীকার না কর,

তাহা হইলে আমার অভিসম্পাত,—তোমার পিতার অভিসম্পাত, মর্ম্মে মর্ম্মে তোমারে দগ্ধ করিবে।"

"আর যদি দগ্ধ হইবার পূর্ব্বে আমার প্রাণবায়ু উড়িয়া যায়, তাহা হইলে পিতা! তোমার অভিসম্পাত কোথায় দাঁড়াইবে? কন্যাকে তুমি অভিসম্পাত কর, সে অভিসম্পাত আকাশের বাতাসে মিলাইবে।"

"অপ্‌সরা! আমার অভিশাপ জলে, অনলে, পর্ব্বতের গুহায়, নিবিড় বিজন অরণ্যে কালসর্প রূপে প্রবেশ করিতে পারে। মহানদী শুকাইয়া দিতে পারে। অগাধ জলনিধিকে জলশূন্য করিতে পারে। তোমার অভাগা জীবন,—জীবনের কি ক্ষুধা আছে?—তোমার সেই ক্ষুধার্ত্ত অভাগা জীবন, আমার অভিসম্পাত বহন করিয়া জগতের বাহিরে কোথাও চলিয়া যাইতে পারিবে না। দেখো, দেখো, দেখো, পাপীয়সি! দেখো, দেখো দেখো সর্ব্বনাশি! দেখো প্রাণাধিকে! আমার এই লৌহ পিস্তলে সাংঘাতিক প্রাণঘাতক গুলি পোরা!"

"হা পরমেশ্বর!" অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া, ভূমিজানু অপ্‌সরা-সুন্দরী কহিলেন, "হা পরমেশ্বর!"—ঊর্দ্ধ দৃষ্টে অভাগিনী পুনঃপুন কহিলেন, "হা পরমেশ্বর! ভবিষ্যৎ জগতে আমার তবে কি দশা! শৈশবে আমি মাতৃহারা হইয়াছি, অজ্ঞান বালিকারে পরিত্যাগ করিয়া জননী আমার স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন, এখন যদি পিতা আমারে পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে আমি দাঁড়াইবার স্থলকূল পাইব কোথায়? পিতা! পিতা! তোমার এই কন্যা জন্মাবধি অভাগিনী।"

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, পিস্তলে গুলি পোরা ছিল না। শুদ্ধ কেবল ভয় দেখাইবার জন্য কন্যাব প্রতি শূন্যগর্ভ শাসন বাক্য। কন্যার কাতরোক্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দুর্জ্জন বিরাটকেতু বারম্বার কহিতে লাগিলেন, "হলি তুই, হলি তুই, হলি তুই পিতৃঘাতিনী।"

"হা দয়াময় জগদীশ! আমার দশা কি হইবে?" জানুযুগলে মস্তক অবনত করিয়া, যুগল হস্তে যুগল চক্ষু আবরণ করিয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে হতভাগিনী আক্ষেপ-বাক্যে পুনরায় উচ্চারণ করিলেন, "হা দয়াময় জগদীশ! অদৃশ্য হইয়াও তুমি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, চক্ষু নাই, তথাপি

ব্রহ্মাণ্ড দর্শন কর, কর্ণ নাই, তথাপি ব্রহ্মাণ্ডের বাক্য শ্রবণ কর, অবলার হৃদয় তুমি দেখিতে পাইতেছ, অবলার বাক্য তুমি শুনিতে পাইতেছ, এখন বল দেখি জগৎ-পিতা! আমার দশা কি হইবে?”

বিরাটকেতুর পিস্তলে গুলি নাই। সেই শূন্যগর্ভ অস্ত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আরক্ত নয়নে রাজা বিরাটকেতু কুমারীকে কহিলেন, “মাটিতে পড়িয়া থাক কেন? উত্থান কর। অবাধ্য কুমারীকে সম্মুখে দেখিয়া, দয়ামায়া, স্নেহমমতা আমারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। মাতৃহীনা বালিকা! তোর প্রাণে, তোর গাত্রে আমি আঘাত করিব না। আমি নিজে,—অভাগা আমি,—আমি নিজে, অগ্নিক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া ইহ-জীবনের মত ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিব। রাজপুত্র স্বর্গ-ভূষণ,—এই গৃহের প্রাচীরের অভ্যন্তরে তিনি বিদ্যমান আছেন। সম্বন্ধপত্র সুস্থির হইয়াছে। এখন কেবল তোমার একটী কথা শুনিতে বাকী। হাঁ কি না। তুমি সেই রাজকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী হইবে কি না? তোমার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি, যেন সেই কুকুরের প্রতি তুমি অনুরাগিণী। কিন্তু অভাগিনি! তুমি বুঝিতেছ না, এই মুহূর্ত্তে তোমার কর্ণে তোমার পিতার জীবনের অন্তিমঘণ্টা নিনাদিত হইবে।”

যে কথা মুখে বলা যায় না, লেখনীমুখে যে কথা লিপিবদ্ধ করা যায় না, চেহারায় যাহা দেখান যায় না, চিত্রকর যাহা চিত্র করিতে পারে না, কোন দেশের কোন ভাষায় যাহা পরিব্যক্ত হয় না, মানব-সংসারের মানব-হৃদয়ে যাহার ছায়া পড়িতে পারে না,—সংশয়ে, উৎসাহে, কোন রঙ্গভূমে যাহার অভিনয় হইতে পারে না, এমনি একটী ভয়ঙ্কর বস্তু আছে, সেই বস্তু আজ অপ্সরাসুন্দরীর হৃদয়ে। উদাসনয়নে পিতৃমুখ নিরীক্ষণ করিয়া পরিস্ফুট বাক্যে পরিতাপিনী প্রশ্ন করিলেন, “সংসারে এমন কে আছে, যে আমার হৃদয় দেখিতে পায়? অভাগিনী অনাথিনীর পিতা! তুমি কি আমার হৃদয় দেখিতে পাইতেছ? পাষাণনন্দিনী ভগবতী গঙ্গা, যে পাষাণ সেই পাষাণ, কিন্তু গঙ্গা জলময়ী! আমাকেও তুমি ঠিক সেইরূপ জান। তোমার হৃদয়ে মমতার লেশমাত্র না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যেন দেখিতেছি, চক্ষের জল যেন আমারে অহরহ দেখাইয়া দিতেছে, যদিও

অভাগিনী, তথাপি এই অভাগিনী হৃদয় স্নেহ-মমতা মাখা। তুমি দেখিতেছ পিতা! আমি তোমার চরণতলে। যন্ত্রণা একটী আগুন। সেই আগুন আমারে দগ্ধ করিতেছে, তথাপি আমি পিতৃভক্তি ভুলিয়া যাইতে পারিতেছি না। যাহা বলিতেছ, তাহাও স্বীকার করিতে পারিতেছি না।" কথা কহিতে কহিতে, শশীমুখীর শশীমুখখানি ম্লান হইয়া আসিল। কৃষ্ণ পক্ষ নয়, শুক্ল পক্ষ। তথাপি,—তথাপি চন্দ্রমুখ পাণ্ডুবর্ণ। যুগল নয়নে অবিরল বারিধারা। যে মুখে, যে ওষ্ঠে, যে রসনায়, এতক্ষণ বাক্যসুধা পরিবর্ষিত হইতেছিল, সেই মুখ, সেই ওষ্ঠ, সেই রসনা এখন নীরব।

রাজা বিরাটকেতু গম্ভীর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন, "অপ্সরা! তোমার মীমাংসা? কথা কও। আর সময় হারাইবার সময় নাই। কুমার স্বর্গভূষণ তাচ্ছিল্যের পাত্র নয়।"

"পিতা! আমি অর্দ্ধ উন্মাদিনী হইয়াছি, আর আমারে পাগলিনী করিও না। দেহে বিদ্যুৎ প্রবেশ করিলে মানুষ যেমন অনিচ্ছাবশেও নাচিয়া উঠে, অপ্‌সরা যেন সেইরূপ বিদ্যুৎ বেগে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য দেখা গেল না। কিন্তু অলক্ষিতে তাঁহার অন্তঃকরণ যেন তালে তালে নাচিতে লাগিল। চপলার খেলা বড় চমৎকার। ঘোরতর মেঘে যখন জগৎ অন্ধকার করে, তখন হাসিয় হাসিয়া চপলা আসিয়া মানুষের চক্ষে একটী চমৎকার দীপ্তি বিকাশ করে। সেইরূপ চপলা হাসি হাসিয়া, অপ্‌সরা-সুন্দরী কহিলেন, "আমার স্বর্গ-বাসিনী জননী, মহাদেবীর নাম স্মরণ করিয়া আমি তোমারে বলিতেছি, পাপাচার পরিহার কর। না, না, পিতা! তাহা তুমি পারিবে না। উঃ! ইহা ভয়ঙ্কর অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর! ওঃ! যদি তুমি আত্মহত্যার কথা বল, তাহা হইলে আমি,—আমিই সেই মূর্ত্তিমতী, আত্মহত্যা স্বরূপিণী পিতৃঘাতিনী অপ্‌সরাসুন্দরী।"

"কুমারি! আর না। এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে, সজোরে তনয়ার হস্তধারণপূর্ব্বক শার্দ্দূল-বিক্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া দিলেন। আবার কহিলেন, "শনিদেবের শপথ! আমার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। যদি না হয়, নিশ্চয়ই এ অগ্নি অস্ত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। স্বর্গভূষণকে অঙ্গীকার বাক্য প্রদান করিয়াছি, চক্ষে চক্ষে যদি তাহার

সহিত পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হয়, সে অঙ্গীকার আমি পালন করিবই করিব।"

যে কথা শুনিয়া জগতে সর্ব্বজীব বিমোহিত হয়, সেই কথার উচ্চারণের মোহময় স্বরে অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "পিতা! ও কথা আর না। আমার জন্য তুমি জীবন পরিত্যাগ করিবে, আবার যদি এ কথা শুনিতে হয়, মাতৃহারা কলঙ্কিনী আমি, অভাগিনী আমি; তুমি জন্মদাতা, প্রাণ-দাতা! তুমি আমার প্রাণহরণ করিতেছ! প্রাণহরণ করিতেছ!"

"যথেষ্ট! যথেষ্ট!" ভয়ঙ্কর গর্জ্জনস্বরে বিরাটকেতু কহিলেন, "এই পর্য্যন্তই শেষ হওয়া ভাল। কি তোমার কর্ত্তব্য, স্পষ্ট করিয়া বল। আর অধিকক্ষণ আমারে তাচ্ছিল্য করিও না। তোমার মীমাংসা? পাগলের মত আর বেশী কথা কহিও না। শীঘ্র! শীঘ্র! তোমার মীমাংসা? সে মীমাংসার অনুরোধে আমি আর অধিকক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না।"

"হা পরমেশ্বর! এখন আমি কি করি?" যে ভাব হৃদয়ে ছিল, সেই ভাবকে আরও উত্তেজিত করিয়া অপ্সরাসুন্দরী আরও যেন পাণ্ডুগণ্ডে উত্তেজিতা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "পিতা! তোমার বাক্যে যদি আমি হাঁ বলি, কৃতান্তদেব আমারে আলিঙ্গন করিবেন। তিনি ধর্ম্মরাজ, কেবল আমারে না, আর এক জন;—আর এক জন,—যাহাকে আমি জীবন সমর্পণ করিয়াছি, প্রাণে প্রাণে যাহারে আমি ভালবাসিয়াছি, যাহার প্রণয় বন্ধনে আমি বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছি,—তাহারেও——"

"সে কুকুরের নাম করিও না।" স্বভাবসিদ্ধ ভয়ঙ্কর কর্কশস্বরকে আরও কর্কশ করিয়া বিরাটকেতু কহিলেন, "সে কুকুরের নাম করিও না। স্বীকার কর। অবশ্য তোমারে স্বীকার করিতে হইবে, স্বীকার কর। অপ্সরা! আর একবার যদি তুমি আমার বাক্যে পরিষ্কার উত্তর না দাও, পিতৃঘাতিনী হইবে! পিতৃঘাতিনী! পিতৃঘাতিনী অপ্সরা! তুমি অমার্জ্জনীয় পাপে পাপিনী হইবে।"

হতভাগিনী অপ্সরাসুন্দরী যেন জ্ঞানশূন্য হইলেন। হইলেন কি না, বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে করিলেন, জ্ঞান তাঁহারে যেন পরিত্যাগ

করিয়া যাইতেছে। কর যোড় করিয়া ছিলেন, উভয় হস্ত পরস্পর সম্বদ্ধ ছিল, বামহস্ত দক্ষিণহস্ত বামে দক্ষিণে ঝুলিয়া পড়িল। মনে কি ভাব আসিয়াছিল, কেহ জানিতে পারিল না, আকস্মিক বিভ্রম-ভঙ্গীতে শূন্য নয়নে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। রাজা পুনঃপুন প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "মীমাংসা ?"

অপ্সরা বুঝিতেছেন, পিতা কথা কহিতেছেন, কিন্তু কি কথা কহিতেছেন, তাহা শুনিতেছেন না।—ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। পিতা সম্মুখে বহিয়াছেন, তাঁহার আকৃতি চক্ষে যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! বিকটাকার মূর্ত্তি কোথা হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার নেত্রসমীপে যেন ক্রীড়া করিতেছে।—গৃহসজ্জার নির্জ্জীব পদার্থ যেন সজীব সজীব জ্ঞান হইতেছে। দিকে দিকে বিভীষণ বদন বিদ্রূপে যেন দন্তবিকাশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। সেই দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতক বিতাসু প্রতিহিংসা-কলুষিত নয়নে নানা বিভীষিকাচ্ছলে তাঁহারে যেন ভয় দেখাইতেছে। ঈর্ষ্যা হিংসা কোথায় থাকে, প্রতিহিংসা কোথায় বাস করে, নির্ম্মলা বালিকা তাহা জানেন না। কিন্তু বিভীষণ বিভীষিকা তাঁহারে ভয় দেখায়।

তড়িত গতিতে নিকটে অগ্রসর হইয়া তনয়ার কর ধারণ পূর্ব্বক রাজা বিরাটকেতু আরও অনেক কথা কহিতে লাগিলেন, অপ্সরা-সুন্দরী তাহা শুনিতে পাইলেন না। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন, ইহা বড় আশ্চর্য্য রহস্য! শক্তি একটী শক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই শক্তিবলে চলে। সে শক্তি আজ যেন অপ্সরাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অপ্সরার স্মরণশক্তি উড়িয়া গিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা যেন কিছুই তাঁহার মনে নাই। তন্দ্রাবেশে লোকে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু অপ্সরা জাগিয়া রহিয়াছেন, তন্দ্রা তাঁহারে দয়া করিতেছে না, জাগ্রত-স্বপ্ন।—জাগিয়া জাগিয়া তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। সে স্বপ্ন আর কিছুই না। শুধু মাত্র বিভীষিকা।

তৃতীয়বার পিতার প্রশ্ন। দুহিতা শুনিলেন, পিতার প্রশ্ন। মনে মনে ভাবিলেন, উত্তর করিতে হইবে। কিন্তু সে সময়ে, সে বাক্যের কি যে

প্রকৃত উত্তর, তাহা তিনি মনে আনিতে পারিলেন না। যে প্রশ্ন শুনিতে ছিলেন, তাহারও সত্য মর্ম্ম ধারণা করিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্য রহস্য! হঠাৎ অজ্ঞানে, অজ্ঞাতসারে তাঁহার রসনা হইতে উচ্চারিত হইল,—"হাঁ।"

"মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করুন।" গোলমালের পরিবর্ত্তে স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বুঝিয়া দুষ্টবুদ্ধি ধূর্ত্ত বিরাটকেতু কহিলেন, "মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করুন। পিতার উপযুক্ত দুহিতাই তুমি। যে সংসারে মানসম্ভ্রম বাস করে, সে সংসারে কলঙ্কের স্থান হয় না। তুমি আমারে কলঙ্কে ডুবাইয়া, পবিত্র সংসারকে কলঙ্কিত করিয়া, নিজে অভাগিনী কলঙ্কিনী হইতেছিলে, সে পাপ দূরে গেল। মুখে শুনিলাম, "হাঁ।"

অপ্সরা আর কথা কহিলেন না। কেন যে তাঁহার পবিত্র রসনা হাঁ উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাও জানিতে পারিলেন না।

পরিতাপিনীর জাগ্রতস্বপ্ন অন্তর্হিত হইয়া গেল। কি যে ভীষণ অবস্থার স্বীকার, তাহা তখন তিনি অল্প অল্প বুঝিতে পারিলেন। সেই ভীষণ অবস্থাই যথার্থ। স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, সেই অবস্থার নাম সঙ্কট। আমি যদি আজ অপ্সরাসুন্দরীকে হিমালয় পর্ব্বতের চূড়ায় তুলিতে পারিতাম, তাহা হইলেও তাঁহারে সুখী করিতে পারিতাম না। আমি যদি আজ অপ্সরাসুন্দরীকে মহাসাগরের অতল সলিলে ডুবাইয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলেও তাঁহারে শীতল করিতে পারিতাম না। সৌভাগ্যবতী হইয়াও অপ্সরা আজ কাঙ্গালিনী। কেন আমি তাঁরে কাঙ্গালিনী বলি? সব আছে, কিন্তু যেন কিছুই নাই, সেই জন্যই কাঙ্গালিনী। এই অবস্থায় কয়েক দিন কয়েক রাত্রি কাটিয়া গেল। নূতন রজনীর আগমন।

বিরাটকেতুর বিরাটমূর্ত্তি। আজ রাত্রে তাঁহার মনোনীত পাত্রের সহিত অপ্সরার সাক্ষাৎ হইবে, মনে মনে এই আকিঞ্চন, এই অভিলাষ। রাত্রি আসিয়াছে। অনেক চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া গগনাঙ্গনা নক্ষত্রমালারা পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। একটী চাঁদ আকাশে থাকিলে, কেন জানি না, নক্ষত্রদীপ্তি মলিন হয়। আজ আকাশে এখন চাঁদ নাই, নক্ষত্র মালার বড় তেজ। তাহারা বুঝি অভিসারিকা? চাঁদকে অন্বেষণ করিবার জন্য তাহারা বুঝি এত দতেজে নয়ন বিকাশ করিতেছে? অপ্সরাসুন্দরী

একটী নক্ষত্র। তাঁহার মানসাকাশে একটী চাঁদ আছে। সে চাঁদ কখন্ উদয় হয়, কখন অস্ত যায়, তিনিই তাহা জানেন। তুমি আমি জানি না। পিতা নিকটে বসিয়া ছিলেন, মনের দ্বার খুলিয়া মনের কথা বলিতেছিলেন, বহির্দ্বারে স্বর্গভূষণ সমাগত। অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত রাজা বিরাটকেতু শশব্যস্তে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। আমাদের অভাগিনী অনুতাপিনী নায়িকা, নির্জ্জন গৃহে একাকিনী। একাকিনী কেহ কি থাকিতে পারে? একাকী আর একাকিনী যাহারা হয়, তাহাদের এক সহচরী আছে, সে সহচরীর নাম চিন্তা। চিন্তা হয় ত স্বর্গের দূতী। আমার সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে, আমি তাহারে স্বর্গদূতী বলিয়াই পূজা করি। অপ্সরা সতী একাকিনী চিন্তারে আলিঙ্গন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছেন। হৃদয়ে ধ্যান হইতেছে ভূপেশচন্দ্র। এ সময়,—এ বিপদ সময় ভূপেশচন্দ্র কোথায়, সত্য তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু মনের চক্ষে যেন তিনি তাঁহারে নিকটে দেখিতেছেন। চক্ষু যাহারে দেখিতে চায়, মন যাহারে ভাবনা করে, হৃদয় যাহারে ধারণা করিতে অভিলাষী,—সে বস্তু একটী অমূল্য বস্তু। অপ্সরাসুন্দরী সেই অমূল্য বস্তুর প্রাপ্তি-কামনায় এক প্রকার উন্মাদিনী। রাত্রি কত, তাহা তিনি জানিতেন না। মনে কি সংকল্প আছে, গৃহের দীপশিখা তাহা জানিত না। উদাস! উদাস! উদাস! উদাস নয়নে দীপশিখার প্রতি ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর যোড়ে কহিলেন, "শিখা! তোমার কাছে আমি বিদায় হই। আজিকার রজনী প্রভাত হইবে, প্রভাতে আবার সূর্য্যোদয় হইবে, সূর্য্যদেব আবার অস্তাচলে যাইবেন, প্রদোষে আবার তুমি প্রজ্বলিবে, কিন্তু এ গৃহে, এ নয়নে আর তুমি প্রতিভাত হইবে না।" বিভ্রান্ত মানসে এই কথা কহিতে কহিতে বিমনস্ক ভাবে চিন্তাকাতরা নায়িকা ইতস্তত নয়ন নিক্ষেপ করিতে করিতে চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চিম দিকে একটী যবনিকা ছিল, সেই যবনিকা অপসারিত করিয়া গুপ্তদ্বারপথে অপ্সরাসুন্দরী সকলের অজ্ঞাতে, অলক্ষিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। মনে মনে একটী আশা আছে, কাহাকে যেন দর্শন করিবার আশা; সে আশা ফলবতী হইবে কি না, স্থিরতা নাই, অথচ জানা আছে আশা-চপলা।

ষড়্‌বিংশ প্রবাহ।

বন-পথে দর্শন।

" Few are the hours that we mortals are destined to enjoy in this world of misery. And how grateful should we be to those, with whom we keep some of those few hours. There is no life without energy, there is no energy without stimulent ; and this stimulent I found in you ; indeed your company is a refreshing dose to me."

A PUNDIT, E. B.

রাত্রিকাল। নিবিড় অরণ্য। একটী অনাথিনী অসহায়িনী কুল-কামিনী সেই অরণ্যপথে প্রবেশ করিয়াছেন। মন চলিতেছে, চরণ চলিতেছে, কিন্তু লক্ষ্যস্থল কোথায়, তাহা জানা নাই। পিতা ফিরিয়া আসিয়া ঘরে কি দেখিবেন, তাহাও জানা নাই। এই প্রকার দুঃখেই কলিযুগে জগন্নাথদেব দারুভূত। লোকে বলে, সমুদ্র গর্জ্জন শ্রবণে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার হস্তপদ কাষ্ঠ কলেবরে প্রবিষ্ট। এ হাস্যকর প্রসঙ্গের আলোচনায় এখন আমি প্রবৃত্ত হইব না। জগন্নাথক্ষেত্রের বনপথে একটী দুঃখিনী কামিনী। বিরাটকেতু তাঁহাকে জগন্নাথ দেখাইতে আনিয়াছিলেন, দেখাইতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের একটী নাথ আছে, সেই নাথ তাঁহার জগন্নাথ। কোথায় পাইবেন, জানিতেন না, কিন্তু সেই জগন্নাথকে দেখিবার জন্য নিশাকালে বনগামিনী।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতেই সেই গাঢ় অন্ধকারে এক অদৃশ্য মূর্ত্তি অন্ধকারে অদৃশ্যভাবে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শিহরিয়া উঠিয়া রাজকন্যা কহিলেন, " কে তুমি ? " অদৃশ্য

মুর্ত্তির কম্পিত রসনায় উত্তর হইল, "যাহার জন্য দিবানিশি হৃদয় চঞ্চল, সেই আমি। যাহার জন্য দিবানিশি নয়ন পাগল, সেই আমি। সংসারে উদাসীন হইয়া, যাহার জন্য সদাসর্ব্বদা মন পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, সেই আমি। আমি—ভূপেশচন্দ্র। প্রাণেশ্বরি! আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার, কিন্তু আমার বুকে দিবানিশি একটি আলো জ্বলে, সে আলোতে দেখি, তাঁরে, আর তোমারে। জীবিতেশ্বরি! কোথায় যাইতেছ?"

অ। যাইতেছি প্রাণনাথ! হেরিতে তোমারে।
ভূ। তবে আর কোথা যাবে? দেখেছ আমারে॥
অ। আঁধারে কি দেখা যায় ও রূপ মাধুরী?
ভূ। কোথায় আঁধার সতি! এই স্বর্গপুরী।
অ। তুমি বল স্বর্গপুরী,—অনাথিনী আমি।
এ আঁধারে প্রাণেশ্বর! কেন বনগামী?
ভূ। বনে আসিয়াছি সতি! দেখিতে তোমারে।
অ। সে কি কথা! এত ভালবাস কি আমারে?
ভূ। বড় ভালবাসি তোরে অপ্সরা-সুন্দরি!
দেবীরূপে আমি তোরে নমস্কার করি॥
স্বর্গের অপ্সরা তুই, স্বর্গবিলাসিনী,
মরধামে মানুষের মানসবাসিনী॥
কাঙ্গালিনী কেন তুই, রাজার কুমারী,
বিধুমুখি! ম্লানমুখী হেরিতে কি পারি?
চিবুকে অঙ্গুলী দিয়ে, মানসের সুখে,
আদরে চুম্বন করি তব শশীমুখে।
কেন কাঙ্গালিনী হবি? অপ্‌সরাসুন্দরি!
রাজরাণী হবি তুই আশীর্ব্বাদ করি॥

অন্ধকারে অন্ধকারে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া নিবিড় বনমধ্যে অপ্সরাসুন্দরী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূপেশ! তুমি অকস্মাৎ কোথা হইতে এই রাত্রে এই অরণ্যে প্রবেশ করিলে?"

ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "এই শ্রীক্ষেত্রধামের কোন হিতৈষী বন্ধু আমারে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রে আমি পাঠ করি, আজ রাত্রে স্বর্গভূষণের সহিত তোমার বিবাহ দেওয়া তোমার পিতার অভিলাষ। সুদৃঢ় পণ। সে পত্র পাঠ করিয়া আমি কি আর একদণ্ড স্থির হইয়া থাকিতে পারি? কাহাকেও কিছু না বলিয়া, প্রচ্ছন্নভাবে সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কবিয়াছি। অসমসাহসের কার্য্য হইয়াছে!"

"আমারও হইয়াছে। তুমিও পলায়ন করিয়াছ, আমিও পলায়ন করিয়াছি। আমার পিতা অতি নৃশংসেব কার্য্য করিতেছিলেন। জান তুমি, আমি তাঁহার এক মাত্র দুহিতা, আমার মঙ্গলের দিকে তিনি একবারও চাহিলেন না। অর্থলোভে উন্মত্ত হইয়া সেই কাশরোগগ্রস্ত কাপুরুষের হস্তে আমারে সমর্পণ করিতে দৃঢ়সংকল্প! ভূপেশ! বল দেখি তুমি, হৃদয়ের বন্ধন কি ছেদন করিতে পারা যায়?" এই শেষ কথাটী বলিতে বলিতে অপ্সরার চক্ষে দর দব ধারে জলধারা পড়িতে লাগিল। স্বীয় উত্তরীয় বসনে অশ্রুমুখীর নেত্র মার্জ্জন করিয়া দিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "ভগবান সর্ব্বময়। তিনি অনন্ত মঙ্গলময়। তাঁহার করুণা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবর্ষিত হইয়া থাকে। তুমি দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছ, আমিও করিয়াছি। যখন সংবাদ পাই, তখন আমার হস্তে কিছুমাত্র সম্বল ছিল না। কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতেও পারিলাম না। শত শত ক্রোশ পদব্রজে অতিবাহন করিয়াছি। এক প্রকার অনাহারেই আসিয়াছি বলিলে নিতান্ত মিথ্যা কথা বলা হয় না। এই দেখ, সামরিক পোষাকেই পলাইয়া আসিয়াছি।"

অপ্সরার পদ্মচক্ষে পুনরায় অশ্রুবর্ষণ হইল। অন্ধকারে ভূপেশচন্দ্রের মুখের দিকে সেই সজল নয়ন নিক্ষেপ করিয়া, কাতর বচনে অভাগিনী বনগামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূপেশ! আবার তুমি সেনাদলে প্রবেশ

করিয়াছিলে কেন? সেই দুষ্ট লোকের অর্থ পরিশোধ করা হইল, তথাপি ইচ্ছা করিয়া দাসত্বশৃঙ্খল চরণে ধারণ করিলে কি জন্য?"

"ইচ্ছা করিয়া ধারণ করি নাই। দুটী কারণ আছে। এক কারণ, সেই দুরন্ত লিঙ্গেশ্বর আমার সঙ্গ ছাড়িল না। দ্বিতীয় কারণ সেই পাপিষ্ঠ বিতাম্বুর ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা! তাহাদের চক্রেই আমাকে ধরা পড়িতে হইয়াছিল।" পুনরায় অশ্রুমতীর অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিয়া ভূপেশচন্দ্র এত দিনের পর এই নিগূঢ় রহস্য, সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন বনস্থলীতে পবিত্র হৃদয়ের বিশ্বাসপাত্রীর নিকট পরিস্ফুট রূপে পরিব্যক্ত করিলেন।

অপ্সরা কাঁপিয়া উঠিলেন। মনে যেন সহসা কি ভাবের উদয় হইল, রোমাঞ্চিত গাত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পলায়ন করিয়াছ, তাহারা যদি সন্ধান পায়, তাহাতে কি বিপদ আছে?"

"আছে। কিন্তু সে ভাবী বিপদাশঙ্কায়, ভবিষ্যৎ অশুভ চিন্তায়, আমি এখন অন্তঃকরণকে আকুল করিতে ইচ্ছা করি না।"

"তবে আমিও এখন আর সে কথা উত্থাপন করিয়া তোমারে কষ্ট দিব না।"

"হাঁ, তাহাই ভাল।"

"আমি একাকিনী পলাইয়া আসিয়াছি, ভগবান তোমাকে মিলাইয়া দিলেন, মনে যথেষ্ট সাহস হইল। তাহা না হইলে, এই রাত্রিকালে এই নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিয়া একাকিনী কুলবালা আমি কোথায় যাইতাম?"

"মন পবিত্র হইলে জগৎ পিতা সর্ব্বদা সকল বিপদেই রক্ষা করেন।"

"এখন আমরা যাই কোথা?"

"তিনিই উপায় করিয়া দিবেন। কিন্তু একটু সংশয় আছে।"

"সে কিরূপ?" চমকিত হইয়া অপ্সরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?"

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমরা হিন্দু। হিন্দুপরিবারের আচার ব্যবহার অনেক বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা করে। তুমি আমি আজিও পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হই নাই। এ অবস্থায় নির্জ্জনে দেখা সাক্ষাৎ করাই ত রীতিবিরুদ্ধ। তাহাতে তুমি অবিবাহিতা কুলকন্যা;

তোমারে সঙ্গে লইয়া আমি যদি স্থানান্তরে গমন করি, সমাজে নিন্দা হইবে।"

"তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু তাহা ভিন্ন এক্ষেত্রে আর উপায় কি?"

"এ কথাও সত্য। উপায় অন্বেষণ করিতে গেলে উভয় সঙ্কটের মধ্য-স্থলে দাঁড়াইতে হয়।"

কথোপকথনে প্রায় অর্দ্ধদণ্ড অতিক্রান্ত। রজনীদেবী গাঢ়তর কৃষ্ণ-বর্ণ হইয়া ধরাধামকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। বনভূমি নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। মাথার উপর চন্দ্রবিরহিত আকাশ লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র-চক্ষু বিকাশ করিয়া বনস্থলীকে যেন গম্ভীর ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে।

অপ্সরাসুন্দরী আবার কহিলেন, "এ রাত্রে আমরা এখন যাই কোথায়?"

স্তম্ভিত ভাবে ধীরে ধীরে ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হয়। বলিয়াছি, তুমি কুলকন্যা, অবিবাহিতা কুমারী। তোমারে সঙ্গে করিয়া স্থানান্তরে যাইতে আমার মন সরিতেছে না।"

"তবে এখন আমার উপায় কি হইবে? গোপনে পিতার আশ্রয় পরি-ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আর সে স্থানে প্রবেশ করিতে পারিব না। দ্বিতীয়ত সেই দুষ্টবুদ্ধি কাপুরুষ কি জানি কি মোহিনী মন্ত্রে পিতাকে ভুলা-ইয়াছে। পুনঃ পুন সে আমারে বিরক্ত করিতে আসিবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। বিষাক্ত সর্পকে অদূরে নিরীক্ষণ করিয়া আমি তেমন ভয় পাই না। ঘৃণিত শূকর দর্শনে পবিত্র মানসে যেমন ঘৃণার উদয় হয়, তাহাকে দেখিয়া আমার মনে তেমনি ঘৃণা আইসে। পলায়ন করিয়াছি, যদি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে হয় ত এই রাত্রে, এই ঘোর বনে আমি ব্যাঘ্রভল্লূকের শিকার হইতাম। যদি তাহারা দয়া করিয়া ভক্ষণ না করিত, তাহা হইলে হয় ত জগন্নাথদেবকে স্মরণ করিয়া সাগর-সলিলে ঝাঁপ দিয়া মরিতাম। এখন বল দেখি ভূপেশ! আশ্রয়তরু পরিচ্যুত হইয়া এখন কোথায় আশ্রয় পাই?"

"আশ্রয় পৃথিবীর সর্ব্বত্রে আছে। যিনি আমাদিগকে ভবধামে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি কখনও কাহাকেও নিরাশ্রয় করিয়া রাখেন না,

উদ্দেশে তাঁহাকে নমস্কার করি, জলে অনলে, রণে, বনে, সর্ব্ব স্থানেই, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্ব জীবদাতা নিরাশ্রয় জীবকুলকে আশ্রয় দান করেন। মহা বিপদে সেই বিপত্তকাণ্ডারী বিপদাপন্ন জীবগণকে অহরহ রক্ষা করেন। আশ্রয়ের জন্য ভয় নাই, রক্ষার জন্য চিন্তা নাই, কিন্তু তোমাকে লইয়া যে আমি কোথায় যাইব, তাহাই ভাবিতেছি।"

রাত্রি অনেক দূর অগ্রসর। কথায় কথায় উষা সতীর আগমন। পূর্ব্ব গগন অল্প অল্প সুপ্রকাশ। শাখী-বাসী পাখীরা জলের কুমুদিনীকে ছিছি দিয়া উষাকালে প্রভাতী সঙ্গীতে জগৎপিতার স্তুতি গান আরম্ভ করিল।

"আর ত বিলম্ব করা উচিত নয়। কি জানি, তাঁহারা যদি সন্ধান পান, মহা অনর্থ বাধাইতে পারেন। যাহা থাকে কপালে, এই বেলাই প্রস্থান করা ভাল।"

উষার আবরণ থাকিতে থাকিতে জগন্নাথপুরী পরিত্যাগ করাই স্থির সংকল্প। পাণ্ডাদের মুখে এক প্রবাদ আছে, নিশাভোগ রাত্রে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ জগন্নাথের ভোগের প্রসাদ খাইতে আসেন, ভোরে চলিয়া যান। বিভীষণের প্রস্থানের অগ্রে ভূপেশচন্দ্র আর অপ্সরাসুন্দরী জন-মানবের অগোচরে বনস্থল অতিক্রম করিলেন, কোথা দিয়া কোথা গেলেন, শ্রীক্ষেত্রের লোকে তাহার কিছুই জানিল না। বনসীমা পার হইয়া বিষণ্ণ বদনে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "রাজকুমারি! ভাবনার উপর ভাবনা। একটু আগে শুনিয়াছ তুমি, সমাচার পাইবা মাত্র যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থায় নিঃসম্বলে চলিয়া আসিয়াছি। এখন প্রাণাধিকে! সুদূর পথ পর্য্যটনের উপায়?"

"সে উপায় না করিয়া আমি গৃহ হইতে বাহির হই নাই। আমার অঞ্চলে দশটী স্বর্ণমুদ্রা আছে। জননীদত্ত দশখানি মোহর। যদি অকুলান পড়ে, একে একে আমার সমস্ত গাত্রভূষণ—"

"আর না রাজনন্দিনি! যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি যে সংসার-সাগরের মহারত্ন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। চল।"

উভয়ে চলিলেন। উষা তখনও তাঁহাদের ঢাকা দিয়া লইয়া চলিতে

ছেন। মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছে। অনেক দূরে প্রভাত হইল। জলে জলে পদ্ম ফুল ফুটিল। গগনে নক্ষত্রেরা মিলাইয়া গেল। সূর্য্যদেব উদয় হইলেন।

কে জানে কত দিন, কত রাত্রি পথে অতিবাহিত হইয়া গেল, আমাদের পলাতক নায়ক নায়িকা গুজরাট নগরে উপস্থিত। সেখানে একখানি ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া লইলেন, গৃহে যাহা যাহা সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিয়া ভদ্রলোকের দস্তর মত ঘরগুলি সাজাইলেন, একজন দাসী রাখিলেন, তাহার নাম রোহিণী। যাহার বাটী ভাড়া লইলেন, তাহার নাম হিরণ্ময়ী।

নিত্য নিত্য সন্ধ্যা হয়, নিত্য নিত্য রাত্রি হয়, নিত্য নিত্য প্রভাত হয়, নিত্য নিত্য ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, "বিবাহের অগ্রে এ রকমে উভয়ে একত্রে থাকা কি ভাল হইতেছে?"

নিত্য নিত্য অপ্সরা উত্তর করেন, "আমি ক্ষত্রিয়কুমারী, পূর্ব্বে আমাদের স্বয়ম্বরপ্রথা ছিল, তুমি ইচ্ছা করিলে আমি স্বয়ম্বরা হইতে পারি।"

"পার সত্য, পার জানি। কিন্তু রাজকুমারি! আমি সৈনিক বারিক হইতে পলায়ন করিয়াছি। যদি আবার বিপদে পড়িতে হয়, তোমারে বিদেশে একাকিনী রাখিয়া, আমারে যে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইতেছে।"

"সে চিন্তা পরিত্যাগ কর। যে নির্জ্জনে আমরা আছি, এখানে কেহই সন্ধান পাইবে না।"

"আচ্ছা অপ্সরা! মনে কর তুমি স্বয়ম্বরা হইলে, মনে কর আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু পরিণাম চিন্তা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?"

"পরিণাম! পরিণাম! ভূপেশচন্দ্র! পরিণাম! আচ্ছা, আমার পরিণাম কি তুমি চিন্তা কর না?"

"সেই চিন্তাই প্রবলা। তুমি বিবাসিনী হইয়াছ, আমি তোমারে বিদেশে আনিয়াছি; এখন যদি—"

কথা হইতেছে, এমন সময় দুই তিন বার দ্বারে আঘাত হইল। অপ্সরা-সুন্দরী সন্দেহে সন্দেহে দ্বার খুলিয়া দিলেন, রোহিণী প্রবেশ করিল। অপ্সরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ রোহিণি!"

"রোহিণী উত্তর করিল, একজন পুরুষ মানুষ দ্বারদেশে উপস্থিত।"

"পুরুষ মানুষ? এক বৎসর আমরা এ বাড়ীতে বাস করিতেছি, এক-দিনও ত কোন অপর পুরুষ মানুষ এখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই?"

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন,—"রোহিণি! তুমি ফিরিয়া যাও। আমাদের গৃহস্বামিনী হিরণ্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি কোন অপরিচিত পুরুষকে, এ গৃহে প্রবেশ করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন?"

"হিরণ্ময়ী দেবী গৃহে উপস্থিত নাই।"

"তবে মিষ্টবাক্যে সেই আগন্তুককে বিদায় হইতে বল।"

রোহিণী চলিয়া গেল। আমাদের নায়ক-নায়িকা কোন অভাবনীয় গাঢ়চিন্তায় নিমগ্ন।

সপ্তবিংশ প্রবাহ।

উৎসবে বিষাদ!

"A virtuous woman is the very embodiment and personification of love. The true begining and end of all that is pure and worthy of womankind, is love. Love may be made to constitute all woman's happiness; but if the heavenly passion be perverted, it proves the source of all her sorrows. Very beautiful indeed is the principle of love in woman: it constitutes a roseate atmosphere in which she lives, and moves, and has her being and it forms a hallo of celestial purity to surround her."

REYNOLDS.

অনেক দিন পূর্ব্বে পাঠকমহাশয় একবার ভাগীরথী কূলে ইন্দুভূষণ আর বিদ্যানিধিকে দর্শন করিয়াছিলেন এই স্থানে সেই রহস্যের মর্ম্মভেদ।

ইন্দুভূষণ ইন্দুভূষণ নয়, বিদ্যানিধি বিদ্যানিধি নয়, ইন্দুভূষণ আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রধান নায়ক ছদ্মবেশী ভূপেশচন্দ্র। আর সেই বিদ্যানিধি, আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রধানা নায়িকা ছদ্মবেশী অপ্সরাসুন্দরী। গুজরাটে সেই রহস্যের মর্ম্মভেদ। ভূপেশচন্দ্র এখানে ইন্দুভূষণ নামে পরিচয় দিয়া, কিম্বা পরিচিত হইয়া একটী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছেন। আর অপ্সরাসুন্দরী বিদ্যানিধি উপাধি মানসপর্ব্বতের অন্ধকার গুহায় লুকাইয়া রাখিয়া নারী বেশে বিদেশ-নিকেতনে ক্রীড়া করিতেছেন। অবলম্বন সূচীকার্য্য;—আর ধনবতী কুলকামিনীদের বস্ত্রের উপর ফুলকাটা। উভয়ের শোণিতশোষণ নির্দ্দোষ পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে দিন গুজরাণ হইতেছে। গুজরাটে দুর্গাপূজা হয় না। কিন্তু শরৎকালে শারদীয় মহোৎসব হয়। ভারতভূমির সর্ব্বস্থলে শরৎঋতুর আর বসন্তঋতুর অধিকতর মাহাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্বিন মাসের পঞ্চবিংশদিবসে সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্ব্বে, নায়ক-নায়িকা উভয়ে একত্র বসিয়া বাঙ্গালাদেশের দুর্গাপূজার গল্প করিতেছিলেন। কে জানে কোন্ কালে মেনকার গর্ভে ভগবতীর জন্ম হইয়াছিল, কে জানে কোন্ কালে কৈলাসনাথ পশুপতির সঙ্গে পর্ব্বতনন্দিনীর পরিণয় হইয়াছিল, কে জানে কোন্ কালে হিমালয় নন্দিনী কৈলাসবাসিনী হইয়াছিলেন, কিন্তু আজিও বঙ্গভূমিতে শারদীয় আশ্বিনী শুক্ল সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিথিতে শারদীয়া মহামায়ার অর্চ্চনা হয়। কত আনন্দ, কত উৎসব, কল্পনাপথে তাহা আনয়ন করিয়া উভয়ে যেন আনন্দনীরে সাঁতার দিতেছিলেন। গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ, সহসা দ্বারে আঘাত। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে আসিয়া সেই আনন্দপ্রসঙ্গে ভঙ্গ দিল, কে আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল, যুগলে তাহা জানিলেন না। কিন্তু শিষ্টাচার সমাজের একটী সুখময় পদার্থ। শিষ্টাচারের অনুরোধে অপ্সরাসুন্দরী দ্বার খুলিয়া দিলেন। বিত্রস্ত পদে হিরণ্ময়ী প্রবেশ করিলেন। ইন্দুভূষণের হৃদয়ে যে আশঙ্কার উদয় হইতেছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারেন, কোন কারণে পূর্ব্বে যদি কোন প্রকার দোষ করা হইয়া থাকে, চিন্তা সেই দোষ প্রতি মুহূর্ত্তে মনের কাছে, চক্ষের কাছে আনিয়া দেখান। ইন্দুভূষণ জানি-

তেন, কোথা হইতে কোথায়। কিন্তু শঙ্কিত মন দূরাদূর মানে না। কিঞ্চিৎ সঙ্কেতেই বিভীষিকা দেখায়। হিরণ্ময়ীর প্রবেশে সে বিভীষিকা অপসারিত হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! অসময়ে আপনি এখানে কেন?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "তোমার একটী ছাত্রের পিতা গো শকটে গৃহে আসিতেছিলেন, হঠাৎ পড়িয়া গিয়া, অচেতন হইয়াছেন। দক্ষিণ হস্তে, দক্ষিণ পদে, সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে। চিকিৎসকেরা কহিতেছেন, পক্ষাঘাত হইবে।"

"দেখিতে যাইতে হইল।" কাতরভাবে করুণস্বরে ইন্দুভূষণ কহিলেন, "দেখিতে যাইতে হইল।"

"সেই জন্যই আমি আসিয়াছি।" উত্তেজিত ভাবে হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আত্মীয় লোকেব আপদ বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে হয়, সেই জন্যই আমি আসিয়াছি।" এই কথার পর আর তিনি কোন কথা কহিলেন না। ইন্দুভূষণের দিকে সস্নেহ কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দুভূষণ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আসন হইতে উঠিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্র! আজ আমার কি আনন্দেই বাধা পড়িল। পরম পিতার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, পিতার আলয় হইতে পলাইয়া আসিয়া অবধি এমন বিমল আনন্দ আমি এক দিনও অনুভব করি নাই। এ আনন্দে যে এমন বিঘ্ন হইবে, অনুভব ছিল না।"

"শীঘ্রই আমি আসিতেছি। একটী ভদ্রলোক বিপদগ্রস্ত, এ সময় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা ভাল দেখায় না। শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিতেছি।"

ভূপেশচন্দ্র যে বেশে ছিলেন, সেই বেশেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহদ্বার অনাবৃত থাকিবে কি আবৃত হইবে, অনুমতি করিবার অবসর হইল না। যে গৃহে দুর্ঘটনা, ব্যস্ত ভাবে সেই গৃহে উপস্থিত। দেখিলেন, শুনা কথা আড়ম্বর। যতদূর শুনিয়াছিলেন, ততদূর নয়। অল্প আঘাত লাগিয়াছিল, অল্প সময়ের মধ্যে তাহা ভাল হইয়া গিয়াছে।

সমবেদনা জানাইয়া যথারীতি সান্ত্বনা করিয়া তিনি তথা হইতে বিনিক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যা হইবার বিলম্ব আছে, অপ্সরাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছেন, শীঘ্র শীঘ্র ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং রাজপথে দ্রুত গতি।

শরৎকালের আকাশ অপরাহ্নে বড় বিচিত্র খেলা করে। পশ্চিমে স্বাভাবিক নীলবর্ণ। পূর্ব্ব দিক স্বর্ণবর্ণ। সেই স্বর্ণবর্ণের ছায়া পশ্চিমাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া বড় অপরূপ শোভা দেখাইতেছে। সূর্য্যদেব অস্তে যাইতেছেন, বাতাস তাঁহারে বীজন করিতেছে, কি আশ্চর্য্য শোভা! আকাশে যেন সমুদ্র দেখা যাইতেছে, সমুদ্রে যেন তরণী চলিতেছে। সাগরে যেন ঢল নামিয়াছে। রক্ত বর্ণ সূর্য্যের ছায়া, দিগঙ্গনাগণকে সোণার কাপড় পরাইয়া সাগর কূলে নাচাইতেছে, তীরে তীরে যেন ছোট ছোট গাছেরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আকাশ যেন জলময় হইয়াছে, সেই জলে যেন এক পাল ভল্লুক বসিয়া আছে। ভল্লুকের পার্শ্বে এক জন পুরুষ, একটী স্ত্রী। আমাদের চক্ষে পলক আছে, চক্ষের পাতা থাকে থাকে পড়িয়া যায়, পলক পাতাটিতে ভূপেশচন্দ্র আবার চাহিয়া দেখিলেন, সেই পুরুষ, বামপার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়াছেন, কামিনী নিকটে নাই। ও দিকে আবার ও কে? কলেবর ক্ষুদ্র, বিভীষণের মত মস্তক, সেই মস্তকে সোণার কিরীট, কিন্তু সে রমণী কোথায় গেল? ঐ আবার কে আসিতেছে? বিরাট বিরাট বিরাট আকার, হস্তে বিশাল খড়্গ!—কাহাকে ছেদন করিবে? আবার চক্ষের পাতা পড়িয়া গেল। পুনরায় চাহিয়া দেখিলেন, আকাশে আর সে বিরাট মূর্ত্তি নাই। মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, ভূপেশচন্দ্র তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না। মানুষের হৃদয়ে কল্পনা থাকিতে পারে না, মেঘের হৃদয়ে কল্পনা বসিতে পারে না, এ কথা যাহারা মনে করে, তাহারা বর্ব্বর! অপরাহ্নের মেঘ ভূপেশচন্দ্রকে কত খেলা দেখাইয়া গেল, ভূপেশচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কেন জান? মনে তাঁহার এক ভয় আছে। ও দিকে আবার ও কে আসে? বাঘিনীকে কুকুরে তাড়া করি-

য়াছে। বাঘিনী ছুটিয়া চলিতেছে, তাহার লাঙ্গুল ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, একটু পরে আর নাই!

ভূপেশচন্দ্র প্রকৃতির এই সকল খেলা দেখিতেছিলেন কি,না, তিনি তাহা বলিতে পারিলেন না। বরফের সমুদ্র!! মেঘের সমুদ্র তুলারাশির মত সে শ্বেতবর্ণ মেঘ এক দিক হইতে আসিয়া আর এক দিকে চলিয়া যাইতেছে। স্তবকে স্তবকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। অস্তগমনশীল সূর্য্য-দেব, শ্বেতবর্ণকে আর শ্বেতবর্ণ রাখিতেছেন না। ধূসরবর্ণ, নীলবর্ণ, শুভ্র বর্ণ, সমস্তই সন্ধ্যারাগে স্বর্ণবর্ণে সুরঞ্জিত হইতেছে। প্রভাকর! সন্ধ্যাকালে তুমি বুঝি পৃথিবীকে কাঁদাও? কাঁদিয়া কাঁদিয়া লোকের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। রাগে রাগে মানব চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, কিন্তু ভাস্কর! তোমার রাগে প্রকৃতি সতীর সমস্ত সংসারক্ষেত্র লোহিত রাগে বিরঞ্জিত হইয়া থাকে। জানি তা, কিন্তু তোমার রাগকে আমি রাগ বলি না।

ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছে। ভূপেশচন্দ্র ঘরে যাইতেছেন। পথে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সন্ধ্যার আবরণ আসিয়াছে, সূর্য্যের সেই স্বর্ণ বর্ণ দূরে গিয়াছে, অন্ধকারে জগৎ-সংসার আচ্ছন্ন হইয়াছে। লোকের সঙ্গে দেখা হইল। একখানি বাটীর পশ্চিমদিক হইতে অন্যমনস্কে সেই লোক আসিতেছিল, অন্ধকারে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া গেল! স্বরে স্বরে উভয়ের সহিত উভয়ের পরিচয় হইল। অন্ধকারে ঠিক ঠিক চেহারা দেখা গেল না। ইন্দুভূষণের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। আগ-ন্তুকের মনে মনে পরম আহ্লাদ। ছাত্রের পিতা শকট হইতে পতিত হইয়া আহত, এ চক্র তাহারি। কোথা হইতে এই লোক গুর্জ্জর রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে, কি অভিপ্রায়ে নিরীহ লোকের উপর দৌরাত্ম্য করিতে অভিলাষী হইতেছে, তাহা কেবল সেই জানে। একবার বন্ধুত্ব দেখাইয়া-ছিল; সেই বন্ধুত্ব ভাব ইন্দুভূষণের মনে আছে। নাম যদিও বিভিন্ন, তথাপি—পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, ইন্দুভূষণ আমাদের সত্য-পরায়ণ, প্রণয়বিমুগ্ধ, অজাতশত্রু ভূপেশচন্দ্র! আর সেই আগন্তুক? ক্ষৌরকার—পোষ্টমাষ্টার বিতাস্থ।

স্বরে চিনিতে পারিয়া, তথাপি অল্প সংশয়ে ইন্দুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার নাম কি ?" শক্রবৎ মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া সেই ধূর্ত্ত উত্তর করিল, "আমার নাম বিতাস্থ। মিত্রবর! তুমি কি আমারে চিনিতে পারিতেছ না ?" আবার ইন্দুভূষণের সর্ব্বগাত্রে রোমাঞ্চ হইল। তিনি জানিতেন, জগৎ-সংসারে সত্য বন্ধু দুর্ল্লভ। এক সময়ে এই ব্যক্তি যেন অকপটে বন্ধু-ব্যবহার করিয়াছিল, এক সময়ে এই ব্যক্তি, মহাকপটে বিশ্বাসঘাতক হইয়াছিল। ছলনা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা তাহার চেহারায় মাখা। যদিও অন্ধকারে চেহারা দেখা গেল না, তথাপি ইন্দুভূষণ যেন মানস-প্রদীপের আলোতে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, মূর্ত্তিমান প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ছলনা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা। কম্পিত ওষ্ঠে ঈষৎ হাস্য করিয়া মিত্রভাবে প্রশ্ন করিলেন, "মিত্রবর! তুমি এখানে কত দিন ?"

বিতাস্থ উত্তর করিল, "আজ প্রাতঃকালে আসিয়াছি। আমাদের হাকিম এই রাজ্যে একখানি ডাকের চিঠি পাঠাইয়াছিলেন, সেই চিঠিখানি খোয়া গিয়াছে। আমি পোষ্ট মাষ্টার কি না ? আমাকে লইয়াই পীড়াপীড়ি হইতেছে।"

"সে পত্র কাহার নামে আসিয়াছিল ?"

"একজন সওদাগরের নামে। ধনসুখ দাস, দয়াল দাস।"

"চিঠি খোয়া গিয়াছে, তাহাতে তোমার উপর পীড়াপীড়ি কেন ?"

"সে চিঠিতে পাঁচ হাজার টাকার বরাতী হুণ্ডি ছিল।"

"তুমি তাহার জন্য দায়ী হইবে কি জন্য ?"

"তুমি যেমন বলিলে, এমন কথা কে বলে ? আমার উপর সেই টাকার দাবি হইয়াছে।"

"এখন তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর ?"

"একটু নির্জ্জনস্থান পাইলে বলিতে পারি। তুমি এখানে কত দিন ?"

ভূপেশচন্দ্র কখন মিথ্যা কথা বলেন নাই, সেই দিন, সেই রাত্রে, সেই ক্ষেত্রে অগত্যা তাঁহাকে একটী প্রথম মিথ্যা কথা কহিতে হইল! অধিকক্ষণ চিন্তা না করিয়া চঞ্চলভাবে উত্তর করিলেন, "ভ্রমণ করিতে করিতে অদ্যই এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বাসা অন্বেষণ করিতে করিতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ।"

অস্ফুট হাস্যে অন্ধকারে বিতাস্থ মাথা নাড়িল। কি এক ভৌতিক ভাব তাহার মনে যেন অকস্মাৎ উদয় হইল, সেই ভাবের উপদেশে ব্যগ্র-ভাবে কহিল, "সহরে ত অনেক সরাই থাকে; এ সহরে তুমি কি সরাই খুঁজিয়া পাও না ?"

"না।"

"আমার সঙ্গে এসো।"

"বাধিত হইলাম।"

"শিষ্টাচারের প্রয়োজন করে না। রাত্রি হইয়াছে, উভয়েই বিদেশী, উভয়েরই আশ্রয় প্রয়োজন, চল একটা সরাইয়ে প্রবেশ করি।"

"চল।"

অদূরেই একটা সরাই ছিল। রাজ্যের যত বদমাস্ সেইস্থানে গতি-বিধি করিত। বিতাস্থ একমাস কাল সহরে ঘুরিতেছে। সুস্থানের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, কিন্তু সমস্ত কুস্থানই তাহার সুপরিজ্ঞাত। জুয়া খেলার আখড়া বল, বিতাস্থ সেইখানে, মাদকের দোকান বল, বিতাস্থ সেই-খানে; জুয়াচোর দাঙ্গাবাজের আখড়া বল, বিতাস্থ সেইখানে; দস্যু ডাকাইতের নিভৃত নিবাস বল, বিতাস্থ সেইখানে; মানুষের বিত্তহারিণী জীবন সংহারিণী, মহামায়াবিনী-মোহ-মোহিনী, বারবিলাসিনী-কুলের, মোহজাল আচ্ছাদিত কেলী গৃহ বল, বিতাস্থ সেইখানে। একমাসে দুষ্ট-বুদ্ধিতে কোন দুষ্টস্থান তাহার অগম্য ছিল না। অপবিত্র সরাইখানায়, নিরীহ ভূপেশচন্দ্রকে লইয়া গেল, ধমে ধমে অন্ধকার। দুর্গন্ধে নাসারন্ধ্র অনাবৃত রাখা সঙ্কট। বিকট বিকট চেহারার দিকে নয়নকে খুলিয়া রাখা সাধুলোকের অসাধ্য। তথাপি ভূপেশচন্দ্র সেইখানে। একখানি কৃষ্ণ-বর্ণ চৌকি পড়িয়া আছে, তাহার উপর মৌলবী সাহেবের মত গোঁফ-দাড়ি নাড়িয়া আরসুল্লারা খেলা করিতেছে, দেয়ালের ফাটালে ফাটালে, বড় বড় বহুপদী মাকড়সা আর তেঁতুলে বিছারা মুনিঋষির মত নিঃসাড়ে কুম্ভক যোগে বিলম্বিত রহিয়াছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সেই ঘরের একপার্শ্বে ভূপেশ-চন্দ্র আর বিতাস্থ।

অনেক কথার ভূমিকা করিয়া, অনেক কথার আড়ম্বর করিয়া খানিক

ক্ষণ পরে বিতাস্থ কহিল, এ সকল স্থানে একটু একটু মধুপান করিতে হয়।”

“ক্ষমা কর ভাই! আমি সে অভ্যাস রাখি না।”

“তবে আমার কথা শুনিবে কিরূপে?”

“কর্ণ আমার বাধ্য আছে।”

“তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু ওষ্ঠ-রসনা আমার বাধ্য নহে।”

“তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা তুমি কর, শীঘ্র শীঘ্র আমারে বিদায় করিয়া দাও।”

“সে কি! এইমাত্র তুমি না বলিলে তুমি বিদেশী? সমস্তদিন আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছিলে, আশ্রয় দেখাইয়া দিলাম, তবে কোন্ আশ্রয়ের নিমিত্ত বিদায় চাহিতেছ?”

ব্যস্ত হইয়া বিমনস্কভাবে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, “তোমার কি বলিবার আছে, বলিয়া যাও।”

“পাঁচ সহস্র মুদ্রা।”

“তাহা ত শুনিযাছি। ডাকের চিঠিতে ধনসুখ দাস দয়াল দাসের পাঁচ সহস্র টাকা হারাইয়াছে, তাহা ত শুনিয়াছি। আমাকে তাহার কি করিতে বল?”

“তুমি আমার পরম বন্ধু। সেই ক্ষতিটী তুমি পূরণ করিয়া দাও। তাহা হইলেই আমি সংসারে মান সম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি। তাহা না হইলেই জীবিকা লোপ হয়।”

“ভাল বুঝিতে পারিলাম না, তুমি আমারে কি বলিতে চাও?”

“পাঁচ সহস্র মুদ্রা।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন; “বিদেশে আমার উপার্জ্জন অল্প। তোমারে আমি এতদূর সাহায্য করিতে পারি, এমন সংস্থান নাই।”

“তবে বলিয়া দিব, তবে ধরাইয়া দিব। তুমি সেনাদল হইতে পলাইয়া আসিয়াছ, অমার্জ্জনীয় অপরাধ, কিছুতেই নিস্তার পাইবে না।”

ভূপেশচন্দ্র কাঁপিয়া উঠিলেন। যে স্বরে কথা কহিতেছিলেন, সে স্বরকে

সম্ভব মত নম্র করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "পাঁচ সহস্র মুদ্রা আমার নাই।"

"তুমি কি সংবাদপত্র পাঠ কর?"

"নিত্য।"

"তাহাতে কোন ঘোষণাপত্র দেখিয়াছ?"

সুদৃঢ় মানসকে আবও দৃঢ় করিয়া দণ্ডে দণ্ডে পেষণ করিয়া আরক্ত বদনে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "দেখিয়াছি। একশত মুদ্রা!"

"তুমি পলাতক সৈনিক, তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একশত মুদ্রা পারিতোষিক ঘোষণা।"

"বুঝিয়াছি। একশত মুদ্রার লোভে তুমি আমারে ধরাইয়া দিবে। আমার নিকট পাঁচ সহস্র মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণ করিবে। জানি আমি তোমার স্বভাব, একদিন ছলনা করিয়া বন্ধুতা দেখাইয়াছিলে, পাঁচসহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেও এখন কিন্তু তুমি সেই শত মুদ্রার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না।"

"পারিব।"

"পার আর নাই পার, ভগবানকে সাক্ষী করিয়া যেরূপে পাবি, আমি তোমাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব। যাঁহার চক্ষু সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে, যাঁহার কর্ণ ত্রিভুবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যও শ্রবণ করে, সংসারের জীবের পরামর্শ যাঁহার শ্রবণ কুহরকে প্রতারণা করিতে পারে না, সেই জগন্ময় জগৎপিতা আমার সাক্ষী। উপকারের প্রত্যুপকার তুমি কেমন জান, সেই বিশ্বপিতাকে জানাইয়া তাহা আমি দর্শন করিব।"

"দর্শন করিবার পূর্ব্বে প্রদান করা তোমার সৎকার্য্য।"

"সৎকার্য্য মনে করিয়াই আমি তোমার উপকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু জানিতেছি, তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি পুনরায় বিশ্বাসঘাতক হইবে। কালসর্প তোমাব মাথার উপর ফণা ধরিয়া রহিল, এই থানে অপেক্ষা কর, এক দণ্ড। আমি আসিতেছি।"

ভূপেশচন্দ্র সরাই হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যে গৃহে অপ্সরা-সুন্দরী চিন্তাকুলা, বিমর্ষবদনে বসিয়া,—সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। যতক্ষণ

ভূপেশচন্দ্র ঘরে না আসেন, ততক্ষণ অপ্সরাসুন্দরীর হৃদয়ে শান্তি থাকে না। একবার গৃহে প্রবেশ করেন, একবার বাহিরে আইসেন। বাতাসে যেন গৃহদীপ কাঁপে, বিরামগৃহ কাঁপে, অন্তরাত্মা কাঁপে। ভূপেশচন্দ্রকে দর্শন করিয়া অকারণ পরিতাপিনী,—অকারণ কি সকারণ, এখন আমরা বলিতে পারি না, অপ্সরাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূপেশ! আজ আমি তোমারে কি নামে ডাকিব? ভূপেশ না ইন্দুভূষণ? না, সে নামে আমি ডাকিতে পারিব না ভূপেশ। এতদিন যে হাসি হাসি মুখ দেখিয়াছিলাম, আজ সেই মুখখানি এমন পাণ্ডুবর্ণ কেন? জাগিয়া জাগিয়া আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, যেন কোন দুর্নিমিত্ত ঘটিয়াছে, সেই স্বপ্নই কি তবে সত্য?"

"না রাজকুমারি! স্বপ্ন সত্য হয় না। বিতাসু আসিয়াছে। বিপদে পড়িয়া বিতাসু আমার কাছে কিছু সাহায্য চাহিতেছে। কিন্তু আমি ভাবিতেছি, তত সামর্থ্য আমার নাই।"

"বিতাসু? বিতাসু? সেই সাংঘাতিক,—মর্ম্মান্তিক, সাংঘাতিক দস্যু বিতাসু? উঃ! জীবিতেশ্বর! মূর্চ্ছা যেন আমারে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে। বল, শীঘ্র বল, ভূপেশ! শীঘ্র বিদায় করিয়া দাও। বল, তাহার কি প্রার্থনা।"

"পাঁচ সহস্র মুদ্রা।"

"—পাঁ—চ—স—হ—স্র?"

"তাহাই ত বলিতেছে। তাহাই ত তাহার প্রার্থনা।"

"আমাদের হৃদয়-শোণিত শত মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া দেয় না। পাঁচ সহস্র কোথা হইতে মিলাইব?"

"না মিলাইলে শত্রু বিদায় কিরূপে করিব?"

"ভূপেশ! সংসারে আমি কেবল তোমারে ভালবাসি। তোমার মুখ ম্লান দেখিলে আমি জগৎ সংসার অন্ধকার দেখি। তুমি কি পাঁচ সহস্র অঙ্গীকার করিয়াছ?"

"অগত্যা।"

"তবে আমার এই অলঙ্কারগুলি গ্রহণ কর। তোমার অঙ্গীকার পালন

করা আর তোমার প্রসন্ন মুখ দর্শন করা এই অভাগিনী অপ্সরার জীবনের একমাত্র সার ব্রত।”

অপ্সরার অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া কুমার ভূপেশচন্দ্র সাশ্রুনয়নে চিরশত্রু বিতাস্থকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। বিকট বদনে সাহায্যদাতার দিকে ভ্রূকুটী ভঙ্গী করিতে করিতে দুরভিসন্ধিপরিচালিত বিশ্বাসঘাতক বিতাস্থ সরাই হইতে বহির্গত হইল। ভূপেশচন্দ্রও বাহির হইলেন। গুপ্ত অনুসন্ধানে বিতাস্থ পূর্ব্বে জানিয়াছিল, ভূপেশচন্দ্র কোথায় থাকেন, নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত অন্ধকারে প্রচ্ছন্নভাবে পশ্চাৎগামী হইল। পথে যাইতে যাইতে ভূপেশচন্দ্র পুনঃ পুন পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

উৎপীড়ন, ছলে অর্থ আকর্ষণ, আর সে রাত্রে সেই আগন্তুকের সহিত যে প্রকার কথোপকথন, ভূপেশচন্দ্র তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত অপ্সরাসুন্দরীর নিকট গল্প করিলেন। অপ্সরাসুন্দরী স্বভাবসিদ্ধ সরলতা-গুণে তাহাতে যে আশু কোন বিপদ আছে, এরূপ মনে ভাবিলেন না।

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে কমল বন যেমন প্রফুল্ল হয়, অপ্সরা-সুন্দরী তদ্রূপ প্রফুল্লমুখী হইয়া ভূপেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভূপেশচন্দ্র মহা বিষণ্ণ। বদন পাণ্ডুবর্ণ। যেন কোন প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। অপ্সরাসুন্দরী তদ্দর্শনে অত্যন্ত কাতরা হইয়া, মৃদু বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভূপেশ! গত রজনীতে যে ফুলটী তেমন প্রফুল্ল হইয়া ফুটিয়া ছিল, আজ অকস্মাৎ কি নিরাশাতপনে সেই ফুলটী এমন শুখাইয়া গিয়াছে?” ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, “মনে আর আমার শান্তি নাই। লক্ষণ বড় ভাল বোধ হইতেছে না। অনেক চেষ্টা করিয়াও মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। রাত্রি শেষে এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই স্বপ্ন স্মরণে চিত্ত আরও আকুলিত হইতেছে। ধূর্ত্ত বিতাস্থ বোধ করি, দুটী রাত্রিও বিশ্বাস রাখিতে পারিল না। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আজি-কার সূর্য্য অস্তগত হইবার পূর্ব্বেই সেই বিশ্বাসঘাতক কোন প্রকার বিষম অমঙ্গল ঘটাইবে।”

করুণাপূর্ণ নয়নে ভূপেশচন্দ্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত সন্দিগ্ধ-

তবে অপ্সরা কহিলেন, "তাহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? গত রাত্রে তত করিয়া যাহার বিশ্বাস ক্রয় করা গেল, এত শীঘ্র কি সেই ব্যক্তি তাহা ভুলিয়া যাইবে?"

"আমার মন যেন বলিয়া দিতেছে, ভুলিয়া গিয়াছে! সংসারের লোভী লোকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থলোভেও মহা অনর্থ বাধাইতে পারে। অর্থলোভ না থাকিলেও, সামান্য বস্তর লোভেও তাহারা বিশ্বাস নষ্ট করে।"

"তবে এখন কি করিলে পরিত্রাণ হয়?"

"পুনরায় এস্থান হইতে পলায়ন ভিন্ন পরিত্রাণের আর অন্য উপায় দেখি না।"

"তবে তাহাই স্থির কর।"

"মনে মনে তাহাই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু তোমাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে।"

"বল। তোমার জন্য আমি কি কার্য্য করিতে অপ্রস্তুত?"

"নারীবেশ গোপন করিয়া তোমারে পুরুষ বেশ ধারণ করিতে হইবে। একবার যেমন বিদ্যানিধি হইয়াছিলে, এই বিপদ সময়েও সেইরূপ ছদ্মবেশ প্রয়োজন।"

"তাহাই স্বীকার। কখন প্রস্থান করা তোমার অভিলাষ? রাত্রি কালে?"

"না, ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে আমার সাহস হইতেছে না। সূর্য্য-রশ্মি আরও উজ্জ্বল হইয়া তেজস্কর হইতে না হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়।

অপ্সরাসুন্দরী আর তর্ক করিলেন না। গৃহস্বামিনী হিরণ্ময়ীর প্রাপ্য অর্থ শোধ করিয়া দিয়া উভয়েই তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কি কারণে এস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন না। হিরণ্ময়ী ক্ষুণ্ণ হইলেন। উভয়ের অমায়িক সদ্ব্যবহারে তিনি পরম পরিতুষ্ট ছিলেন। বিদায়ের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। মুখপানে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরীও আপনার নেত্রনীর মার্জ্জন করিলেন।

সেস্থানে আর অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া আপনাদের শয়নকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহ-সরঞ্জামগুলি একস্থানে গুছাইয়া বন্ধন করিলেন। কিঙ্করী রোহিণী ভারবাহী আহ্বান করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বাহির হইল। ভূপেশচন্দ্র আপন কক্ষের গবাক্ষে অচঞ্চল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাটীর সম্মুখে প্রায় দুই শতাধিক হস্ত পরিমিত পথ নিতান্ত সংকীর্ণ। সে পথে শকট প্রবেশ করিতে পারে না। গবাক্ষ পথ দিয়া ভূপেশচন্দ্র সেই সংকীর্ণ পথে দূরে দেখিলেন, এক জন দীর্ঘাকার পুরুষ সদর্প পদসঞ্চারণে সেই গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পরিধান রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ। মস্তকে সামরিক উষ্ণীষ। কটিতটে রজত-কোষ-নিবদ্ধ সুদীর্ঘ তরবারি, দক্ষিণ হস্তে একগাছি অর্দ্ধবক্র যষ্টি। পশ্চাতে তিন জন কোতয়ালির প্রহরী। ভূপেশচন্দ্র প্রথমে দূর হইতে সে লোককে চিনিতে পারিলেন না। কতকদূর নিকটে আসিলে দেখিলেন, দেখিয়াই চিনিলেন, সর্ব্বশরীর যেন বিদ্যুৎ সঞ্চালনে কাঁপিয়া উঠিল। সে লোক অপর কেহই নহে, সেই ধূর্ত্ত, পাপাচার, নরকলঙ্ক, নৃসংশ, নীচাশয় লিঙ্গেশ্বর। সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভূপেশচন্দ্রের বদনমণ্ডল প্রচণ্ড আতপ তাপিত কুসুমের ন্যায় বিশুষ্ক হইয়া আসিল। সন্ত্রস্ত ভাবে পশ্চাৎদিকে মুখ আবর্ত্তিত করিয়া অপ্সরাসুন্দরীকে কহিলেন, "রাজকুমারি! যে আশঙ্কা করিতেছিলাম, অল্পক্ষণ অতীত হইতে না হইতেই সেই আশঙ্কা এই স্থলেই ফলবতী হইল। দেখ, এই দেখ, সেই পিশাচের কার্য্য কেমন ভয়ঙ্কর, এই দেখ।"

অপ্সরাসুন্দরী শশব্যস্তে গবাক্ষ সমীপবর্ত্তিনী হইয়া নিম্নভাগে চাহিয়া দেখিলেন, সেই করাল মূর্ত্তি! দেখিবামাত্র কোমলহৃদয়ার কোমলহৃদয় বিকম্পিত হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া যেন কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "শান্ত হও। ভয় পাইও না। এ সংসারের নাম বিপদক্ষেত্র, চতুর্দ্দিকেই আমাদের বিপদরাশি পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এই বিপদক্ষেত্রই মানুষের পরীক্ষাক্ষেত্র। তুমি অবলা। অবলাহৃদয় সদা সর্ব্বক্ষণ স্নেহ, দয়া আর ভয়ের আধার। ধৈর্য্যধারণ কর। বিপদে তুমিই আমার সান্ত্বনা। তুমি অস্থির হইলে আমি কোন ক্রমেই সুস্থির থাকিতে পারিব না।"

সমান প্রশান্তভাবে বক্র গ্রীবায়, সমুজ্জ্বল নেত্রে ভূপেশের নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ভূপেশ! আমারে তুমি তেমন অবলা বিবেচনা করিও না। আমি শান্তই রহিয়াছি। হৃদয় কোমল বটে, কিন্তু সময়ে আমি সেই কোমলতাকে কঠিন করিতে পারি। আমার চিত্ত অটল। কিন্তু তুমি?"

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমার-চিত্ত যদি অটল হয়, তুমি যদি সুস্থির থাকিতে পার, আমিও অবশ্য সুস্থির থাকিতে পারিব।"

"তাহাই আমি দেখিতে চাই। বিপদে ধৈর্য্যই পরম সেতু। যাহারা সহ্য করিতে জানে, জগৎসংসারে তাহারাই সমস্ত বিপদে উত্তীর্ণ হইতে পারে। বিপদে আমি বিপত্তকাণ্ডারীকে স্মরণ করিব। কোন চিন্তা নাই।"

কথাগুলি বলিতে যতক্ষণ গেল, উভয়ের কথোপকথনে তাহার অর্দ্ধেক সময়ও যায় নাই। ক্ষণকাল মধ্যেই সেই চারি মূর্ত্তি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট। লিঙ্গেশ্বরকে পুরোবর্ত্তী দর্শন করিয়াই ভূপেশচন্দ্র অচঞ্চলপদে, গম্ভীর বদনে নিকটবর্ত্তী হইয়া নিঃশঙ্ক হৃদয়ে কহিলেন, "আমি তোমার বন্দী। আমি তোমার করে আত্মসমর্পণ করিতেছি। আমাকে উৎপীড়িত করিও না।"

ভূপেশচন্দ্র জানিতেন, সে ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা করা নিরর্থক। বলপ্রকাশ করা বিফল। সুতরাং সে কল্পনাকে মনেও স্থান দিলেন না।

কেন শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থানের পরামর্শ, এতক্ষণে হিরণ্ময়ী তাহা বুঝিতে পারিলেন। এতক্ষণে তিনি স্পষ্ট জানিলেন, ইন্দুভূষণ সেনাদলের পলাতক অপরাধী। ব্যবহারে দয়া জন্মিয়াছিল, আকস্মিক বিপদ দর্শনে উভয়কেই নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। তাঁহার সান্ত্বনাবাক্যে যেন কতক আশ্বস্ত হইয়া ভূপেশচন্দ্র সকরুণ কটাক্ষে অপ্সরাসুন্দরীর চিন্তাকুল বদন অবলোকন করিলেন। তাঁহাদের সে সময়ের নয়নভঙ্গী দর্শন করিলে কেহই বুঝিতে পারিত না যে, মহাবিপদ সম্মুখে উপস্থিত। এত দূর ধৈর্য্য, এত দূর দৃঢ়তা, এত দূর গাম্ভীর্য্য।

ভীষণদর্শন লিঙ্গেশ্বর আপন পরিচ্ছদ মধ্য হইতে এক জোড়া হাতকড়ি

বাহির করিয়া একজন প্রহরীর হস্তে দিল। হাকিমী স্বরে হুকুম করিল, "পলাতক বন্দীকে বন্ধন কর।" করুণস্বরে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "পরমেশ্বরের দোহাই, এই অমর্য্যাদা আমাকে ক্ষমা কর। আমি পলায়ন করিব না। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, কথনই না। কথনই আমি সে চেষ্টা করিব না।"

অপ্সরাসুন্দরীও ভূতলে জানু অবনত করিয়া করযোড়ে লিঙ্গেশ্বরকে কহিলেন, "তোমার হৃদয়ে যদি কিছুমাত্র দয়া থাকে, সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, কাতরে মিনতি করিতেছি, ক্ষমা কর। বন্ধন করিও না।" সেই নৃসংশকে এই কটি কথা বলিয়া পুনরায় সকরুণ দৃষ্টিপাতে ভূপেশচন্দ্রকে সান্ত্বনা করিলেন। সেই দুটী পদ্ম চক্ষু যেন নিমেষের মধ্যে কত কথাই প্রকাশ করিয়া কহিল। সেই দুটী পদ্ম চক্ষু যেন নিশ্চয় করিয়া কহিয়া দিল, তুমি যদি অটল ভাবে সাহস অবলম্বন করিয়া এ বিপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, আমি দুর্ব্বল হইব না। আমার সাহস আমারে পরিত্যাগ করিবে না।"

ভীষণ স্বভাব নৃসংশ লিঙ্গেশ্বর, ভীষণ কর্কশস্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাজে কথা লইয়া আর আমি কালহরণ করিতে পারি না। আমার শকট অধিকক্ষণ দাঁড়াইবে না। প্রহরি! ইহা তামাসার বিষয় নহে, তামাসার স্থল নহে। শীঘ্র কর্ত্তব্য পালন কর। অবিলম্বে পলাতকের হস্তে হাত কড়ি বন্ধন কর।"

ভূপেশচন্দ্রের অনুনয় বিফল হইয়া গেল, অপ্সরাসুন্দরীর কাকুতি মিনতি নিষ্ঠুরতা স্রোতে ভাসিয়া গেল, ভীম প্রতাপে কোতয়ালী প্রহরী সেই ক্রোধান্ধ নির্দ্দয় পিশাচের আজ্ঞা পালন করিল। বন্ধনগ্রস্ত হইয়া ভূপেশচন্দ্র মস্তক অবনত করিলেন। পাপাশয় লিঙ্গেশ্বর তাঁহাকে বন্দী করিয়া ভূতলে বেত্রাঘাত করিতে করিতে সদর্পে তাঁহাকে লইয়া রাজপথে বহির্গত হইল। অপ্সরাসুন্দরী অযত্ন মুক্ত-কেশে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ভূপেশচন্দ্র বন্দী। বামে দক্ষিণে কোন দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন না। যে পথে তিনি মহা সম্ভ্রমে, মহা গৌরবে শত শত লোকের অভিবাদন প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন গতিবিধি করিতেন, আজ হাতকড়ি-

বদ্ধ হস্তে বিনম্র বদনে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া সেই পথে পদব্রজে গমন করিতেছেন!

দেখ, জগৎসংসার! চাহিয়া দেখ, সময়ের বিচিত্রগতি কখন কি প্রকারে বিবর্ত্তিত হয় দেখ!

অপ্সরাসুন্দরী সমান প্রশান্তভাবে লিঙ্গেশ্বরকে সম্বোধন পূর্ব্বক গম্ভীর বচনে কহিলেন, "তুমি ত তোমার কার্য্য করিলে, কিন্তু আমার একটী শেষ প্রার্থনা। ইহাঁকে যেখানে লইয়া যাইবে, আমি কি ইহাঁর সঙ্গে সেই থানে যাইতে পারি?"

"যদি তুমি শকটের ভাড়া প্রদান করিতে পার, আমার আপত্তি নাই।"

সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা প্রশস্ত রাজপথে উপস্থিত হইলেন। স্নেহাস্পদ ভূপেশচন্দ্রের দুর্দ্দশা দর্শনে রাজপথের শত শত লোক হায় হায় করিতে লাগিল।

লিঙ্গেশ্বর সর্ব্বাগ্রে শকটে আরোহণ করিয়া প্রহরীর সহিত বন্দীকে শকটারোহণে আদেশ প্রদান করিল। ভূপেশচন্দ্র অধোবদনে শকটের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অপ্সরাসুন্দরী।

শকট চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর এক জন পূর্ব্ব পরিচিত সদয় হৃদয় সওদাগর দ্রুতগতিতে শকটের নিকটবর্ত্তী হইয়া অপ্সরাসুন্দরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি! তুমি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী দয়া। এই লও, এই গ্রহণ কর। কল্যাণময় পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।" সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া অপ্সরার বিস্তৃত হস্তে তিনি একটী কাগজের মোড়ক সমর্পণ করিলেন। তাহাতে কি, সময়ে প্রকাশ পাইবে। সেই সওদাগর কে, সময়ে পাঠক মহাশয় তাহারও পরিচয় পাইবেন।

অষ্টবিংশ প্রবাহ।

বিচার।

"জ্বলিছে বিষাক্ত বহ্নি হৃদয়ে আমার।
প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার!"

পলাশী।

ভূপেশচন্দ্র পূর্ব্বে যে সেনাদলে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বস্থল হইতে সে সেনাদল পঞ্চনদক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গুজরাট হইতে পঞ্জাবে গমন করিতে পথে কি ভাবে কতদিন কাটিয়া গেল, বিপদাপন্ন ভূপেশচন্দ্র তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না। ফলে তাঁহারা পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। সৈনিক পুরুষেরা ভূপেশচন্দ্রকে এক অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করিল। অপ্সরাসুন্দরী অবশ্যই সে কারাকূপে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন না, সুতরাং প্রবেশ করিলেন না। গুজরাট হইতে প্রস্থানের অগ্রে তাঁহার পুরুষ বেশ ধারণের পরামর্শ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু বিপদ এত শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল যে, সংকল্পসিদ্ধির অবসর হইয়া উঠিল না। কাজেই তিনি মুক্তকেশী নারীবেশে বন্দীশকটে দূরদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। নারীবেশেই পঞ্জাবের শতদ্রু তীরবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া লইয়া আপনার বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধা পঞ্জাবী সেই গৃহে বাস করিত, তাহারা নিতান্ত মন্দলোক ছিল না। কিন্তু সমবেদনা কাহাকে বলে, তাহা তাহাদের দুর্বল হৃদয়ে অপরিজ্ঞাত ছিল। গৃহের ভাড়া পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিত, যে কেহ বাস করুক না কেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার ছিল না। তাহাদের নিজের ব্যবহারযোগ্য গৃহগুলি ব্যতিরেকে কুটীর মধ্যে একটী গৃহ প্রায় সর্ব্বদাই শূন্য থাকিত। অপ্সরাসুন্দরী অতি অল্প ভাড়ায় সেই গৃহটী অধিকার করিলেন। মনে অষ্টপ্রহর নিদারুণ চিন্তা। মানসে যাঁহাকে তিনি নিরন্তর দেবতার মত পূজা করেন, যদিও বিবাহ হয়

নাই, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য যিনি তাঁহার পবিত্র মানসমন্দির হইতে অন্তরে বাস করেন না, সেই ভূপেশচন্দ্রের এখন কি দশা! তিনি অন্ধকারাকূপে বন্দী। নিষ্ঠুর লোকেরা তাঁহাকে কতই যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, আহার দিতেছে কি অনাহারে রাখিতেছে, রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইতেছে কি না, বিচারে তাঁহার প্রতি কি করাল দণ্ডের অনুমতি হইবে, সে দণ্ড তিনি সহ্য করিতে পারিবেন কি না, অহরহ এই সকল চিন্তায় অপ্সরাসুন্দরী সায়ন্ন-কমলিনীর ন্যায় ম্রিয়মাণা। নিদ্রা তাঁহারেও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এক একবার তিনি ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে যোড়করে প্রার্থনা করেন, "বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবি! তুমি জগতের যন্ত্রণানিবারিণী, আমার প্রতি এই দয়া কর, যদবধি পুনরায় সেই মনোময়ের দর্শন না পাই, তদবধি আমার নেত্রসমীপে নৃত্য করিও না। আমি অষ্ট প্রহর জাগরণ করিয়া সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিব, মানস-নয়নে সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিব। বিপদের যদি পরিত্রাণ থাকে, সেই পরিত্রাণের পন্থা চিন্তা করিব। পরমেশ্বর! জগতে তুমি আমারে অভাগিনী করিয়া সৃজন করিয়াছ, আমি তোমার পাদপদ্মে কি অপরাধ করিয়াছিলাম জগন্নাথ? জন্মাবধি সজ্ঞানে ইচ্ছাপূর্ব্বক জগতের কোন প্রাণীব আমি কোন অনিষ্ট করি নাই। মনে জ্ঞানে কল্পনাপথেও কাহারও অমঙ্গলচিন্তা এই অবলার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের প্রতিও আমি কখনও বিরুদ্ধাচরণ করি নাই। বিশ্বদেব! তুমি অন্তর্যামী। আমার অন্তঃকরণ তুমি জান। আমার অদৃষ্টে এমন ঘটনা কেন জগদীশ! যদি আমি তোমার করুণার সান্ত্বনা না পাই, জানিতেছি, নিশ্চয়ই পাগলিনী হইয়া যাইব।"

ভূপেশচন্দ্রের সহিত অপ্সরাসুন্দরীর সাক্ষাৎ ত হইতেই পারে না, লিপিযোগে বাক্য-বিনিময়ও বন্ধ। বেদনাশান্তির কিছুমাত্র উপায় নাই। বিষাক্ত অনলে সর্ব্বক্ষণ অন্তঃকরণ জ্বলিয়া যাইতেছে। বনে যেমন দাবানল জ্বলে, অপ্সরার মনোকাননে লহমে লহমে সেইরূপ দাবানল জ্বলিতেছে। চিন্তার বিরাম নাই, যন্ত্রণার বিরাম নাই, সেই প্রজ্বলিত অনলের কিছুতেই নির্ব্বাণ নাই।

একটী উপায় হইল। বিধাতা নির্দ্দয় নহেন, তাঁহার প্রতি যাহার

অচলা ভক্তি থাকে, তাহাকে তিনি সান্ত্বনা প্রদান করেন, কিছু দিন শতদ্রু-তীর-পল্লীতে বাস করিতে করিতে পাঁচ সাতটী স্ত্রীলোকের সহিত অপ্সরা-সুন্দরীর আলাপ পরিচয় হইল। ভূপেশচন্দ্র যখন সেনাদলে ছিলেন, সেই সময় সেই দলের কয়েকজন সৈনিকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। অপ্সরার নিবাসপল্লীতে তাঁহাদের মধ্যে একজন সৈনিকের আবাস। সেই সৈনিকের পত্নী প্রায় প্রতিদিন অপসরার সহিত দেখা করিতে যান। সদয় ভাবে তিনি সমাচার আনিয়া দেন, ভূপেশচন্দ্র কুশলে আছেন, তাঁহার শরীর সুস্থ আছে। আসন্ন বিপদে তিনি অবসন্ন হন নাই। তাঁহার চক্ষে জল নাই। এই সকল সমাচার শ্রবণ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কেবল এক একটী মর্ম্মভেদী নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, আর বিশুষ্ক নয়নে সেই বীর-বনিতার মুখপানে চাহিয়া থাকেন। একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিচারের দিন কবে ধার্য্য হইয়াছে, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ ?"

"শুনিয়াছি। এক সপ্তাহ পরে বিচারের দিন।"

"কে কে বিচার করিবেন, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ ?"

"শুনিয়াছি। হাকিম একজন, মধ্যস্থ দ্বাদশজন।"

"প্রধান হাকিমের নাম কি, জান ?"

"সেনাপতি আনোয়ার বখ্ত।"

"তাঁহার প্রকৃতি কেমন ?"

"বড় কর্কশ। সে প্রকৃতিতে দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই।"

অপ্সরাসুন্দরী আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কল্পনা ছিল, বিচারের অগ্রে প্রধান বিচারপতির নিকট গমন করিয়া ভূপেশের অনুকূলে কিঞ্চিৎ লঘুদণ্ড প্রার্থনা করিবেন। বীরাঙ্গনার বাক্যে সে কল্পনায় আঘাত পড়িল। উঃ! প্রণয়ের কি গাঢ়তর বন্ধন! তথাপি দৃঢ় সঙ্কল্প। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া বীরাঙ্গনা বিদায় হইলেন।

সপ্তাহ বিগমে এক প্রভাতে সৈনিক-শিবিরের একটী বিরাম-কক্ষে সেনাপতি আনোয়ার বখ্ত আর দ্বাদশ জন মধ্যস্থ উপবিষ্ট আছেন। প্রধান বিচারক আনোয়ার বখ্ত দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত অনুরক্ত। গত রজনীতে জুয়াখেলায় তিনি বহু মুদ্রা হারাইয়াছেন। মন অতিশয় চঞ্চল।

কি বলিতে কি বলেন, ধারণা করিতে পারেন না। অথচ বিচারাসনে উপবেশন করিতে হইবে। পার্শ্বে এক জন বৃদ্ধ। সমস্ত রাত্রি তিনি শয়ন করিবার অবসর পান নাই। ঘন ঘন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর হাই তুলিতেছেন। বৃদ্ধের পার্শ্বে এক জন নবীন যুবা। তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশের সীমা অতিক্রম করে নাই, বৃদ্ধের কাণে কাণে তিনি চুপি চুপি কহিতেছেন, "মহাশয়! এ আসামী যে অপরাধে অপরাধী, এমন অপরাধ জন্মে আমি কখনও শুনি নাই। বড় গুরুতর অপরাধ। গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত।" যে ভাবে যে ভঙ্গীতে এই অষ্টাদশ বর্ষীয় ন্যূনবয়স্ক যুবা এই কথাগুলি কহিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, জগতে ব্রহ্মাণ্ডের বহুজ্ঞান, বেদশাস্ত্র তাহার অন্তরমধ্যে সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই যুবার পার্শ্বে অভিনব সৈনিক স্বপনলাল। ছয় মাস পূর্ব্বে তিনি অর্দ্দলিদার সৈনিকপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, আজ তিনি ভূপেশচন্দ্রের উচ্চ পদস্থ, ভূপেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক দয়া। বিষাক্ত নয়নে তিনি ঘন ঘন সকলের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। কেবল তিন চারি জন বিজ্ঞ ভদ্রলোক দয়াবশবর্ত্তী হইয়া ভূপেশচন্দ্রের অনুকূলে পরিত্রাণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কথা কহিলেন না।

বেলা এক প্রহর অতীত। বিচারগৃহ লোকারণ্য। বিচারপতি আসিয়া সেইরূপ বিমর্ষভাবে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে মধ্যস্থবৃন্দের সভা। সম্মুখে শৃঙ্খলবদ্ধ বন্দী দণ্ডায়মান।

অনেক বন্দীর ইতিহাস আমরা শ্রবণ করিয়াছি, বিচারালয়ে উপস্থিত থাকিয়া অনেক অপরাধীর বিচার আমরা দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এমন বন্দী কখনও দেখি নাই। এমন অপরাধীর বৃত্তান্তও কখনও শুনি নাই। বিপক্ষবেষ্টিত বিচারাগার। তথাপি তাহার মুখ দেখিলে কেহ এমন মনে করিতে পারে না যে, তাহার প্রতি সাংঘাতিক দণ্ডাজ্ঞা হইবে, সেই ভয়ে বিকম্পিত;—সেই ভয়ে বিমর্ষ। স্বভাবতঃ যেমন গম্ভীর ভাব, ঠিক তেমনি গম্ভীর। কম্প নাই, স্বেদ নাই, ভয়ের চিহ্ন মাত্র নাই, কেবল মুখের বর্ণ কিছু বিবর্ণ। অশ্রুশূন্য চক্ষু ম্লান অগ্নিবর্ণ।

এক একবার সকলের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া অভিলম্বিত বন্দী

হাকিমকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি অপরাধী। আমি পলায়ন করিয়াছিলাম, জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি অপরাধ অস্বীকার করিব না। আর কাহাকেও সাক্ষী মানিব না। আমার সাফাই নাই। কিন্তু কেন পলায়ন করিয়াছিলাম, কেন অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন কি না, জানি না, বুঝিতে হয়, এমন অবস্থাও যেন কাহারও না ঘটে। দারুণ, দারুণ, নিদারুণ মর্ম্মভেদী—মর্ম্মঘাতী, মর্ম্মযাতনা, মর্ম্মবেদনা আমাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কি যে সেই মর্ম্মঘাতী ঘটনা, কি যে সেই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, তাহা আমি বলিব না। তাহা শুনিবারও আপনাদের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল ধর্ম্মাধিকরণের ধর্ম্মত করুণা প্রার্থনা, এমন অবস্থায় যেরূপ ন্যায়সঙ্গত দণ্ডাজ্ঞা আপনাদের যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়, আমার মস্তকে তাহাই নিক্ষেপ করুন, অক্লেশে অটল ভাবে তাহা আমি সহ্য করিব।"

যিনি হাই তুলিতেছিলেন তিনি হাই তুলিতেছেন, যিনি ঝিমাইতেছিলেন, তিনি ঝিমাইতেছেন, যিনি জুয়াখেলার পরাজয় ভাবিতেছিলেন, তিনি তাহাই ভাবিতেছেন, যিনি বন্দী দর্শনের ভাণ করিতেছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন, যিনি ঈর্ষাকলুষিত হৃদয়ে, ঈর্ষ্যাকলুষিত নয়নে বন্দীর প্রতি নিশাত বিষাক্ত কটাক্ষ বরিবর্ষণ করিতেছিলেন, তিনি কালকূট-হলাহলে জর্জ্জরিত হইতেছেন। সকলে একবার আসন হইতে উঠিয়া গেলেন। পুনরায় সেই বিরাম-কক্ষ। অর্দ্ধ দণ্ড পরে ফিরিয়া আসিয়া সদস্যেরা (তিন চার জন ব্যতিরেকে) এক বাক্যে রায় দিলেন, "সেনাদলের যুবক সৈনিক, অধীনানন্দ, ভূপেশচন্দ্র ওরফে ছদ্ম নামধারী ইন্দুভূষণ বিনানুমতিতে পলায়ন অপরাধে অপরাধী।" হাকিম সাহেব অল্পক্ষণ মাত্র অবনত বদনে চিন্তা করিয়া আদেশ প্রদান করিলেন, "কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাবাস। নির্দিষ্ট পরিশ্রমে আলস্য হইলে প্রত্যেক বারের অপরাধে একশত বেত্রাঘাত।"

বিচারাসনের দিকে শির নত করিয়া সসম্ভ্রমে ভূপেশচন্দ্র সুস্থিরভাবে বিচারাসনের দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। বিচারপতির আদেশে জগতের অবাধ্য দুর্দ্দান্ত রক্তমুখ প্রহরীরা তাঁহাকে পুনরায় সেই অন্ধকূপে লইয়া

গেল। পূর্ব্বে আমরা বলিতে ভুলিয়াছিলাম, বিচারপতি আনোয়ার বখ্ত এক জন পাঠান। খোরাসানে নিবাস,—আনোয়ার বখ্ত খাঁ। যেদিন অপরাহ্নে তিনি এক জন নিরীহ ভদ্রলোককে সম্ভবাতিরিক্ত গুরুতর ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করাইয়াছেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর রাত্রি অনুমান এক প্রহরের সময় তিনি আপনার বিলাসগৃহে দুটী যুবতী কামিনীর সহিত সহাস্য প্রফুল্ল আস্যে রসিকতার গল্প করিতেছিলেন। আনোয়ার বখ্ত অবিবাহিত যুবা পুরুষ। বয়স অনুমান দুই কি তিন অধিক ত্রিশ। দেখিতে বেশ সুশ্রী। যে দুটী স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, তাহারা যুবা-জীবনের প্রাচীন প্রাচীন গল্প শুনিতে ভালবাসে। আনোয়ার বখ্ত প্রাচীন প্রাচীন গল্প বলিতেছিলেন না। আত্মশ্লাঘার আবরণ মোচন করিয়া বাক্যালাপপ্রসঙ্গে তাঁহার নিজেরই মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতেছিলেন। মাহাত্ম্য শব্দে আমরা এখানে আমাদের নিজের অভিধান প্রমাণে মহত্ত্ব অর্থ অবধারণ করিয়াছি। হাকিম সাহেব কহিতেছিলেন, "আমার যখন বাল্যাবস্থা অতীত হয়, আমি যখন কৈশোরাবস্থা ছাড়াইয়া যাই; আমার যখন যৌবনের সঞ্চার, সেই সময়ে আমি সেনাদলে প্রবেশ করি। নিত্য নিত্য অবাধ্য হইতাম। মাঝে মাঝে পলায়ন করিতাম, কখনও অপরাধী বলিয়া ধরা পড়ি নাই। যদি অধিক অপরাধ হইত, দুই একটী যৎসামান্য ভর্ৎসনা বাক্য ভিন্ন আমাকে আর অধিক দণ্ড ভোগ করিতে হইত না। যে অপরাধে আজ আমি পলাতক ভূপেশচন্দ্রকে তাদৃশ গুরু দণ্ডাজ্ঞা দিয়া আসিলাম, তেমন সামান্য অপরাধ আমি অনেক বার করিয়াছি, কেহই আমার কিছু করিতে পারে নাই। অর্থ—আর সম্ভ্রমের এতদূর প্রতাপ।"

আনোয়ার বখ্ত এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছিলেন, বিচারাসনে বসিয়া সে দিন যেন কত বড় সৎকার্য্য সাধন করিয়া ঈশ্বরের সৃষ্ট সংসারের কতই উপকার করিয়া আসিয়াছেন, সহাস্য বদনে সাহঙ্কার বাক্যে তাহারই পরিচয় দিতেছিলেন!!! মধ্যে মধ্যে সুরাপাত্র ঘুরিতেছিল, এমন সময় একজন কিঙ্কর আসিয়া সংবাদ দিল, দ্বারে একটা যুবতী স্ত্রীলোক উপস্থিত।

"স্ত্রীলোক!" মানসিক প্রফুল্লভাব গোপন করিয়া সবিস্ময়ে হাকিম

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোক! কে সে স্ত্রীলোক? কি জন্য আসিয়াছে?"

"নাম বলে না। দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর করিল, নামে প্রয়োজন নাই, কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র সাক্ষাৎ করিয়া হাকিম সাহেবের সহিত দুটী চারিটী কথা কহিবার ইচ্ছা।"

"তুমি কি তাহাকে চিনিতে পারিলে না?"

"না, চিনিতে পারিলাম না: কিন্তু অনুমানে বোধ হয়, যে স্ত্রীলোক ভূপেশচন্দ্রের সঙ্গে আসিয়াছে, সেই হইবে।"

"হা আল্লা!" যেন কোন পূর্ব্বস্মৃতিকে আহ্বান করিয়া দুষ্প্রবৃত্তি-পরিচালিত পাপবুদ্ধি আনোয়ার উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হা আল্লা! স্বর্ণভূষণ আমাকে কহিয়াছিল সে নারী পরমাসুন্দরী।—সত্যই কি তাই?"

"সত্য খোদাবন্দ! সত্যই তাই। তেমন সুন্দরী নারী আমি আর কোথাও দেখি নাই। তাহার রূপের কথা আমিও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু আজ দেখিলাম, মুখখানি অত্যন্ত বিমর্ষ। বড়ই যেন অসুখী। তাহাতেই বোধ করিলাম, সেই স্ত্রীলোক।"

"ওঃ!—আচ্ছা। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তুমি যাও। তাহাকে আনিয়া অভ্যর্থনাগৃহে বসাও। আমি যাইতেছি।"

বার্ত্তাবহ চলিয়া গেল। পার্শ্ববর্ত্তিনী কামিনীগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আনোয়ার বখ্‌ত কহিলেন, "তাহাকে কি এইখানে আনাইব?" আবার আপনা আপনি কি চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "না,—সেটী ভাল দেখায় না। তোমরা আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য ক্ষমা কর, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি। তাহার সঙ্গে যেরূপ কথোপকথন হয়, আমার মুখেই তোমরা সমস্ত শুনিতে পাইবে।"

"দেখো, যেন স্মরণ থাকে। যেন দেরি হয় না। দেরি হইলে আমরা তোমাকে খুঁজিতে বাহির হইব।" গলা কাঁপাইতে কাঁপাইতে একটী কামিনী এই কটী কথা বলিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাস্য করিল।

হাস্য করিয়া হাকিম সাহেব গৃহ হইতে বাহির হইলেন। যে গৃহে অপ্সরাসুন্দরী বসিয়া ছিলেন, মনোভাব গোপন করিয়া গম্ভীর বদনে তিনি

সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রূপ দেখিয়াই চমৎকৃত। রক্ত বসনে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতা পাণ্ডুগণ্ড বিষাদিনী মোহিনী মূর্ত্তি। দেখিবামাত্র দুরাশা-পীড়িত আনোয়ার বখ্ত এককালে মোহিত হইয়া গেলেন। সেই রমণীকে লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইল। একবার, দুইবার, তিনবার, সেই মোহিনীর আপাদমস্তক দর্শন করিলেন। ধৈর্য্য যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল। তথাপি কৌশলে চিত্তবেগ সম্বরণ করিয়া, যেন কিছুই জানেন না, সেইরূপ অপরিচিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কে গা তুমি? আমার কাছে তুমি কি চাও?"

মেঘ যেন পূর্ণচন্দ্র ঢাকা দিয়াছে। সুন্দরীর চন্দ্রমুখখানি অবিকল সেইরূপ বিষাদ মেঘে সমাবৃত। সেই বিষণ্ণবদনে, বিষাদিত স্বরে, অপ্সরা-সুন্দরী উত্তর করিলেন, "আমি অভাগিনী। হতভাগ্য ভূপেশচন্দ্রের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখিনী! আজ আপনি যাহার প্রতি নিদারুণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, সেই হতভাগ্য ভূপেশচন্দ্রকে আমি প্রাণে প্রাণে ভালবাসি।" এই করুণ বাক্যগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শিশির-সিক্ত উষা-কমলের ন্যায় অপ্সরাসুন্দরীর যুগল নয়ন-কমল বিষাদবারিতে অভিষিক্ত হইল।

"হতভাগ্য?" যেন কিঞ্চিৎ বিদ্রূপচ্ছলে আনোয়ার বখ্ত কহিলেন, "তুমি কি তাহাকে হতভাগ্য বল? যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া ধরা পড়ে, দণ্ড পায়, তাহাকে হতভাগ্য বলা আমার মতে অনুচিত।"

"মহাশয়! আহা! যে ঘটনায় সেই অপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা যদি আপনি জানিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমার ভূপেশের প্রতি আপনার দয়া হইত।" অশ্রুমুখী বিষাদিনী সজল লোচনে আনোয়ারের কূটবাক্যে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিলেন।

"তাই বুঝি তুমি তাহার প্রতি দয়া প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ?"

"হাঁ মহাশয়! আমি আপনার চরণে ধরিয়া মিনতি করি, আপনি তাহার প্রতি দয়া করুন। সম্পূর্ণ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি না, অনুগ্রহ করিয়া, সেই ভীষণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিছু লঘু দণ্ড আদেশ করুন।" এই কথা বলিয়া অভাগিনী অপ্সরাসুন্দরী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার চরণতলে নিপতিতা হইলেন।

পাপপ্রণয়াসক্ত আনোয়ার অপ্সরার হস্ত ধারণ করিয়া ভূতল হইতে তুলিলেন। যেন সস্নেহ ভাবের ভাণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "স্থির হও, রোদন সম্বরণ কর, উপবেশন কর। সকল কথারই মীমাংসা হইয়া যাইতেছে।"

অপ্সরাসুন্দরী আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন। মনে ভাবিলেন, ইঁহার বাক্যে যেরূপ দয়া ও সরলতার পরিচয় হইতেছে, ব্যবহারেও হয় ত সেইরূপ সততার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই আশ্বাসে আশা আর একবার অপ্সরার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি উপবেশন করিলেন। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মূর্চ্ছা যেন তাঁহারে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল। অনাহার, অনিদ্রা, মানসিক যন্ত্রণা আর অকূলপাথার চিন্তায় তাঁহার শরীর ও মন অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, হাকিমের ঐরূপ বাক্যে তখন যেন একটু বল প্রাপ্ত হইলেন, পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া হাকিম সাহেবকে যেন কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু চিত্তবেগ তৎকালে এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, একটীও কথা কহিতে পারিলেন না।

আনোয়ার বখ্‌ত কহিলেন, "কঠিন পরিশ্রম সহ দুইবৎসর কারাবাস। পরিশ্রমের গাফিলিতে শত শত বেত্রাঘাত, পলাতক আসামীর প্রতি এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তাহা তুমি জান?"

"শুনিয়াছি, শুনিয়াছি! যন্ত্রণার উপর আর আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না!" মূর্চ্ছাবায়ুগ্রস্ত রোগীর ন্যায় পুনঃপুন হস্তে হস্ত পেষণ করিতে করিতে কাতর বচনে অপ্সরা কহিতে লাগিলেন, "পায়ে ধরি, মিনতি করি, দয়া করুন! দয়া করুন!"

"তবে তুমি কি ভূপেশচন্দ্রের প্রতি নিতান্তই অনুরক্ত?" বিশাল কটাক্ষে যেন অপ্সরার রূপরাশি গ্রাস করিয়া উন্মত্তপ্রায় আনোয়ার বখ্‌ত এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। সরল হৃদয়া এই প্রশ্নের আর সেই কুটিল মূর্ত্তির নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। করযোড়ে সজলনয়নে কহিলেন, "পৃথিবীতে যদি কিছু সুখ থাকে, সেই সুখের প্রধান সামগ্রী আমার সর্ব্বস্বধন ভূপেশচন্দ্র। যদি কেহ নির্দ্দয় হইয়া আমার নিকট হইতে তাঁহাকে হরণ করে, কদাচ আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।"

"আঃ! তবে কি তুমি তাহাকে এতই প্রিয়তররূপে ভালবাস?" পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু রুক্ষ স্বরে পাপাশয় আনোয়ার সেইরূপে চাহিয়া এই ছলনা বাক্য উচ্চারণ করিলেন। মনে মনে তিনি বুঝিলেন, "যখন এতদূর অকপট অনুরাগ, তখন এই সুন্দরী রমণীকে লাভ করা নিতান্তই দুর্ঘট।" চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিলেন, "অপরাধ যদিও অত্যন্ত গুরুতর, তথাপি দণ্ডাজ্ঞা লাঘব করিবার আমার ক্ষমতা আছে। কেবল পলায়ন করাই তাহার একমাত্র অপরাধ নয়, নাম ভাঁড়াইয়া বহুদিন স্থানান্তরে বাস করিতেছিল।"

আশাকে একটু উদ্দীপিত করিয়া বিষাদিনী কহিলেন, "পূর্ব্বেই ত নিবেদন করিয়াছি, যে অবস্থায় সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে অবস্থার অপরাধ অবশ্যই মার্জ্জনীয়। আমি যেমন ভূপেশের প্রতি অনুরাগিণী, ভূপেশচন্দ্রও আমার প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত। আমার পিতা আমারে অপর পাত্রে দান করিতে সমুৎসুক। দূরদেশ হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমারই প্রেমানুরাগে ভূপেশচন্দ্র উন্মত্তবৎ পলায়ন করিয়াছিলেন, ভূমণ্ডলে এমন অকপট অনুরাগী প্রেমিক কে আছে, যে তাদৃশ সঙ্কটস্থলে কোন প্রকার অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য না হয়?"

"তবে তাহার প্রতি তোমার এতই প্রগাঢ় অনুরক্তি?" পুনর্ব্বার অতৃপ্ত নয়নে অপ্সরার বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে দুরাশয় প্রেমিক ব্যঙ্গস্বরে কহিতে লাগিলেন, "তাহার দণ্ড লাঘব করিবার নিমিত্ত তুমি কিছুই পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নও, এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা?"

"আপনি বিচারপতি। ধরাতলে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। আপনিই বলুন দেখি, তাহা কি স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? ভূপেশের মুক্তির জন্য আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিতে পারি। সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও যদি আমি তাহার নিরা-পৎত্রাণ করিতে পারি, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়াও যদি উদর পোষণ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, সানন্দ-প্রফুল্ল চিত্তে সমস্ত দুর্ভাগ্যকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতেও আমি কুণ্ঠিত নহি। ভূপেশচন্দ্রের দণ্ড লাঘব করিতে পারিলে অপর কোন কষ্টই আমারে অণুমাত্র কষ্ট প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর একবার অপ্সরাসুন্দরীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সুতীক্ষ্ণস্বরে আনোয়ার বখ্‌ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে সত্যই কি তুমি তাহার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পার? তবে সত্যই কি তাহার প্রতি তোমার এতদূর সুদৃঢ়---"

"হাঁ," বাধা দিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "হাঁ,—ধর্ম্ম,—কুমারী ধর্ম্ম, সতীত্বধর্ম্ম,--সেই একমাত্র পবিত্র ধর্ম্ম ব্যতিরেকে ভূপেশের জন্য আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।" পূর্ব্ব উত্তরে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া অপ্সরাসুন্দরী অবশেষে কেবল ধর্ম্ম ব্যতীত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ভ্রূকুটীভঙ্গীতে আবার অপ্সরার মুখের দিকে চাহিয়া, হাকিম সাহেব কহিলেন, "পলাতক ভূপেশের দণ্ডলাঘবের বিনিময়ে যদি কেবল তাহাই একমাত্র—"

"আর না! আনোয়ার বখ্‌ত! আর না! আর আমি সহ্য করিতে পারি না। যথেষ্ট হইয়াছে! যথেষ্ট হইয়াছে!" এই কথা বলিতে বলিতে সরোষ রক্তবর্ণ অধরে ভগ্নান্তঃকরণে ভয়াতুরা অপ্সরা আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। "আর না আনোয়ার বখ্‌ত! তোমার দয়াধর্ম্ম আমি বুঝিয়াছি। যে জন্য দয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, তাহার উচিত ফল পাইলাম!" বক্রগ্রীবায় ক্রোধকম্পিত স্বরে এই কথা বলিয়া, তেজস্বিনী কুমারী দ্রুতপদে গৃহের দ্বারাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

"দাঁড়াও! দাঁড়াও! সুন্দরি! আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াও! আর আমার একটী মাত্র কথা। মুখে যেমন তুমি বলিতেছ, অন্তরে যদি তুমি যথার্থই সেইরূপে তাহাকে —— "

"ঈশ্বর জানেন, যথার্থই আমি সেইরূপে প্রাণের সহিত ভূপেশচন্দ্রকে ভালবাসি।" হাকিমের বাক্যে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া অপ্সরাসুন্দরী এই সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদানে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে বক্র দৃষ্টি করিলেন। মনে ভাবিলেন, হাকিম হয় ত, তাঁহার প্রণয় পরীক্ষা করিতেছেন।

অনুমান মিথ্যা হইল। আনোয়ার বেখ্‌ত পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিলেন, "যদি তোমার প্রণয় এতদূর প্রগাঢ় হয়, তবে তাহার

দণ্ড লাঘবের জন্য কোন বস্তুই কি অপরিত্যাজ্য রাখা উচিত? আমার ক্ষমতা আছে, কিন্তু একটী পণ!"

অপ্সরা যাহা শুনিলেন, তাহা ঠিক বুঝিলেন কি না, শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহা চিন্তা করিতেছেন, সেই চিন্তার অবসরে আনোয়ার বখ্‌ত পুনরায় কহিলেন, "সেই যে পণ, তাহা কেবল তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে, কেবল একমাত্র তুমিই তাহা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিতে পার।" ব্যগ্রস্বরে এই কথা বলিয়া বিমোহিত প্রেমভাবে তিনি অপ্সরার হস্ত ধারণ করিলেন; সেই সময় এমনি ভাবে মুখপানে চাহিলেন যে, সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে অপ্সরাসুন্দরীর আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ধর্ম্ম সাক্ষী! কখনই না!" জোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "পাষণ্ড! ধর্ম্মের অবমাননা! কুমারীর গাত্রে হস্তার্পণ? কুভাবে করস্পর্শ? কখনই না!"

"আর একটী কথা।" পৃষ্ঠাবরণে গৃহের প্রবেশদ্বার অবরোধ করিয়া সেইরূপ ভঙ্গীতে আনোয়ার বখ্‌ত কহিলেন, "সুন্দরি! আমার কেবল আর একটী মাত্র কথা।"

"আধখানিও না! পথ ছাড়, যাইতে দাও! হা পরমেশ্বর! আমি কি এই অপমানের জন্যই এখানে আসিয়াছিলাম?" জোরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতরস্বরে অপ্সরা কহিলেন, "বিধাতঃ! এই অভাগিনীর অদৃষ্টে কি এত যন্ত্রণা লিখিয়াছিলে? আনোয়ার বখ্‌ত! পথ ছাড়িয়া দাও!"

"হাঁ, ছাড়িতেছি। কিন্তু অবশ্যই তুমি আমার কথা শুনিবে। আমি তাহার অর্দ্ধেক দণ্ড কমাইয়া দিতে পারি। ইচ্ছা করিলে আরও কমাইতে পারি, যদি তুমি—"

"আনোয়ার বখ্‌ত! আর বলিতে হইবে না! তোমার ব্যবহার আমি বুঝিয়াছি! আমি তোমার পায়ে ধরিয়া দয়া ভিক্ষা করিলাম, দুঃখিনী বলিয়া শরণাপন্ন হইলাম, তাহারই এই যথার্থ প্রতিফল বটে! নিদারুণ যন্ত্রণায় যে অবলার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সেই হৃদয়ে তীক্ষ্ণধার ছুরী বসাইয়া দেওয়া তোমার মত বিচারকের উপযুক্ত কার্য্যই বটে!" মহা-

ক্রোধে বিষাদিনীর নয়ন হইতে যেন অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। সক্রোধ ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বারংবার কহিতে লাগিলেন, "আনোয়ার বখ্‌ত! পথ ছাড়িয়া দাও, চলিয়া যাই।"

কতক ক্রোধে, কতক প্রবোধে আনোয়ার বখ্‌ত কহিলেন, "এই রকমে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কি তোমার উচিত?"

"হাঁ, আনোয়ার বখ্‌ত! এই রকমে যাওয়াই আমার উচিত! তুমি বর্ব্বর, তোমার নিকটে আমার কোন কার্য্য নাই।"

ক্রোধে কম্পিত হইয়া আনোয়ার বখ্‌ত একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, অপ্সরাসুন্দরী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, আনোয়ার আর বাধা দিতে পারিলেন না।

ঘৃণায়, লজ্জায়, অভিমানে, ভারগ্রস্ত হইয়া অপ্সরাসুন্দরী মন্থর পদে নিম্নতলে নামিয়া যাইতেছেন, সহসা গতিরোধ হইল। শরীর এত ভারি বোধ হইতে লাগিল যে, আর চলিতে পারিলেন না। সোপানাবলীর পার্শ্বভিত্তির গাত্রে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া দম রাখিবার জন্য অল্পক্ষণে যেন সেই ভিত্তিগাত্রে আশ্রয় লইলেন। আনোয়ার বখ্‌ত যদি প্রথমবারেই তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতেন, পারিব না বলিয়া যদি প্রথমেই অস্বীকার করিতেন, এই অপমান অপেক্ষা সে অস্বীকার তাহার হৃদয়ে ততদূর বাজিত না। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন, যখন পুনর্ব্বার নামিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, সেই সময় অকস্মাৎ নিম্নতল হইতে মানুষের বিদ্রুত পদধ্বনি শ্রবণে চমকিতা হইলেন। নীচে হইতে কে যেন শীঘ্র শীঘ্র উপরে উঠিয়া আসিতেছে। চমকিতা হইয়াও অপ্সরা কিছু তাড়াতাড়ি নামিতেছেন, কয়েকটা সোপান অতিক্রম করিতে না করিতেই স্বর্ণভূষণের সহিত মুখামুখী সাক্ষাৎ হইল। তখন স্বর্ণভূষণের সামরিক পরিচ্ছদ পরিধান। অপর্য্যাপ্ত সুরাপানে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ।

"হা প্রাণাধিকা অপ্সরা! তুমি? আমি বোধ করি,———" অর্দ্ধ আশ্চর্য্য, অর্দ্ধ ঘনিষ্ঠভাবে স্বর্ণভূষণ কহিলেন, "আমি বোধ করি, ভূপেশচন্দ্রের কথা বলিতে তুমি হাকিমের কাছে আসিয়াছিলে।"

"আমারে যাইতে দাও। কেন আর পথ আট্‌কাইয়া রাখিয়াছ? যাইতে দাও।"

"আমার একটা কথা শুনিয়া যাও।"

"না, আমি আর কাহারও কথা শুনিব না। পথ ছাড়িয়া দাও।"

স্বর্ণভূষণ উৎসাহিতভাবে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। তদপেক্ষা অধিক উৎসাহিত,—অধিক উত্তেজিত ভাবে অপ্সরাসুন্দরী সবলে সেই হস্ত আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

"অকারণে এত রাগ কেন সুন্দরী?"

"অকারণ সকারণ আমি বুঝি না। তুমি আমার পথ ছাড়িয়া দাও।"

সত্য সত্যই স্বর্ণভূষণ উভয় হস্ত বিস্তার করিয়া অপ্রশস্ত সোপানপথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অপ্সরা কোনক্রমেই নামিতে পারিতেছিলেন না। পথরোধকারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "আমি বেশ জানি, আনোয়ার বখ্‌ত তোমার কোন উপকার করিবেন না। তিনি স্বয়ংই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান কাঠিন্য। কিন্তু আমি যদি চেষ্টা করি, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইতে পার। তাঁহার কথা আর আমার কথা স্বতন্ত্র।"

"আমি আদেশ করিতেছি, তুমি আমার পথ ছাড়িয়া দাও।"

"কিঞ্চিৎ ওষ্ঠামৃত প্রদান না করিয়া কখনই যাইতে পারিবে না। তুমি যদি আমাদের শিবিরে আসিতে পার, তাহা হইলে,—"

"ওঃ! এখানে সম্ভ্রান্ত লোক থাকেন মনে করিয়াই আমি অবলা কুলকন্যা হইয়াও দুঃখের দায়ে,—বিপদের দায়ে এ পর্য্যন্ত আসিতে সাহস করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! দেখিলাম, এখানে কেবল পিশাচের নিবাস!"

স্বর্ণভূষণ পুনর্ব্বার প্রমত্তভাবে অপ্সরার হস্ত ধারণে সমুদ্যত হইতেছিলেন, ক্রোধে দলিত ভুজঙ্গিনীর স্বরূপ হইয়া অপ্সরাসুন্দরী সজোরে তাঁহাকে এক ধাক্কা মারিলেন, গড় গড় করিয়া স্বর্ণভূষণ যেন স্বর্গ হইতে পাতালে পড়িয়া গেলেন। আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও গর্জ্জনস্বরে কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্রের উপর আমার প্রতিহিংসা নিশ্চয়ই এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবে।"

অপ্সরাসুন্দরী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দ্রুতপদ-বিক্ষেপে অবরোহণ করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন।

জীবনে কখনও যেরূপ অপমান সহ্য করেন নাই, দুইজন পিশাচের হস্তে সেইরূপ অপমান সহ্য করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে অপ্সরাসুন্দরী আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। যেন স্বপ্ন হইতে সমুত্থিত হইয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে চিন্তাকুল মানসে জগৎচিন্তামণি অনন্তশক্তি অনন্তদেবের উপাসনায় বসিলেন। মুদ্রিত নয়নে ভক্তিভাবে যোড়করে কহিতে লাগিলেন, "পরমেশ্বর! ত্রিসংসারে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি সর্ব্বজীবকে মঙ্গল ছায়া বিতরণ কর। তুমি সর্ব্বজীবের জীবদাতা, সর্ব্বজীবের শিবদাতা, সর্ব্বজীবের আশ্রয় দাতা। হে করুণাময়! তোমার চক্ষু নাই, অথচ সমস্তই দর্শন কর। কর্ণ নাই, অথচ সমস্তই শ্রবণ কর। চরণ নাই, অথচ সর্ব্বত্রই বিচরণ কর। হস্ত নাই, অথচ সকলকেই অভয় দান কর। স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলে তোমার অগোচর কিছুই নাই। দয়াময়! তুমি আমার ভূপেন্দ্র-চন্দ্রের মঙ্গল বিধান কর। তুমি রক্ষা করিলে কাহার সাধ্য কে তাহার অমঙ্গল করিতে পারে। বিশ্ব-বিচারপতি! তোমার রাজ্যে সুবিচার হয়, ধর্ম্মরাজ! তোমার রাজ্যে ধর্ম্মের পূজা হয়, কিন্তু কৃপানিধান! আমি ক্ষুদ্র-প্রাণী অবলা। আমি তোমার মহিমা কি জানিব? সর্ব্বেশ্বর! আমি কেবল তোমাকে মানসপদ্মে আবাহন করিতে পারি। অনবরত অশ্রু-বর্ষণে সেই মানস-পদ্মকে অভিষেক করিয়া পবিত্র করিতে পারি। আর কিছুই পারি না। দীননাথ! দীনের প্রতি দয়া কর। দীনবন্ধু! তুমি ভিন্ন সংসারে আর আমাদের বন্ধু নাই। এ দেশে রাজা আছে, কিন্তু এ দেশের এই বিচার! এ দেশে মন্ত্রী আছে, তাহাদের এই মন্ত্রণা! এদেশে বিচারপতি আছে, কিন্তু তাহাদের এই বিচার। সর্ব্বময়! তুমি শক্তি-দাতা। তুমি ধর্ম্মরূপে ধার্ম্মিককে রক্ষা কর। দণ্ডধর! ভীমদণ্ডে তুমি অধার্ম্মিকের দণ্ডবিধান কর। কিন্তু এখন এই ধর্ম্মক্ষেত্রে এতদূর অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। জগদীশ! তোমার বজ্রেরা এখন কেন নিদ্রা যাইতেছে? তোমার চপলামালা কেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে না? তুমি যাহাকে সৃজন করিয়াছ, সেই সৃজিত মানব, তাহার স্বজাতিকে এইরূপ,—এইরূপ নিষ্ঠুর

আচরণে প্রপীড়িত করে। দয়াময়! আমি যখন বালিকা ছিলাম, তখন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি, আমাদের এই ভারতভূমি পুণ্যক্ষেত্র। মানবকুল দয়াধর্ম্মের আধার। ভারতের রাজাসন, সাক্ষাৎ ধর্ম্মাসন। দেবতারা নররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর রাজসিংহাসন পবিত্র করেন। বিচারালয়ে কাহারও প্রতি অবিচার হয় না। কিন্তু বিশ্বনাথ! সে সকল দিন কোথায় গেল? এখন কেন এ প্রকার দুর্দ্দশা? ওঃ! এখন যেন আমি বুঝিতেছি, ধর্ম্মশাস্ত্র সমস্তই মিথ্যা। ধর্ম্ম কেবল প্রতারণা মাত্র। মনুষ্যত্ব কেবল কথা মাত্র। সততা ও সভ্যতা শুধু নাম মাত্র সার। কিছুই কিছু নয়। করুণা-সিন্ধু! এখন বুঝিতেছি, সংসারে কেবল তুমিই মাত্র সার। তুমি আমার ভূপেশচন্দ্রের মঙ্গল কর।"

উপাসনা আর প্রার্থনার পর বিষাদিনীর হৃদয়ের বিষাদ-ভার যেন অনেক পরিমাণে লঘু হইল। বিশ্রামের নিমিত্ত শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না।

ঊনত্রিংশ প্রবাহ।

কারানিগ্রহ।—পিতৃসাক্ষাৎ।

"Pardon the liberty we have taken with your property, my-dear sir; but be assured, that you have acquired the eternal gratitude of * * * *. Adieu sir! * * *. One never looses anything by politeness."

Robert Macaire.

ভূপেশচন্দ্র নির্জ্জন কারাগৃহে বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। দিনান্তে একবার একখণ্ড দগ্ধ রুটি আর এক পাত্র জল তাঁহার পানাহারের নিমিত্ত যথারীতি নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত হয়। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন, অভাগা বন্দীর পক্ষে এটী কারাধ্যক্ষদের বিশেষ অনুগ্রহ!!! এই প্রকারে এক সপ্তাহ।—

সপ্তাহান্তে সেই নির্জ্জন কারা হইতে ভূপেশচন্দ্রের অন্য কারাগৃহে প্রবেশের আদেশ প্রচার। বিনা কালবিলম্বে সেই আদেশ প্রতিপালিত। নির্জ্জন কারালয়ে অবস্থানের সম্ভবাধিক কষ্ট, আহারাদির যারপর নাই কৃপণতা,—সরল কথায় নিষ্ঠুরতা,—অপর কারাগৃহে তত যন্ত্রণা—তত নিষ্ঠুরতা না থাকিতে পারে। এটী কারাপদ্ধতির উচ্চ প্রশংসা!—আর অধ্যক্ষদিগের দয়ার উজ্জ্বল পরিচয়!!!

অষ্টম দিবস সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পরিশ্রমের আজ্ঞাপালন। ভূপেশচন্দ্র সৈনিক পুরুষ, তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ, প্রাণও তেমনি কঠিন। তিনি কিরূপ কঠিন পরিশ্রম করিতে পারেন? অশ্বহস্তীর খাদ্য তৃণশাখা সংগ্রহ করিয়া মস্তকে বহন করা, প্রভাতে ও সায়াহ্নে অশ্বহস্তীর চরণ সেবা ও গাত্র সেবা করা, মূত্রপুরীষ পরিষ্কার করা, ক্ষুদ্র প্রকার কঠিন পরিশ্রম! ইরাবতী, শতদ্রু, বিতস্তা, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, এই পঞ্চ নদনদীর কূল হইতে অবিশ্রান্ত, অপর্য্যাপ্ত মৃত্তিকা বহন করিয়া আনা, ইহাও একপ্রকার ক্ষুদ্র কঠিন পরিশ্রম! ইহা অপেক্ষা বড় বড় কঠিন পরিশ্রম যাহা যাহা থাকিতে পারে, সৈনিক বন্দীকে তাহা হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত হয় না। দুই তিন দিবস ভূপেশচন্দ্র এই সকল লঘু গুরু পরিশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা দর্শন করিয়া কর্ত্তাপক্ষের মনস্তুষ্টি জন্মিল না। পাঠক মহাশয় হয় ত বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহাদের তুষ্টি উৎপাদনের ব্যাঘাত হইতেছে কিসে। দণ্ডাজ্ঞা অঙ্গহীন। প্রহার করিবার অবসর হইতেছে না। কি কৌশলে সেই অঙ্গহীনতার সামঞ্জস্য পরিপূরণ হয়, অনেকে অনেক প্রকার মন্ত্রণায় তাহার নূতন নূতন ফন্দি বাহির করিতেছেন। তাহাও সকলের মনঃপূত হইতেছে না। ভূপেশের চিরবৈরী,—জাতবৈরী—স্বর্ণভূষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধি ধরেন, তিনি পরামর্শ দিলেন, "যখন উঁহাকে শ্রমক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন যেন হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দেওয়া না হয়!"

"সাধু! সাধু!" বলিয়া সকলে সেই মন্ত্রণার প্রতিধ্বনি করিলেন, সর্ব্বসম্মতিতে তাহাই অঙ্গীকৃত হইল।

পর দিন প্রাতঃকালে সেই ব্যবস্থাই প্রতিপালিত হইল। তিন মণ পরিমিত একটী বোঝা কিম্বা মোট অর্দ্ধপথে ভূপেশের মস্তক হইতে শৈথিল্যে—অযত্নে ভূপতিত হইয়া গেল। হো হো শব্দে হাস্য করিয়া প্রহরীদল করতালি দিয়া উঠিল। এক জন সর্দার প্রহরী পূর্ব্বসঙ্কেত মত বংশীধ্বনি করিল। হাকিম আনোয়ার বখ্‌ত, সৈনিক স্বর্গভূষণ, নীচাশয় দুষ্টবুদ্ধি লিঙ্গেশ্বর, তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত অপরাপর পারিষদবর্গ সহাস্য-বদনে ঘটনাক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। দুই জন বাদ্যকর তাঁহাদের অনুগামী হইল। দুই জন কোড়াবরদার বালক সেই সঙ্গে সমানীত হইল।

যেমন কোন মহা মহোৎসবে দেব-দেবীর ভক্তবৃন্দ নানা বাদ্য বাজাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠিক সেইরূপে নিষ্ঠুরতাচালিত মহাপ্রমোদিত নিষ্ঠুর-দল একস্থলে একত্রীভূত।

হুকুম হইল শত বেত্রাঘাত।

কোড়াবরদারেরা একটু তফাতে দাড়াইয়া ছিল, তাহারা বালক, তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। চুপি চুপি পরস্পর বলাবলি করিল, "ইহারা করে কি? মানুষ না রাক্ষস?"

এক জন বলিল, "আমি ত ভাই এ কার্য্য কখনই করিতে পারিব না।"

আর একজন বলিল, "তুমি ত পারিবে না, কিন্তু হুকুম শুনিয়া আমার যেন মূর্চ্ছা আসিতেছে।"

এই অবসরে লিঙ্গেশ্বর অগ্রবর্ত্তী হইয়া এক জন বালককে কহিল, "অগ্রসর হও। বেত্র গ্রহণ কর। হুকুম অমান্য করিলে এই বন্দীর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।"

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে এক বালক বেত্র গ্রহণ করিল। বেত্রের মস্তকে নয়টী চর্ম্মরজ্জু। তাহা ঘন ঘন গ্রন্থিবদ্ধ। এক আঘাতে প্রহারিত ব্যক্তির গাত্রে নয়টা করিয়া দাগ পড়ে। নয় স্থান হইতে রক্তধারা বহির্গত হয়।

লিঙ্গেশ্বর আদেশ করিল, "প্রহার কর।" বাদ্যকরদিগকে আদেশ করিল, "আসামী যদি ক্রন্দন করে কি চীৎকার করে, জোরে রণবাদ্য বাজাইয়া দিও। দর্শকের কর্ণে যেন উহার কণ্ঠস্বর কি আর্ত্তস্বর প্রবেশ করিতে না পারে।"

বাদ্যকরেরা যন্ত্রবক্ষে প্রস্তুত হইয়া রহিল। বেত্রধারী বালক যথাশক্তি হস্ত উত্তোলন করিয়া বন্দীর বিবস্ত্র পৃষ্ঠদেশে এক বেত্রাঘাত করিল।

ভূপেশচন্দ্র রোদন করিলেন না, চীৎকার করিলেন না, যন্ত্রণা জানাইলেন না, সুস্থির ভাবে আঘাত সহ্য করিলেন। হত-গজ-বাদ্য-ধ্বনির প্রয়োজন হইল না।

লিঙ্গেশ্বরের হাতে একখানি খাতা ছিল, তিনি চীৎকারস্বরে সকলকে শুনাইয়া খাতায় লিখিলেন, "এক।"

এইরূপে ক্ষণ ক্ষণ বিরামে উপর্য্যুপরি পঞ্চবিংশতি আঘাত হইল; পঞ্চবিংশতিকে নবগুণ করিলে, যত অঙ্ক দাঁড়ায়, ভূপেশচন্দ্রের গাত্রে তত চিহ্ন পড়িল, কিন্তু দয়ামায়ার ত্যজপুত্র লিঙ্গেশ্বরের খাতায় অঙ্কপাত হইল পঞ্চবিংশতি!"

উৎসবে যেমন তামাসা দেখিবার লোক থাকে, বিপদেও তেমনি তামাসা দেখিবার লোকের অভাব থাকে না। কিন্তু দর্শক মাত্রেই যে সমান দয়াশূন্য নিষ্ঠুর, ইহা মনে করা বিষম ভ্রান্তি। মানব-হৃদয় দয়ামায়া উপকরণে গঠিত। নিষ্ঠুরতা কেবল অভ্যাস ও শিক্ষাসাপেক্ষ, উদাহরণসাপেক্ষ। নির্ঝর সদৃশ রক্তপাত দর্শনে চারি পাঁচ জন লোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সবলে কবধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লিঙ্গেশ্বর তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল, তোমরা যদি এইরূপে এত দয়া দেখাইতে চাও, তাহা হইলে এত শত বেত্রাঘাতের আসামী আঘাতভূমি হইতে অপনীত হইবামাত্র তোমাদিগকে ঐ ভাবে, ঐ স্থানে দাঁড়াইতে হইবে।

যাহারা মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, ভয়ে তাহাদের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া গেল। এমন চিত্তবৃত্তি অনেক আছে, ভয়ে তাহার বিলোপ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু মূর্চ্ছা নিজে কাহাকেও ভয় করে না। রাবণ যখন শ্রীরামের মায়ামুণ্ড ও মায়াধনু আনিয়া সীতাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন, সীতাদেবী রোদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন নাই। সত্য মিথ্যা যাহা কিছু জগতে আছে, স্বপ্নের মত মানব-হৃদয় তাহা ক্ষণে ক্ষণে মনে করে, ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যায়। মিথ্যা কুহকে মন অধিকক্ষণ অস্থির থাকে না। মিথ্যা ছলনায় সত্য হৃদয় অধিকক্ষণ বিভ্রান্ত থাকে না। হিতৈষিণী সরমার বাক্যে

জানকী যেমন প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আশা চপলার আশাবাক্যে সেই সকল দয়ার্দ্রচিত্ত লোক সেইরূপে প্রবোধ প্রাপ্ত হইল; বেত্র প্রহারে ভূপেশচন্দ্র মরিবেন না।

ক্রমে ক্রমে শত বেত্রাঘাত সমাপ্ত হইয়া গেল। লিঙ্গেশ্বরের খাতায় শতবার অঙ্কপাত হইল, কিন্তু ভূপেশচন্দ্র টলিলেন না। মন তাঁহার ঈশ্বরের দিকে, হৃদয় তাঁহার পবিত্র প্রণয়প্রার্থিনী অপ্সরার দিকে, দৈহিক যন্ত্রণাকে তিনি যন্ত্রণা বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। লোকে তাঁহাকে অবিচারে প্রহার করিতেছে, বৈরনির্যাতন সার্থক করিতেছে, মনে তাঁহার সে ধারণা ছিল। অটলভাবে দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। একটী বারও দর্শকের শ্রবণ-রোধক বাদ্যধ্বনির আবশ্যক হইল না। আমাদের হরিভক্ত প্রহ্লাদের সর্পবিষপান, সমুদ্র নিক্ষেপ; অগ্নিকুণ্ড প্রবেশ, গিরি হইতে অধঃপতন, হস্তীপদ-দলন, ইত্যাকার পিতৃপীড়নে এখনও যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই আধুনিক জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে দর্শন করুন, জগৎ পিতার জগৎ-তারণ চরণে যাহাদের মতি থাকে, মায়িক সংসারের কোন বাহ্য যন্ত্রণায় তাহারা অবসন্ন হয় না। হিন্দুমুসলমান পাঠক মহাশয়েরা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, য়ুদিয়ার যিশু খ্রীষ্ট তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এইরূপে একদিনের অভিনয়ের যবনিকাপতন হইল। দুই বৎসরের মধ্যে কতদিন যে সেইরূপ শোকাভিনয়ের যবনিকা পতিত হইয়াছিল, গণনা করিয়া ঠিক ঠিক আমরা তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। বহুদিন এক প্রকার দর্শন, এক প্রকার শ্রবণ, সকলের প্রীতিকর হয় না; পাঠকমহাশয় আসুন, অভাগিনী অপ্সরাসুন্দরী সেই দরিদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে একাকিনী কি করিতে-ছেন, একবার দেখিয়া আসি।

জগৎ পিতাকে স্মরণ করিয়া,--জগৎ পিতার অসীম করুণা ভিক্ষা করিয়া, ভিক্ষা না করিলেও তাঁহার করুণা কাহাকেও বঞ্চনা করে না। দয়াময়ের দয়া প্রার্থনা করিয়া প্রতিদিন প্রতিরাত্রে, অপ্সরাসুন্দরী ভবিষ্যৎ আশায় একটু একটু সুস্থ হন। আশা তাঁহারে অদৃশ্যভাবে চুপি চুপি বলিয়া যান, সংসারের সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নয়; তোমাদের বিচ্ছেদও চির-

স্থায়ী হইবে না। অপ্সরা তাঁহারে ধরিতে যান, ধরিতে পারেন না। স্বপ্ন যেন ছায়াবাজী। কে পরামর্শ দেন, কে সান্ত্বনা করেন, চক্ষু খুলিয়া দেখিতে যান, দেখিতে পান না। বুদ্ধিমতী মনে জানেন, আশা-চপলা। দুঃখের মুখে একটু একটু হাসি আসে।

একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি একাকিনী আপন আবাস কুটীরে উন্মনা হইয়া বসিয়া আছেন, সেই পূর্ব্ব পরিচিতা বীরবনিতা সহসা প্রবেশ করিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, "ভগিনি! এমন করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া কত কাল শরীর জীর্ণ করিবে? তোমার ভূপেশচন্দ্রের দণ্ডকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। একমাস কাল বিলম্ব। ধৈর্য্যধারণ কর। শীঘ্র মিলন হইবে। পরমেশ্বরপ্রসাদে একদিনের জন্যও তিনি মহাপীড়নে উৎপীড়িত হন নাই। ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য তাঁহারে একদিনের জন্যও পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। তুমি ধর্ম্মশীলা! ধর্ম্মের আদর ভাল জান। পক্ষিণী যেমন ছোট ছোট শাবকগুলিকে পক্ষাবরণে আবৃত করিয়া রাখে, মহামায়া সেইরূপ তোমার ধর্ম্মশীল প্রণয়পাত্রকে নিরাপদে রক্ষা করিবেন। বীরপত্নীকে নমস্কার করিয়া বীরপত্নী কহিলেন, "কল্যাণময় তোমার কল্যাণ করুন। আমি এখন একাকিনী থাকিতে ভালবাসি, আমারে নিশ্চিন্তে একাকিনী রাখিয়া আজ রাত্রের মত তুমি বিদায় হও।"

প্রতিনমস্কার করিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে বীরাঙ্গনা বিদায় হইলেন।

একদণ্ড অতিক্রান্ত হইয়াছে। রজনীদেবী কত দূরে আসিয়াছেন, আকাশের নক্ষত্রমালা কত দূর পথ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, অপ্সরা তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন না। অনেক দিন হইল, পিতাকে তিনি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, কত দিনের কথা, মনে পড়ে না। হঠাৎ কুটীরের দ্বারে ঘন ঘন আঘাত হইল। ব্যস্ত পদে, ব্যস্ত হস্তে অপ্সরাসুন্দরী দ্বার খুলিয়া দিলেন। গৃহমধ্যে এক পাণ্ডুমূর্ত্তির আবির্ভাব। অপ্সরাসুন্দরী দ্রুতপদে সমীপবর্ত্তিনী হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন, প্রতিকূল হস্ত সঞ্চালনে প্রবেশকারী নিবারণ করিলেন। বিজড়িত স্বরে,—বিজড়িত অথচ প্রশান্ত স্বরে সেই মূর্ত্তি কহিলেন, "থাক্ মা। আর আদরে প্রয়োজন নাই। আমি তোর অভাগা পিতা; অনেক দিনের পরে আমি তোরে দেখিতে পাইলাম।"

"পিতা! পিতা! কেন পিতা তোমার এমন দশা এখন?"

"তোমারি জন্য। কত দিন কত দেশ পর্য্যটন করিয়া তোমারে মা আজ আমি যে এখানে দর্শন করিতে পাইয়াছি, আমি জানি না, তাহা কেবল সেই অন্তর্যামীই জানেন।"

ভূজানু হইয়া সকরুণস্বরে, সজল নয়নে অপ্সরা কহিলেন, "চরণ-যুগলে প্রণাম করি, আমার ভূপেশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ কর, তাহা হইলেই আমি জগৎ সংসারে সুখী হইতে পারিব। ভাগ্যবলে এই অসময়ে আমি তোমার চরণ দর্শন পাইয়াছি, আশীর্ব্বাদ কর, ভূপেশচন্দ্র যেন সুখী হন।"

"ভূপেশচন্দ্র! সেই নরাধম বিশ্বাসঘাতক পামর! নিরন্ন, নীচাশয়, ভিক্ষুক! তাহার জন্য আজিও তুই মা——"

"পিতা! অপমানের কথা বলিও না। বিবাহ করি নাই, মনে মনে জীবন সমর্পণ করিয়াছি। তাহার যদি তুমি নিন্দা কর, তাহা হইলে——"

"নিন্দা! যাহার নিজের অন্ন হয় না, কারাগারে মহাক্লেশে যে ব্যক্তি, যে নরাধম অশেষ যন্ত্রণা——"

"ক্ষমা কর পিতা! ক্ষমা কর। তোমার মুখে ও কথা শুনিতে আমার বড় কষ্ট হয়। আমার দুই চক্ষে অগ্নি জ্বলিতেছে, আমার হৃদয়ে রক্ত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, মানস-কাননে অহরহ প্রবল দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, করপুটে বিনয় সহকারে মিনতি করি, আমারে ক্ষমা করিতে না পার, আমার অন্তঃকরণকে ক্ষমা কর। চরণ ধারণ করিয়া প্রার্থনা করি, যে বিষানলে আমার অন্তঃকরণ জ্বলিতেছে, তাহার অতিরিক্ত অনল জ্বালিয়া আর আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিও না। সে যন্ত্রণা আমি সহিতে পারিব না।"

"অপ্সরা! তুমি জান, কেন আমি তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছি? পাপাধম ভূপেশচন্দ্র ধরা পড়িয়াছে। যেমন হওয়া উচিত, তাহার প্রতি তেমনি কঠিন দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এখনও তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর। তাহার নাম উচ্চারণ করিতে আমার ঘৃণা হয়, তথাপি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত সেই ঘৃণিত কুকুরের নাম——"

"ক্ষমা কর পিতা! ক্ষমা কর।" কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ক্ষমা কর। আমার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে। তোমার একটী কথাও আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না।"

"তুই কি মা ঘরে ফিরে যাবি?"

"ঘর! পিতা! কোথায় আমার ঘর? যেখানে আমার ভূপেশচন্দ্র, বনে কি সাগরে কি রণভূমে জানি না, সেই স্থানকেই আমি ঘর মনে করি। তুমি আমারে ঘরে লইয়া যাইতে চাহিতেছ, পাদপদ্মে প্রণাম করি, সে ঘরে আর আমি যাইতে পারিব না।"

"তবে কি তুই মা তোর জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা ভূপেশচন্দ্রকে অধিক ভালবাসিস্?"

অপ্সরা উত্তর করিলেন না। আমি বোধ করি, এমন প্রশ্নে বোধ হয়, কেহই উত্তর করিতে পারে না।

"অপ্সরা! নিশ্চয়ই তোমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে। যদি তুমি এখনও সেই লোককে,—যে লোক তোমার গ্রাসাচ্ছাদান দিঁতে পারিবে না,—এখনও যদি তুমি সেই লোককে ভালবাসিতে চাও, তোমার দুঃখের শেষ থাকিবে না। জানি না, আমি বৃদ্ধ, দুঃখ অপেক্ষাও যদি আরও কিছু দুঃখ থাকে, তোমার কপালে তাহা ঘটিবে।"

"পিতা! তোমার মুখে ও কথা শুনিতে আমি ইচ্ছা করি না।" আকস্মিক ক্রোধে পিতৃভক্তি ভুলিয়া গিয়া,—একান্ত ভুল না হউক, পিতৃভক্তিতে শিথিলযত্ন হইয়া বিরহিণী অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "পিতা! তোমার প্রতি আমার যে ভক্তি আছে, নিষ্ঠুর বাক্যে সে ভক্তিকে তুমি স্থানভ্রষ্ট করিও না।"

"ভক্তি! তুই পাপীয়সি! তোর হৃদয়ে কি পিতৃভক্তি আছে? মনে করিস্ মা! মনে করিয়া দেখ্, যে দিন,—যে দিন হইতে তুই আমার বাক্যের অবাধ্য হইয়াছিস্, সেই দিন হইতে সেই ভক্তি উড়িয়া গিয়াছে। যদি পিতৃভক্তি থাকিত, এত দিনে তুই রাজরাণী হইতে পারিতিস্। এখনও পারিস্।"

"পারি পিতা! কিন্তু তাহাতে আমি সুখী হইতে পারিব না। সে

মিলনে আমার সুখ নাই। যেখানে আমার সুখ অবস্থান করে, সে একটী নির্জ্জন স্থান। তুমি তাহা জান না। কিন্তু সেই সুখ ভিন্ন, সেই স্থান ভিন্ন তোমার অভাগিনী দুহিতার শান্তি আর কোথাও নাই। কিছু-তেই নাই। যাহাকে আমি ভালবাসি, চক্ষে দেখিতে না পাইলেও তাহার ধ্যানে আমি সুখী। দরিদ্র পর্ণকুটীরে যদি বাস করিতে হয়, অনাহারে যদি দিন যায়, তাহাতেও ক্লেশ বোধ করি না। কিন্তু যাহাকে ভালবাসি না, রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া, রাজভোগ উপভোগ করিয়াও আমি সুখী হইতে পারিব না। সুখ কাহাকে বলে, তাহা কি তুমি জান রাজা?"

"আমি রাজা, এখনও কি তা তোর মা মনে আছে? রাজকন্যা হইয়া ভিখারিণী হবি? ভিখারীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া কুল সম্ভ্রমে,—কুল লজ্জায় কি জলাঞ্জলি দিলি?"

"দিই নাই। যখন জানিবে, তখন বুঝিবে, আমি তোমার কুল উজ্জ্বল করিয়াছি।"

"দুষ্ট মেয়ে।"

অপ্সরা সুন্দরী প্রতিধ্বনি করিলেন, "দুষ্ট মেয়ে!"

বিদ্রূপ ভঙ্গীতে বিরাটকেতু কহিলেন, "তোর কথা মা নবন্যাসের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বেশ মানায়। সত্য মানব-জীবনে শোভা পায় না। তোরে ত মা কখনও আমি বিষাদিনী দেখি নাই। মাতৃহারা বালিকা বুকে করিয়া পালন করিয়াছি, এখন আমার সেই বুকে বিষ ঢালিয়া দিস্ কেন? ঘরে চল্। সর্ব্বস্বই তোর আছে। আমার আর কেহ নাই। মনের দুঃখে আমি উইল করিয়াছি। যদি এম্‌নি—এম্‌নি—এম্‌নি করিয়া অবাধ্য হইয়া থাকিস্, আমার চিরজীবনের সঞ্চিত সর্ব্বধন অপরের হস্তে যাইবে। মা! এখনও যদি তুই ঘরে যাস্, চৌকাট পার হইবামাত্র সেই ইচ্ছাপত্র (উইল) আমি জ্বলন্ত অনলে জ্বালাইয়া দিব। তোর চক্ষের সম্মুখে ভস্ম করিয়া ফেলিব।"

"যা ইচ্ছা তাই কর পিতা, ভূপেশচন্দ্রের সঙ্গে যদি আমার বিবাহ না হয়, সংসারের কোন সুখে আমি সুখী হইতে পারিব না।"

"ক্ষমা কর পিতা! ক্ষমা কর।" কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ক্ষমা কর। আমার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে। তোমার একটী কথাও আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না।"

"তুই কি মা ঘরে ফিরে যাবি?"

"ঘর! পিতা! কোথায় আমার ঘর? যেখানে আমার ভূপেশচন্দ্র, বনে কি সাগরে কি রণভূমে জানি না, সেই স্থানকেই আমি ঘর মনে করি। তুমি আমারে ঘরে লইয়া যাইতে চাহিতেছ, পাদপদ্মে প্রণাম করি, সে ঘরে আর আমি যাইতে পারিব না।"

"তবে কি তুই মা তোর জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা ভূপেশচন্দ্রকে অধিক ভালবাসিস্?"

অপ্সরা উত্তর করিলেন না। আমি বোধ করি, এমন প্রশ্নে বোধ হয়, কেহই উত্তর করিতে পারে না।

"অপ্সরা! নিশ্চয়ই তোমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে। যদি তুমি এখনও সেই লোককে,—যে লোক তোমার গ্রাসাচ্ছাদান দিতে পারিবে না,—এখনও যদি তুমি সেই লোককে ভালবাসিতে চাও, তোমার দুঃখের শেষ থাকিবে না। জানি না, আমি বৃদ্ধ, দুঃখ অপেক্ষাও যদি আরও কিছু দুঃখ থাকে, তোমার কপালে তাহা ঘটিবে।"

"পিতা! তোমার মুখে ও কথা শুনিতে আমি ইচ্ছা করি না।" আকস্মিক ক্রোধে পিতৃভক্তি ভুলিয়া গিয়া,—একান্ত ভুল না হউক, পিতৃ-ভক্তিতে শিথিলযত্ন হইয়া বিরহিণী অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "পিতা! তোমার প্রতি আমার যে ভক্তি আছে, নিষ্ঠুর বাক্যে সে ভক্তিকে তুমি স্থানভ্রষ্ট করিও না।"

"ভক্তি! তুই পাপীয়সি! তোর হৃদয়ে কি পিতৃভক্তি আছে? মনে করিস্ মা! মনে করিয়া দেখ্, যে দিন,—যে দিন হইতে তুই আমার বাক্যের অবাধ্য হইয়াছিস্, সেই দিন হইতে সেই ভক্তি উড়িয়া গিয়াছে। যদি পিতৃভক্তি থাকিত, এত দিনে তুই রাজরাণী হইতে পারিতিস্। এখনও পারিস্।"

"পারি পিতা! কিন্তু তাহাতে আমি সুখী হইতে পারিব না। সে

মিলনে আমার সুখ নাই। যেখানে আমার সুখ অবস্থান করে, সে একটী নির্জ্জন স্থান। তুমি তাহা জান না। কিন্তু সেই সুখ ভিন্ন, সেই স্থান ভিন্ন তোমার অভাগিনী দুহিতার শান্তি আর কোথাও নাই। কিছুতেই নাই। যাহাকে আমি ভালবাসি, চক্ষে দেখিতে না পাইলেও তাহার ধ্যানে আমি সুখী। দরিদ্র পর্ণকুটীরে যদি বাস করিতে হয়, অনাহারে যদি দিন যায়, তাহাতেও ক্লেশ বোধ করি না। কিন্তু যাহাকে ভালবাসি না, রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া, রাজভোগ উপভোগ করিয়াও আমি সুখী হইতে পারিব না। সুখ কাহাকে বলে, তাহা কি তুমি জান রাজা?"

"আমি রাজা, এখনও কি তা তোর মা মনে আছে? রাজকন্যা হইয়া ভিখারিণী হবি? ভিখারীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া কুল সম্ভ্রমে,—কুল লজ্জায় কি জলাঞ্জলি দিলি?"

"দিই নাই। যখন জানিবে, তখন বুঝিবে, আমি তোমার কুল উজ্জ্বল করিয়াছি।"

"দুষ্ট মেয়ে।"

অপ্সরা সুন্দরী প্রতিধ্বনি করিলেন, "দুষ্ট মেয়ে!"

বিদ্রূপ ভঙ্গীতে বিরাটকেতু কহিলেন, "তোর কথা মা নবন্যাসের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বেশ মানায়। সত্য মানব-জীবনে শোভা পায় না। তোরে ত মা কখনও আমি বিষাদিনী দেখি নাই। মাতৃহারা বালিকা বুকে করিয়া পালন করিয়াছি, এখন আমার সেই বুকে বিষ ঢালিয়া দিস্ কেন? ঘরে চল্। সর্ব্বস্বই তোর আছে। আমার আর কেহ নাই। মনের দুঃখে আমি উইল করিয়াছি। যদি এম্‌নি—এম্‌নি—এম্‌নি করিয়া অবাধ্য হইয়া থাকিস্, আমার চিরজীবনের সঞ্চিত সর্ব্বধন অপরের হস্তে যাইবে। মা! এখনও যদি তুই ঘরে যাস্, চৌকাট পার হইবামাত্র সেই ইচ্ছাপত্র (উইল) আমি জ্বলন্ত অনলে জ্বালাইয়া দিব। তোর চক্ষের সম্মুখে ভস্ম করিয়া ফেলিব।"

"যা ইচ্ছা তাই কর পিতা, ভূপেশচন্দ্রের সঙ্গে যদি আমার বিবাহ না হয়, সংসারের কোন সুখে আমি সুখী হইতে পারিব না।"

"তুই মা পাগলিনী! যাহার জন্য পাগলিনী, সে যে কারাগারে কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে——"

"ঐ কথা বলিবার জন্যই বুঝি তুমি আসিয়াছ? এইরূপে আমারে দগ্ধ করিবার জন্যই বুঝি তুমি আসিয়াছ? আমি সব জানি। যে আগুনে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, তাহাব উপর আর আহুতি দিও না।"

"না,—আমি সে কথা বলিতে আসি নাই। বলিতে আসিয়াছি ঘরে চল। একদিন সময় লও। বিবেচনা করিয়া ঘরে চল।"

"ঘর! আবার বলিতেছ, ঘর? ঘর আমাব কোথায়? যেথানে আমার ভূপেশচন্দ্র, সেই খানেই আমার ঘব। এক দিন সময় দিতে চাও? এক মুহূর্ত্তও আমি সময় চাই না। ভূপেশচন্দ্রকে ছাড়িয়া——"

কথা কহিতে কহিতে বাষ্পবেগে যেন অপ্সরাসুন্দরীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। নিমেষশূন্য সজল নয়নে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পিতাকে কহিলেন, "পিতা! আমি অবলা। অবলাহৃদয় দৃঢ়সঙ্কল্প। যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব আধিপত্য লাভ হয়, তথাপি আমি ভূপেশচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। দিন দিন যদি উপবাস করিয়া থাকিতে হয়, তথাপি আমি ভূপেশচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে পারিব না। পতি বলিয়া বরণ করি নাই, কিন্তু পিতা! সেই ভূপেশচন্দ্র আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। তোমার কি মনে পড়ে, যে দিন তুমি স্বর্গভূষণের হস্তে আমারে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলে, তোমার অবাধ্য হইয়া সেদিন আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। রাত্রিকালে অনাথিনী অসহায়িনী বনবাসিনী। তুমি হয় ত অন্বেষণ করিয়াছিলে, সন্ধান পাও নাই। আকাশের নক্ষত্রেরা হয় ত সন্ধান করিয়াছিল, অন্বেষণ পায় নাই, যাহার সঙ্গে চন্দ্রকুমুদিনী সম্বন্ধ, আমার সেই ভূপেশচন্দ্র সেই রাত্রে আমার সন্ধান পাইয়াছিলেন। দেখ দেখি পিতা! ভাব দেখি পিতা! সে অসময়ের সখা হৃদয়নিধিকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কি আর কাহাকেও বরণ করিতে পারি?"

"মৌন হইয়া তোর অনেক কথা আমি শুনিলাম। কিন্তু মা অপ্সরা! ভূপেশ-তোরে কতদিন প্রতিপালন করিতে পারিবে?"

"প্রতিপালন আমি চাই না। বিশ্বকর্ত্তা আমাকে হাত পা দিয়াছেন, আমি পরিশ্রম করিতে পারি। সংসার পালনে আমি অসমর্থ হইব না।"

"সে লোক জুয়াচোর!" বিরাট স্বরে বিরাটকেতু কহিলেন, "সে লোক জুয়াচোর।"

"কি? আমার ভূপেশচন্দ্র জুয়াচোর?"

"প্রমাণ পাইয়াছি।"

"সে প্রমাণ আমাকে দেখাইও না। পিতা! আমি যেন বাচিয়া থাকিয়া জ্বলন্ত চিতানলে দগ্ধ হইতেছি। প্রণাম করি, যদি আর কোথাও যাইবার আবশ্যক থাকে,———" বলিতে বলিতে অভাগিনী সতীলক্ষ্মী,—(এ সংসারে সতীলক্ষ্মীরাই সত্য অভাগিনী হয়) বলিতে বলিতে অভাগিনী সতীলক্ষ্মী অজ্ঞান হইয়া ভূমে ঢলিয়া পড়িলেন। অলক্ষিতে মূর্চ্ছা আসিয়া কোলে করিয়া বসিল। মূর্চ্ছা একটী দেবী। সে দেবী বিপদের সহচরী। আর এক সময়ে মূর্চ্ছাকে হয় ত আমরা তিরস্কার করিতে পারি, কিন্তু এমন সময় ভক্তিচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া আদরে আদরে তাঁহারে অর্চ্চনা করিতে হয়।

অপ্সরাসুন্দরী মূর্চ্ছাগতা।

রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "আমি কি ইহাই দেখিতে আসিয়াছিলাম? মরিব ভয় দেখাইয়া গুলিশূন্য পিস্তল যাহার সম্মুখে আমি বার বার ধরিয়াছিলাম, সেই প্রাণাধিকা কুমারী অপ্সরা আমার মরিয়া গেল?"

কে জানে? কে মরিল, কে বাচিল। সংসারে কেহই বাঁচিতে আসে নাই, কিন্তু বিরাটকেতু ভাবিতেছেন, তিনি চিরদিন বাঁচিবেন। তাঁহার কন্যা মরিয়া গেল। মরিলে কি জ্ঞান থাকে? মরিলে কি হয়, মরা জীব কোথায় যায়, আবার তাহারা ফিরিয়া আসে কি না, আমরা তাহার কিছুই জানি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বাঙ্গালী কবি বলিয়াছিলেন ঃ—

"ম'রে যদি ফিরে আসি, মনে যদি রয়,
তবে ত বলিতে পারি মরিলে কি হয়।"

কেহই জানে না। মরিলে জীব কোথায় যায়, কেহই জানে না। কিন্তু মূর্চ্ছাকে যদিও আমরা ক্ষণিক মৃত্যু বলি, কিন্তু সে মৃত্যু দয়া করিয়া

আবার জীবন দান করে। মৃত্যু বড় ভয়ানক। লোকে মৃত্যুকে ভুল্ব করে। লোকেরা পাগল। মৃত্যুর তুল্য বন্ধু সংসারে আর কেহ নাই। পাপ, তাপ, সন্তাপ, যাহা কিছু থাকে, আধি ব্যাধি যন্ত্রণা, সংসারে যাহা কিছু থাকে, মৃত্যু তাহা হরণ করে। সংসারের শান্তিনিকেতন শ্মশান। সেই শ্মশানে আমরা ইহ জন্মের মত শান্তির ক্রোড়ে জুড়াইতে পারি।

কিন্তু মূর্চ্ছা ত সেখানে লইয়া যাইতে পারে না। অপ্সরাসুন্দরীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "প্রাণাধিকে! প্রাণ অপেক্ষা আমি তোমারে অধিক ভালবাসি। কিন্তু এখন আমি তোরে অভিসম্পাত করি———"

"হা পরমেশ্বর! পিতার অভিসম্পাত! যিনি জন্মদাতা পিতা, তাঁহার অভিসম্পাত! এ অভিসম্পাতানল মর্ম্মে মর্ম্মে, অস্থিতে অস্থিতে আমারে দগ্ধ করিবে।" আবার মূর্চ্ছা আসিয়া অপ্সরারে অজ্ঞান করিল।—চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া অপ্সরা দেখিলেন, পিতা নাই। কর্ণে যেন একটী বাক্যের প্রতিধ্বনি হইল,—"জন্মের মত আমি তোরে পরিত্যাগ করিলাম।"

অপ্সরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে যেন ক্ষণকাল ক্ষণপ্রভা ক্রীড়া করিল। অভাগিনী কহিলেন, "জগতের জন্মদাতা পিতা! আমার প্রতি,—এই অভাগিনীর প্রতি সদয় হও। আমার জন্মদাতা আমারে অভিসম্পাত করিয়া গেলেন, আমি জানি, মাতাপিতার অভিসম্পাত, তনয়-তনয়ার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। জগৎপিতা! তোমার কাছে আমি অভিসম্পাত চাই না। কেবল কৃপা প্রার্থনা।—যে কৃপা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতির নিদান, এই অভাগিনী কেবল সেই কৃপা প্রার্থনা করে;—সেই কৃপাই আমার আশীর্ব্বাদ; সেই কৃপাই আমার প্রার্থনা।"

রাজা কখন চলিয়া গিয়াছেন, জানিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার অভিসম্পাত শ্রবণযুগলে যেন ঘণ্টাধ্বনি করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "পতি গেল, পিতা গেল। তবে আর এ শূন্য জীবনে কি ফল?" কথা বলিতে বলিতে বিমনস্ক হইয়া,—অনেক দিনের পর্ যেন কি স্মরণ হইল মনে করিয়া, শীঘ্র পদে, একটী তাকের নিকটে গিয়া আমাদের দুঃখিনী নায়িকা

অন্যমনস্কে দাঁড়াইলেন। দেয়ালের গায়ে বহুবিধ দ্রব্য সঞ্চিত বাক্সকৌটা-ধারী বহুদিনের বিশ্বাসী তাক্। তাকের নিকটে গিয়া অপ্সরাসুন্দরী একটী কেশরজ্জু বাহির করিলেন। ঘন ঘন গ্রন্থি। তাহার সঙ্গে একখানি পত্র।—তাহাতে কি লেখা? যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই জানেন। অপ্সরাসুন্দরী গণনা করিয়া দেখিলেন, দুই বৎসর পূর্ণ হইবার একদিন মাত্র বিলম্ব। আশা আসিয়া বুক উঁচু করিয়া নিরাশা-সাগরে সুন্দর সুন্দর ঢেউ দিয়া দিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া গেল।

"ওঃ! দ্বিতীয় রজনী প্রভাতে তবে আমি ভূপেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইব।"

আশা আসিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, চপলা আসিয়া খেলা করিয়া বলিয়া গেল,—দেখা হইবে।

সময় যাইতেছে। তুমি ছোট করিয়া ভাব, তুমি বড় করিয়া জান, তথাপি সময় যাইতেছে। মানুষে বলে, সুখের সময় শীঘ্র যায়, দুঃখের সময় বিলম্বে যায়; সে কেবল কথার কথা। দুঃখীর পক্ষে, সুখীর পক্ষে ছোট বড় জ্ঞান হইতে পারে; শরৎকাল, শীতকাল, গ্রীষ্মকাল, সুখী দুঃখীর পক্ষে সদয় নির্দ্দয় হয় না। সময় যাহা, তাহা সময়ই আছে। তুমি মনে কর বড়, আমি মনে করি ছোট। কিন্তু চন্দ্রসূর্য্য কেবল হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যান। শীতকালে রাত্রি বড় হয়, গ্রীষ্মকালে রাত্রি ছোট হয়। দেখিয়া দেখিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার একজন প্রধান কবি আমাদের সংসারকে শুনাইয়া গিয়াছেন,——

হিম-শিশির-বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎসু

* * * *

দিবস-কমল-লজ্জা, শর্ব্বরী-রেণু-পঙ্কা।"

যখন তখন কালিদাসের এই কথাটী আমাদের মনে পড়ে। হিমকালে দিন ছোট হয়। শিশির কালে কমল জলে ডুবিয়া থাকে। বসন্তে নর-নারীর লজ্জা দূরে যায়। গ্রীষ্মকালে শর্ব্বরীর ভোগ কমে। বর্ষাকালে পৃথিবীতে কাদা হয়। শরতে সেই কাদা শুকাইয়া যায়। দেখ

দেখি, মনে কর দেখি, ছয় ঋতুর কেমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। পাঠক মহাশয়! কালিদাসের ঋতুসংহার পাঠ করিয়াছেন; এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমি তাহার সকল কথা উদ্ধার করিতে পারিলাম না। কিন্তু "হিম-শিশির-বসন্ত" এই যে একটী ছোট কথা, ইহার শেষ চরণে ব্রহ্মাণ্ড আছে।

দুই বৎসর অতীত।—শেষের রজনী প্রভাতে অপ্‌সরাসুন্দরী একটী প্রতিবাসিনী ছাত্রীর গৃহে গমন করিয়াছিলেন। এ কথা পাঠক মহাশয় হয় ত নূতন শুনিলেন। অপ্‌সরাসুন্দরীর ছাত্রী আছে, এই আখ্যায়িকার কোন স্থলে সে কথা উক্ত হয় নাই। পূর্ব্বেও ছাত্রী ছিল, সে কথা অপ্রকাশ। কিন্তু পঞ্জাবে আসিয়া; দুর্ভাগ্যক্রমে বৈরি দলের কুচক্রে ভূপেশ-চন্দ্র কারাবাসী হইলে জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত অপ্‌সরাসুন্দরী সেই আবাসপল্লীমধ্যে পাঁচ সাতটী ছাত্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সকালে বিকালে তাহাদিগকে শিল্পকর্ম্ম শিখাইতেন। যে প্রভাতের কথা আমরা বলিতেছি, সেই প্রভাতে একটী ছাত্রীর আবাস হইতে তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন, পথে এক জীবন্ত মূর্ত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কে সে ব্যক্তি, কাহার সে মূর্ত্তি, একটু পরিষ্কার করিয়া পরিচয় না দিলে পাঠক মহাশয় তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। ভূমিকায় কালহরণ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। যে লোক ঈর্য্যাবশে জাতবৈরী,—যে লোক অপ্‌সরা-সুন্দরীর পিতৃনির্ব্বাচিত বর, অনাহূত, অপ্রত্যাশিত রাজপথের এই মূর্ত্তি সেই স্বর্গভূষণের।

যুগল বাহু বিস্তার করিয়া স্বর্গভূষণ প্রমত্তভাবে হাস্য করিতে করিতে অপ্‌সরাসুন্দরীর গমনপথ রোধ করিলেন। হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "অপ্‌সরা! প্রিয়তমে! তুমি স্বর্গের অপ্‌সরা।"

"হ্যাঁ, আমি স্বর্গের অপ্‌সরা, কিন্তু তুমি স্বর্গভূষণ নও, তুমি নরকের ভূষণ। পথ ছাড়িয়া দাও। আমি কুটীরবাসিনী কাঙ্গালিনী, কুটীরে প্রবেশ করি।"

ভয়চকিত বন্য পশুর মত পুনঃপুন ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া স্বর্গ-ভূষণ দেখিলেন, রাস্তায় লোক নাই। নির্জ্জন পন্থা। কুৎসিত প্রেমোৎসাহের সহিত দুঃসাহসকে হৃদয়ে আহ্বান করিয়া, যুগল হস্তে পবিত্র কুমারীর

যুগল হস্ত ধারণ করিলেন। মুখের নিকটে মুখ লইয়া গিয়া, চক্ষুকে নাচাইয়া নাচাইয়া হাসাইয়া কৃত্রিম প্রেমভাবে,—কে জানে কৃত্রিম কি অকৃত্রিম,—তথাপি আমরা কহিতেছি, কৃত্রিম প্রেমভাবে সুরসিক প্রেমিক সুরসিক হাসি হাসিয়া অপ্সরাকে কহিলেন, "প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে! বহুদিনের পর দেখা। আহা! তুমি কত বড় সুন্দরী হইয়াছ! ছিলে তুমি সুন্দরী সত্য, আছ তুমি সুন্দরী সত্য, স্বর্গের অপ্সরা সত্য সত্য তোমার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু তথাপি—তথাপি, তথাপি—তোমার সৌন্দর্য্য যেন অনেক বাড়িয়াছে। আজ আমি তোমারে যত সুন্দরী দেখিতেছি, আর কখনও এমন সুন্দরী দেখি নাই,—জন্মেও না।"

সাগরে যাহার তরণী মগ্ন হয়, সে যদি সাঁতার না জানে, তথাপি বাঁচিবার জন্য আঁকু পাঁকু করে। শিরা-ধমনী সঞ্চালিত হয়, হস্তপদ সঞ্চালিত হয়, বাঁচিবার আশা থাকে, কিন্তু জীবন সেই জলধি-জীবনে রক্ষা হইবে কি না, তাহা জানিতে পারে না। অপ্সরাসুন্দরী অবলা হইয়াও প্রাণপণ আকর্ষণে স্বর্ণভূষণের হস্তবন্ধন ছাড়াইয়া দশ হস্ত দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। আরক্ত নয়নে সেই বৈরী নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া কুমারী-প্রতাপে সপ্রতাপ স্বরে কহিলেন, "কুক্কুর! দূর হইয়া যা!" কুক্কুর আরও যেন সাহস পাইল। মনে করিল, স্ত্রীজাতি প্রথমে কটু-ভাষ ভাষে, শেষকালে জল হইয়া যায়। সেই সাহসে, সেই আশ্বাসে স্বর্ণভূষণ পুনরায় কহিলেন, "প্রাণাধিকা অপ্সরা! সেই পলাতক আসামীকে পরিত্যাগ কর। নারীজাতি কখনও নিরাশ্রয় থাকে না। আমি তোমার আশ্রয় হইব, আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাকে রাজরাণী করিব।"

"রাজরাণীর মাথায় আমি পদার্পণ করি। আর তোমার মত ঘৃণিত কাপুরুষের মাথাতেও আমি পদার্পণ করি। পথ ছাড়, কুটীরবাসিনী কুটীরে প্রবেশ করুক্।"

"না, পরমেশ্বর সাক্ষী, আমাদের উভয়ে আর বিচ্ছেদ হইবে না। জান তুমি, কতদিন হইতে কতদূর তোমারে আমি ভালবাসি! এখন আর কিছু চাহি না, অবশ্য অবশ্য অবশ্য। তোমার সঙ্গে কেবল দুটী কথা কহিব।"

অপ্সরাসুন্দরী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। রসনা শুষ্ক হইয়াছিল,—নিশ্বাসে নিশ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছিল, কিন্তু নেত্রপুট নির্জ্জল! সতীত্বের বল, ধর্ম্মের বল, সংসারের সমস্ত বল অপেক্ষা প্রবল। অবরোধকারীর এক হস্ত এক হস্তে সরাইয়া দিয়া, অপর হস্তে তাহারে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমাদের কুটীরবাসিনী অভাগিনী নায়িকা কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে কুটীরশান্তি কুটীর; সে কুটীর আমাদের অপ্সরারে তখন শান্তিদান করিতে পারিল না। দ্বারে আঘাত হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। পুনঃপুন দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল। কিন্তু এত মৃদু আঘাত যে, কোন বাহিরের লোক আসিয়াছে, তাহা তিনি মনে করিলেন না। অবস্থা যেরূপ, তাহাতে দাসী চাকর নাই। তবে কে আসিবে? কে ডাকিবে? বোধ হয়, গৃহস্বামিনী। এই মনে করিয়া, অপ্সরাসুন্দরী অস্থির চিত্তকে কিঞ্চিৎ স্থির করিয়া দ্বাব খুলিয়া দিলেন। সেই লোক প্রবেশ করিল! মানুষের শরীরে বিদ্যুৎ প্রবেশ করিলে চঞ্চলা চপলার নাম যেমন সার্থক হয়, দুষ্ট লোকের অনধিকাব প্রবেশে অপ্সরার স্বর্গীয় হৃদয় সেইরূপ চপলা সঞ্চালনে সঞ্চালিত হইল।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনধিকারপ্রবেশক স্বর্গভূষণ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "প্রাণেশ্বরি! প্রার্থনা করি, রাগ করিও না। যিনি জগতের সাক্ষী, তিনি জানেন, আমি তোমার কল্যাণকামনা করি। আর সেই কল্যাণকামনা জানাইবার জন্যই আজ আমি এখানে আসিয়াছি।"

"আমারে কি তুমি চিনিতে পার?"

উত্তর কিম্বা প্রশ্ন, পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিবেন। বুঝাইয়া দিবার সময় নাই। আকস্মিক ক্রোধে অপ্সরাসুন্দরীব বদন লোহিতবর্ণ। একটু অগ্রে যে গণ্ডদেশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, সেই গণ্ডদেশে কোথা হইতে রক্ত‥ দেখা দিল, প্রকৃতি তাহা জানেন, তুমি আমি জানি না। বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হস্তপদ কিছু মাত্র কাঁপিল না। পাষাণের পর্ব্বত যেমন স্থির, তেমনি স্থির মূর্ত্তি! চক্ষে অগ্নি জ্বলিতেছে; অগ্নিকে নমস্কার

করিয়া অপ্‌সরাসুন্দরী কহিলেন, "অনাহূত হইয়া যে কোন ব্যক্তি কু অভি-প্রায়ে কাঙ্গালিনীর গৃহে প্রবেশ করে, আমার হৃদয়ের বহ্নি, নয়নের বহ্নি তাহাকে দগ্ধ করিবেই করিবে। অবশ্য!—অবশ্য!—অবশ্য!! তুমি দূর হও। আমার দড়ি আছে, সেই দড়িতে আমি প্রতিদিন গ্রন্থি দিয়া রাখি, মনে মনে প্রাণে প্রাণে প্রতিদিন আমি গণনা করি, উপবাসে কতদিন গিয়াছে, অনিদ্রায় কত রজনী অতিবাহিত হইয়াছে,—অনিদ্রায় স্বপ্ন আমারে কতদূর প্রতারণা করিয়া গিয়াছে,—কিন্তু এক দিনও গ্রন্থি আমি ভুলি নাই; আজ সেই দুই বৎসর পরিপূর্ণ। যে প্রিয় মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে আঁকা,—প্রাণ যদি এক না হইয়া বহু হইত,—মালা করিয়া যে প্রাণকে আমি কণ্ঠে ধারণ করিতে পারিতাম, সেই প্রাণের প্রাণ জীবনসর্ব্বস্ব আজ ঘরে ফিরিয়া আসিবেন, তুমি দূর হও!"

"হৃদয়েশ্বরি! অমন কথা বলিতে নাই। যে লোক নিরন্ন, যে আপ-নাকে আপনি পোষণ করিতে পারে না, যে লোক ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী, তাহাকে কি তুমি বিশ্বাস করিতে পার?"

"আমি পারি কি না পারি, জিজ্ঞাসা করিও না। আমার হৃদয়,—আমার প্রাণ, তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছে, চিরদিন বিশ্বাস করিবে। কে তুই নরপিশাচ! সম্মুখ হইতে দূর হ! তুই কি হিন্দু? দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া সতীদেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন;—যদিও বিবাহ হয় নাই, তথাপি সেই ভূপেশচন্দ্র আমার পতি। তাঁহার ত নিন্দা নাই, তথাপি,—তথাপি,—তথাপি তাঁহার কোন নিন্দা আমার কর্ণে প্রবেশ করিবে না।" কথা বলিয়া আবার বসিলেন।

"অপ্‌সরা! সত্যই তুমি আমারে অপমান করিলে! হাস্য—"

"তুমি দূর হও! পুনঃ পুন বলিতেছি, দূর হও। এখনি আমি প্রতি-বাসী লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিব।"

"না অপ্‌সরা! তাহা করিও না। পাগলিনী হইও না, আমারে পাগল করিও না। চিনেছি তোমারে। তুমি বীরাঙ্গনা, বীরপত্নী। কিন্তু রাজকন্যা হইয়া এ দরিদ্র কুটীরে বাস করা তোমারে কি শোভা পায়?"

"পায় কি না পায়, সে কথা তোমারে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না।

অন্তর আমার অন্তরানলে দগ্ধ হইতেছে। তুমি বিদায় হও। যাতনার উপর আর যাতনা দিও না।”

“অপ্সরাসুন্দরি! তুমি জান না, প্রাণে প্রাণে আমি তোমারে কতদূর ভালবাসি।”

“পামর! ঐ কথা! এতক্ষণ কি তোর ঐ কথা মনে মনে চাপা ছিল? আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারি, অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ভূপেশচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।”

“পারিস্ না! দেখ্ দেখি রাক্ষসি! তাহারে পরিত্যাগ করাইয়া আমি তোরে রাজরাণী করিতে পারি কি না, দেখ্ দেখি রাক্ষসি!”

কথা কহিতে কহিতে দুরন্ত লম্পট অপ্সরাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইতেছিল, তীব্রবেগে লম্ফপ্রদান করিয়া, আসন হইতে উত্থিত হইয়া, অপ্সরাসুন্দরী দ্বারের নিকটে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

দ্বারের দ্বার হইয়া, সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, “অপ্সরা! আজ তুমি আমার চক্ষে সত্যই পরমসুন্দরী দেখাইতেছ!” শেষ কথার স্বর সমাপ্ত হইবার অগ্রে স্বর্গভূষণ উন্মত্তভাবে অপ্সরাসুন্দরীর গ্রীবাদেশ যুগলহস্তে পরিবেষ্টন করিলেন।

ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। ঠিক যেন ধর্ম্মরূপে ভূপেশচন্দ্র গৃহ-প্রবেশ করিয়া সেই পাপপিশাচকে সজোরে পদাঘাত করিলেন। “যা! যা! দূর হ! দূর হ! যদিও তুই এখন আমার উচ্চ পদস্থ, কিন্তু এখন আর এক পদাঘাতে তোরে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব। এখনও আজ্ঞা করিতেছি, দূর হ! লজ্জা!—লজ্জা!—লজ্জা! সুপবিত্র গৃহস্থসংসার তোর মত নীচ লোকের পদার্পণে অপবিত্র হয়, তোর অপবিত্র করস্পর্শে পবিত্র কুমারীর গাত্র কলঙ্কিত হয়, বিধাতার হয় ত ইহা মনে ছিল না। কিন্তু তুই নরাধম,—

অপ্সরাসুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া পাঁচ সাত হস্ত দূরে, সতেজে, সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া ভূপেশচন্দ্র কহিতে লাগিলেন, “স্বর্গভূষণ! তোর পরমায়ু অনেক। এই যে আমার হস্তে আগ্নেয় অস্ত্র, এখনি,—এই মুহূর্ত্তে, এই অস্ত্র তোরে ভস্ম করিতে পারিত। কিন্তু যৌবনাবধি ভূপেশ-

চন্দ্রের ব্রত আছে, যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত আর কোন স্থানে কোন পার্থিব ভ্রাতার শোণিত দর্শন করিবে না, কাহারও প্রাণ হরণ করিবে না। সেই নিমিত্তই আজ তোর নিষ্কৃতি। নতুবা আর এক পদাঘাতে এই লহমায় আমি তোরে শমন সদনে প্রেরণ করিতে পারি।"

"ছি! ছি! ছি! দুষ্ট লোককে ক্ষমা করাই সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়। তুমি ভূপেশচন্দ্র! কি কর? দুই বৎসর পরে আমি তোমারে দর্শন করিলাম, তুমি একটা হিতাহিত বিবেকশূন্য শূকরসন্তানের সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিলে?"

হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। যে মিষ্ট মিষ্ট স্বর তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করিল, সে স্বর অপ্সরাসুন্দরীর। এ কথা আমরা বলিয়া না দিলেও পাঠক মহাশয় অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু সে কথায় কোন কাজ হইল না। ক্রোধের সময় মানুষের জ্ঞান থাকে না, ভূপেশচন্দ্র মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সেই দুষ্ট সৈনিককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। আবার কি যেন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি,—ক্ষমাপ্রবৃত্তি তাঁহার মানসে আসিয়া ধর্ম্মসিংহাসন অধিকার করিল। তিনি হাত গুটাইয়া লইলেন। মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার রসনা উচ্চারণ করিল, "দূর হ নরাধম! ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলে আমি আর আপনার উপরে কর্তৃত্ব রাখিতে পারিব না। প্রবল রিপু আমার হৃদয়রাজ্যের রাজা হইবে।"

"তুই জানিস, কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিস্?"

"জানি, সতীর সতীত্বহারক, রাজার রাজত্বহারক, নিরাশ্রয় পথিকের সর্ব্বস্বচোর, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের সর্ব্বথা বিরোধী, এক পামরের সহিত আমি কথা কহিতেছি।"

"আমি না কি তাই?"

"মনে বুঝিয়া দেখ, পাপাত্মা! পাষণ্ড! নরাধম! যে নারী কাঙ্গালিনী,—যে নারী আশ্রয়শূন্য,—যে নারী বিবাহের অগ্রেই ভাবী পতিপ্রাণা, সেই সতী নারীর ধর্ম্মনষ্ট করিতে তুই এখানে উপস্থিত হইয়াছিস্, জানিতেছি। জানিয়াও ক্ষমা করিতেছি। দূর হ!"

স্বর্ণভূষণ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। অচল বৃক্ষের মত কিয়ৎ-

ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "এখনও বলিতেছি, দূর হইয়া যা! আর নিমেষমাত্র এখানে অপেক্ষা করিলে আর আমি আমার শরীরের রিপুর উপর স্বামিত্ব করিতে সমর্থ হইব না!"

"আচ্ছা! আমিও ইহার প্রতিশোধ লইব!" অস্পষ্ট স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে সম্ভাবিত অপমানের আশঙ্কায শঙ্কাকুল স্বর্গ-ভূষণ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমরা নারীজাতিকে ভক্তি করি। কিন্তু নারীজাতির মন বড় সন্দেহ-প্রবণ। একটুতে সন্দেহ আসে, একটুতে সন্দেহ যায়। অপ্সরাসুন্দরী যে গৃহে বাস করেন, সেই গৃহের অধিকারিণী যিনি, স্বর্গভূষণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন, অপ্সরার চরিত্র ভাল নয়। কিন্তু যখন পরিণাম দেখিলেন, তখন আপনা আপনি জিব্ কাটিয়া কহিলেন, "আমাব মন বড পাপী। এই স্বর্গলক্ষ্মীকে আমি অসতী মনে করিয়াছিলাম। পরমেশ্বর আমাবে ক্ষমা করুন, আর যেন কোন পবিত্র স্বভাবের প্রতি এমন সংশয় আমার পাপমনে সমুদিত না হয়।"

স্বর্গভূষণ চলিয়া গেলেন, কাহাকে নিকটে দেখিয়া, কাহাকে যেন চিনিতে না পারিয়া আকাশ পানে চাহিয়া অভাগিনী অপ্সরাসুন্দরী কহিতে লাগিলেনঃ——————

নমি আমি মহাদেবি! চরণ-অম্বুজে।
কিঙ্করীরে কৃপা কর সতী চতুর্ভুজে॥
নিকটে দাঁড়ায়ে আছে চিনিতে না পারি।
নিতান্ত তাহারি দাসী আমি কুল-নারী॥
কাতরে করুণা কর কৃপাময়ী সতি।
ভয়ে ভীতা সতীলক্ষ্মী ভয়াতুরা অতি॥
কারে আমি হেরিতেছি, না পারি চিনিতে।
কারে পাঠাইয়া দিলে মায়া অবনীতে॥

আমি মা তোমার দাসী গিরীশ-নন্দিনি !
শ্রীপদে প্রণতি করি জগত-বন্দিনি ॥
আকাশে বাতাসে যেন উড়াইছে মন।
অচেতনে আছি সতী কর সচেতন ॥
তুমি মায়া মহামায়া তোমারি আশ্রয়ে।
বাঁচিয়া রয়েছি দেবি ! বাঁচাও অভয়ে ॥

স্তুতি মহামায়ার কর্ণে গেল। কি বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেন, ভক্তিমতী হয়ত তাহা শুনিতে পাইলেন, আর কেহ তাহার একটীমাত্র অক্ষরও শুনিতে পাইল না।

ত্রিংশ প্রবাহ।

তুমি—না—আমি ?

"Such efforts and failures may serve to maintain in our minds a due sense of the incommensurable difference between the Conditioned and the unconditioned.

* * * * *

* * * * *

We may keep alive the consciousness that it is alike our highest wisdom and our highest duty to regard that through which all things exist as the Unknowable."

Spencer's first Principles.

যেন উন্মত্তের ন্যায় চঞ্চলভাবে ছুটিয়া অনাবৃত দ্বারে ধাক্কা দিয়া আমাদের আখ্যায়িকার অকারণ উদাসীন বিভ্রান্ত নায়ক যেন উন্মাদস্বরে অপ্সরা-

সুন্দরীকে কহিতে লাগিলেন, "অপ্সরা! রাজনন্দিনি! সে কি তুমি? না আমি?"

কথা বুঝিতে না পারিয়া, উত্তরচ্ছলে অপ্সরাসুন্দরী নূতন প্রশ্ন করিলেন, "কাহার কথা কাহারে জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

"তোমার কথা, আর আমার কথা। সতি! সতি! দেবি! দেবি! সেই লোক আবার আসিয়াছে। ভাল করি, জীবনে আমি কখনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই। বিধাতা সাক্ষী, চন্দ্রমা সাক্ষী, যে লোক বারংবার আমারে পীড়ন করিতেছে, তখনও তাহার ভাল ভিন্ন আমি মন্দ করি নাই। কিন্তু সেই লোক আবার আসিয়াছে! জীবন সুন্দরি! জীবন-সহচরি! তোমারে আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি, না আমি? পথে আসিতেছিল, হঠাৎ আমারে দেখিতে পাইয়া সেই লোক আবার যেন আমার সংসারালোক হইতে মঙ্গল অপহরণ করিবে, ঠিক সেই ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল, আমি যেন পাগল হইয়া ঘরে আসিয়াছি। এমন যে তুমি আমার সামগ্রী, তোমারেও যেন আমি চিনিতে পারিতেছি না। তুমি সম্মুখে আছ, আমি সম্মুখে আছি, তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি না আমি?"

"সেই লোক! সেই লোক তোমারে পাগল করিয়া দিয়াছে?"

"দিয়াছে কি না, জানি না। সঙ্গ লইয়াছে। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই নরঘাতী রাক্ষস এই মুহূর্ত্তেই এখানে উপস্থিত হইতে পারে।"

"যদি পারে জান, তবে ক্ষত্রিয় শোণিত হৃদয়ে ধারণ কর কেন?"

"সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শরীরে কেহ আঘাত না করিলে———"

"বড় দুঃখে তুমি আমারে হাসাইলে। যে লোক প্রাণে আঘাত করিতে পারে, সে যে শরীরে আঘাত করিতে পারে না, এ কথা অসম্ভব। প্রাণের আঘাত অপেক্ষা শরীরের আঘাত যে বড়, নারীজাতি আমি, তাহা ত বিশ্বাস করি না।"

"যাই আমি, যাই। ছাড়িয়া দাও, অপ্সরা! ছাড়িয়া দাও, যাই আমি। বাক্য দিয়া আসিয়াছি, অঙ্গীকার লংঘন করিতে পারিব না।"

"যাইতে ত দিব না। এই দ্বার রুদ্ধ করিলাম, খড়্গধারিণী হইয়া এই

দ্বার সমীপে দাঁড়াইলাম, কৃতান্ত আসিলেও আমার হস্তের এই খড়্গ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ভূপেশ! তোমারে রক্ষা করিবার জন্য যদি কৃতান্তকেও আলিঙ্গন করিতে হয়, অপ্সরাসুন্দরী তাহাতেও পরাঙ্মুখিনী হইবে না। এ কথা একদিনও আমি প্রকাশ করি নাই, কিন্তু এ ব্রত,—এই চিরব্রত আমার জীবনের।”

ভূপেশচন্দ্র কাঁপিতে লাগিলেন। ঘন ঘন দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল। অপ্সরা কহিলেন, “যদি মিত্র হও, প্রবেশ করিতে পার। যদি বৈরী হও, দূর হইতে পার। সত্য পরিচয় দাও, অপ্সরার হস্তে যে দ্বার অবরুদ্ধ, শত্রু মিত্র উভয়ের পক্ষে সে দ্বার অনাবৃত হইতে পারে; দুই প্রকারেই আমি,—আমি অপ্সরাসুন্দরী, দুই প্রকারেই আমি শত্রুমিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জানি। আমার একটী রসনা আছে, পূজনীয় অতিথিকে সে রসনা অভ্যর্থনা করিতে জানে। আমার হস্তে খড়্গ আছে, বিপক্ষ বৈরীকে সে খড়্গ অভ্যর্থনা করিতে জানে। সত্য পরিচয় দাও, দ্বার অনাবৃত হইবে।”

“কোন দুরভিসন্ধিতে আমি এখানে উপস্থিত হই নাই। তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আমার অন্তরে আর কোন দুষ্ট প্রবৃত্তি নাই।”

“পরমেশ্বর! ত্রিসংসারের সাক্ষী তুমি, যে অতিথি এমন শপথ করিতে পারে, অবশ্যই তাহারে আমি প্রবেশ করিতে দিব। পুণ্যের পুরস্কার, পাপের দণ্ড সংসারে কেবল একমাত্র তোমারি হস্তে। আর অধিক কি প্রার্থনা করিব দয়াময়! অতিথির প্রতিকূলে দ্বার অনুদ্‌ঘাটিত থাকিবে না, থাকিতে পারেও না।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অপ্সরা-সুন্দরী দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন।

বিতাস্থ প্রবেশ করিল। ভূপেশচন্দ্র যেন অন্যমনস্ক ভাবে হাস্য করিয়া সেই লোককে একখানি আসন দেখাইয়া দিলেন, দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থকারের ন্যায় গম্ভীর ভাবে বিতাস্থ সেই আসনে উপবেশন করিল। রোষে, ঘৃণায়, শঙ্কায় কম্পিত হইতে হইতে অপ্সরাসুন্দরী সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সজল নয়নে, সঙ্কেতে ভূপেশচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন, ভূপেশচন্দ্র হয় ত সে ইঙ্গিত বুঝিলেন না, কিম্বা অতিথিকে

ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে নাই, সেই ধর্ম্মবিশ্বাসে গৃহমধ্যে অবস্থিত রহিলেন।

দুই দণ্ড অতীত। বাক্য বিনিময় হইল না। মনে মনে প্রতিশব্দ হইতেছে, তুমি না আমি? নিশ্বাসের এতদূর শক্তি, দুই বৎসরের বালক বালিকা যথাসাধ্য, যে মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে, পূর্ণবয়স্ক যুবক-যুবতী নিশ্বাস-প্রতাপে সে মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। সে নিশ্বাস কি বাক্য রোধ করে? পাগলে হয়ত সে কথা বলিবে, কিন্তু যে নিশ্বাস বাক্যরোধক, রসনা-রোধক, সে নিশ্বাস ধমনীর শোণিত সঞ্চালন-রোধক মর্ম্মভেদী নিশ্বাস। অপ্সরাসুন্দরী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু ভূপেশচন্দ্র যেন চপলা সঞ্চালনে চমকিত। সংক্ষেপ—সংক্ষেপে একটী সংক্ষিপ্ত কথা,—বহ্নি-সদৃশী মানসিক যন্ত্রণা, আশাশূন্য হৃদয়কে স্তবকে স্তবকে দগ্ধ করিয়া দেয়। যে কথা মনে করিলে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ছবি চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, মহাবিপদে সে কথা সকল মানুষেরই মনে পড়ে। সকল মানুষেই সে ভয়ঙ্কর ছবি দেখে। পাঠক-মহাশয় হয় ত মনে করিতে পারেন, স্বয়ং যদি ভুক্ত-ভোগী না হন, লোকের মুখেও হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, যে লোক সাগরে ডুবিয়া জীবনের জন্য সাগরের সঙ্গে, তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করে, সে লোকের বাঁচিবার কত সাধ। ভূপেশচন্দ্রের হয় ত বাঁচিবার সাধ ছিল না। তিনি অটলভাবে বৈরী সাক্ষাৎ করিয়াছেন। যে লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, তাহার আর সে চেহারা নাই। তত দর্প, তত অহংকার যাহার ছিল, শ্রীর সঙ্গে সে দর্প, সে অহংকার তাহারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অর্দ্ধ উপবাসী অভাগা। পরিহিত বস্ত্রে কেবল সূতামাত্র আছে, কিন্তু সে সূতাতে গ্রন্থি নাই। ছিন্ন বস্ত্র এক প্রকার দর্পণ। সে দর্পণে শরীরের ছায়া দেখা যায়। ছিন্ন পাদুকার মধ্য হইতে পদাঙ্গুলিরা উঁকি মারে! ললাট-শিরা, কপোল-শিরা, বক্ষ-শিরা, হস্ত-শিরা অপরিস্ফুট সুপ্রকাশ। বদনে কিছুমাত্র জ্যোতি নাই, তথাপি পূর্ব্ব তেজে যেন সেই জ্যোতিশূন্য বদন জোর করিয়া প্রফুল্ল প্রফুল্ল দেখাইতেছে। ঢাকা থাকে না। ভূপেশচন্দ্র দেখিলেন, বুঝিলেন, বিশ্বাসঘাতক বিতাসু এখন

নিষ্ঠুর দুরবস্থার দাস। বিতাস্থ এখন মিত্রভাবে ভূপেশের সহিত কথা কহিতে পারিতেছে না। প্রতারণা-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এক রাত্রে যেরূপ গর্ব্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, এ রাত্রে সেরূপ প্রতারণাও আর প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, ভূপেশ-চন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীমান।

"যাবদেব কমলা কৃপান্বিতা,
তাবদেব ভবনং বধূঃ সুখং।
পৌরুষান্বিত তনুং, জনাদর,
নাস্তিচেৎ প্রথম-বর্ণ-বর্জ্জিতং॥"

যত দিন কমলার কৃপা থাকে, তদবধি গৃহ, স্ত্রী, সুখ, পৌরুষ, আদর সমস্তই থাকে। যখন তাঁহার অকৃপা হয়, সকলগুলিরই প্রথম বর্ণ বর্জ্জিত হইয়া যায়। যথা,—ভবনং ভ বর্জ্জিত হইলে—বনং, বধূঃ—ব বর্জ্জিত হইলে,—ধূ, সুখং, সু বর্জ্জিত, খং, অর্থাৎ আকাশ। পৌরুষান্বিত, পৌ বর্জ্জিত, রুষান্বিত, অর্থাৎ সর্ব্বদাই ক্রোধ। জনাদর,—জ বর্জ্জিত,-নাদর, কোথাও আর আদর থাকে না। এক সময়ে বিতাস্থর সৌভাগ্যের উদয় ছিল। এখন কমলা তাহারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আকৃতিতেও যেন অলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী। সেই ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ ছদ্মবেশ না রাখিয়া প্রকাশ্য দস্যুবৎ ভূপেশচন্দ্রের অর্থ অপহরণের সংকল্প করিয়াছে। তাহার কুটিল কটাক্ষপাতে ঠিক সেই ভাব ব্যক্ত হইতে লাগিল।

"আমি জানিতেছি, আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি আমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেছ।" প্রত্যুৎপন্নমতিপ্রভাবে সহসা যেন কি অবধারণ করিয়া ভূপেশচন্দ্র মৌনভঙ্গ করিলেন। পুনরায় কহিলেন, "এখানে আমাদের কথোপকথন হইতে পারে না। অধিকন্তু যদি তুমি এখানে আমার নাম প্রকাশ না কর, তাহা হইলে বোধ করি, তুমি যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এখানে আমাদের কথোপকথন হইতে পারে না।"

"তবে কোথায় যাইতে হইবে, চল। আমি এই দণ্ডেই তোমার অনুবর্ত্তী হইতেছি।"

ইঙ্গিতে ভ্রূভঙ্গী করিয়া অপ্‌সরাসুন্দরী ভূপেশচন্দ্রকে নিবারণ করিলেন। সে ইঙ্গিতের দিকে বিতাসুর চক্ষু গেল না। সেইরূপ অলক্ষিতে, সেইরূপ ইঙ্গিতে ভূপেশচন্দ্রও কি উত্তর করিলেন। ধূর্ত্তের সহিত গৃহের বাহিরে যাওয়াই স্থির হইল। ধূর্ত্তের সহিত ভূপেশচন্দ্র বহির্গত হইলেন। ডাকঘরের নিকট দিয়া এক অতিথিশালার দ্বারদেশে উভয়ে সমুপস্থিত। সেই অতিথিশালায় প্রবেশ করাই ভূপেশচন্দ্রের ইচ্ছা।

"না, তাহা হইতে পারে না। আমি এখানে প্রবেশ করিতে পারি না। তুমি আবার ঘরে চল।"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "না, তুমি জিদ্ করিও না। সে গৃহে আর আমি তোমারে লইয়া যাইব না। তোমার সহিত আমার যে সকল কথা, তাহা যেখানে সেখানেই হইতে পারে। গৃহে তোমাকে আর লইয়া যাইব না।"

"আমি ত সে গৃহ ভাল করিয়া দেখি নাই। শুনিয়াছি, তোমার সৌভাগ্যের অবস্থা।–সেই অবস্থা ভালরূপে জানিয়া শুনিয়া আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা প্রকাশ করিব।"

"আর যদি আমি অস্বীকার করি?" দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া ভূপেশচন্দ্র বলিলেন, "আর যদি আমি অস্বীকার করি?"

এই ক্ষুদ্র প্রশ্নের সঙ্গে তাঁহার বদনে আরক্ত আভা বিকাশ পাইল। সেই রক্তিমরাগে হৃদয়ের ক্রোধাবেগ সে সময়ে যেন চাপা দিয়া রাখিলেন।

"যদি তুমি অস্বীকার কর,—ঐ দূরে কোতোয়ালির প্রহরী যাইতেছে, উহাকে ডাকিয়া তোমাকে আমি ধরাইয়া দিব। আমি,——"

"কোতয়ালির নাম করিও না। কেন বারংবার এইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন?" বক্তার সমস্ত কথা শ্রবণ না করিয়াই বিকম্পিত ওষ্ঠে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "কবে আমি তোমার কি অপকার করিয়াছি? ভাবিয়া দেখ দেখি, বিতাসু! তুমি পুনঃপুন নিষ্কারণে আমার কতদূর অনিষ্ট সাধন করিয়াছ?"

"আমি তোমার সহিত কথা কাটাকাটি করিতে আসি নাই। সে ইচ্ছাও করি না। তুমি বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ। বৃথা বৃথা উত্তেজিত হইতেছ। তোমার বাক্যব্যয়ে আমার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। পথে আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না।"

"পার না? তোমারই কার্য্য, আমার কোন কার্য্য নাই। তোমারই কার্য্যের নিমিত্ত আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি।"

'হইয়াছ সত্য, কিন্তু পুনরায় সেই গৃহে আমাকে লইয়া চল।"

"বিতাস্থ! কেন বল দেখি, তোমার এতদূর পণ? বোধ হয় তুমি লক্ষ্য কর নাই, সেই পবিত্র গৃহে এমন একটী পবিত্র সামগ্রী আছে, তোমার এই রাক্ষস-সদৃশ বিকট বদন দর্শন করিয়া সেই সামগ্রী আমার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আবার যদি সেই স্থানে তোমারে আমি লইয়া যাই, সে সামগ্রী হয় ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। তোমার যাহা কিছু বলিবার থাকে, এই অতিথিশালায় প্রবেশ কর, এই স্থানেই আমি তোমার সকল কথা শুনিব। বিতাস্থ! যে তোমার কখনও কোন অপকার করে নাই, সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র রমণীর বক্ষঃস্থলে, কেন বল দেখি তুমি ছুরিকা আঘাত কবিতে ইচ্ছা কর? বিতাস্থ! বিনয় করি, মিনতি করি, হাতে ধরিয়া প্রার্থনা করি, যদি আমাকে ক্ষমা করিতে না পার, সেই নিরপরাধিনী রমণীকে ক্ষমা কর।"

"আরও,—এখনও কেন বৃথা বিতণ্ডা? সে বারে,—সেই দেশে তুমি আমাকে আহাম্মক বানাইয়াছিলে, আমি তোমাকে——"

"সত্য বটে।" আরব্ধ বাক্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "সত্য বটে। হৃদয়-শোণিত ব্যয় করিয়া যাহা যৎকিঞ্চিৎ অর্জ্জন করিয়াছিলাম, সমস্তই তোমার হস্তে অর্পণ করিয়াছি। আমি আহাম্মক না হইয়া, তোমারে আহাম্মক বানাইয়াছিলাম, এ কথা সত্য বটে!"

কথাগুলি বলিয়া ক্ষোভ-ক্রোধ মিশ্রিত নয়নে মনঃক্ষুণ্ণ ভূপেশচন্দ্র সেই নৃশংস পিশাচের মুখের দিকে চাহিলেন।

কথা শুনিয়া না হউক আকৃতি দেখিয়াও, নেত্রে বারি-ধারা দেখিয়াও নিষ্ঠুর লোকের পাষাণ-হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। ব্যঙ্গভাবে হাস্য

করিয়া কহিল, "তোমার অর্জ্জন? বটে! ঠিক বটে। যে লোক না জানে, তাহার কাছে গোপন করিও। তখনও আমি জানিতাম, এখনও আমি জানি, তুমি যাহা আমাকে প্রদান করিয়াছিলে, অক্লেশে তাহার দ্বিগুণ প্রদান করিতে পারিতে। ইচ্ছা করিয়া বঞ্চনা করিয়াছিলে। আমি যেন তোমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। তুমি, ভূপেশচন্দ্র!—"

"রসনা দমন কর। প্রথমেই সতর্ক করিয়াছিলাম, পুনরায় সতর্ক করিতেছি, ও নাম এখানে উচ্চারণ করিও না।"

অভিসন্ধি সাধনের বাধা জন্মিবে জানিয়া কূটবুদ্ধি বিতাস্থ একটু হাস্য করিয়া কহিল, "তুমি ইন্দুভূষণ! তুমি আমাকে দেশে যাইবার পাথেয় বলিয়াও একটা কি দুটা মোহর পর্য্যন্ত প্রদান কর নাই। তোমার নীচত্বকে উচিত মত শাস্তি দিবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই।"

"প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলে, তাহা আমার মনে আছে। যতদিন জীবন রহিবে, ততদিন মনে থাকিবে। সামান্য পুরস্কারের লোভে তুমি আমাকে সেই সময় বৈরিহস্তে বিক্রয় করিয়াছিলে। সে বিশ্বাসঘাতকতা তোমার মনে না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার মনে আছে। আমি এখন আর চিত্তবেগ দমন করিতে পারিতেছি না। তুমি এই অতিথিশালায় প্রবেশ কর।"

"তুমি বড় গোল করিতেছ। যদি এখানে অনেক লোক জড় হয়, তাহা তোমারই দোষ। আবার আমি তোমাকে বলিতেছি, মনে যে ভার আছে, তোমার মস্তকে তাহা নিক্ষেপ করিব। তোমাকে ধরাইয়া দিব।"

সত্য সত্য এক জন প্রহরী অদূরে পরিভ্রমণ করিতেছিল; সদর্পে বক্ষ-বিলম্বিত শ্মশ্রু দুলাইয়া সেই ব্যক্তি সমীপবর্ত্তী হইল। যথাযোগ্য পদের উপযুক্ত কর্কশস্বরে কহিল, "ধরাইয়া দিবে? কাহাকে ধরিতে হইবে? অপরাধের নাম কর। আমার নিকটে হাতকড়ি আছে, অপরাধের নাম শুনিলেই বাঁধিয়া ফেলিব।"

উত্তেজিত ভাবে যেন একটু কাঁপিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বিতাস্থ!

আমার সঙ্গে এসো।" যে স্বরে এই চারিটী কথা উচ্চারিত হইল, চক্ষের সঙ্গে মিশিয়া সেই স্বর যেন জানাইয়া দিল, মিনতি।

মনে মনে হাসিয়া প্রবঞ্চক কহিল, "না কোতয়াল! এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তাপ্রসঙ্গে আমি একটী গল্প বলিতেছিলাম। সত্য সত্য ধরাইয়া দিবার কোন লোক এখানে নাই, কোন কথাও নাই।"

দক্ষিণ হস্তের এক অঙ্গুলি উত্তোলনপূর্ব্বক সেলাম করিয়া প্রহরী তথা হইতে চলিয়া গেল।

ভূপেশচন্দ্র যথার্থই ভয় পাইয়াছিলেন। মনে তাঁহার ধারণা ছিল, রাজ্যের ব্যবস্থা, যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে; দুঃখে তাঁহার অন্তঃকরণে তখন এম্‌নি ঔদাস্যের উদয় হইল যে, অন্তরে অন্তরে কহিলেন, "ধরণিদেবি! দ্বিধা হও, এ অভাগাকে গ্রাস কর।" মুখ ফুটিয়া আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে সুখময়, শান্তিময় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একজন ডাকাতের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, হতাশকে আর আক্ষেপকে সঙ্গে করিয়া সেই ডাকাইত সমভিব্যাহারে পুনরায় সেই শান্তিধামে উপস্থিত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে উভয়ে আর অধিক কথা হয় নাই। গৃহে প্রবেশ করিয়া, বিতাসুরূপী দস্যু যেন বিশ্বস্তভাবে কহিল; "আর আমি তোমাকে সে নামে ডাকিব না। ইন্দুভূষণ! তুমি অতি সৎলোক। বুদ্ধির দোষে যাহা করিয়াছি, যাহা বলিয়াছি, ভূতকালের গর্ভে তাহা ডুবাইয়া দাও। আমি ডুবাইয়া দিয়াছি। আর কি আমি তোমার অপকার করিতে পারি? গ্রহের চক্রে মানুষ কখন কি করে, তাহা কি মনে করিয়া রাখিতে হয়? ইন্দুভূষণ! ভাই! তুমি আমার যে মিত্র, সেই মিত্র। এখনও কি তুমি আমাকে শত্রু বিবেচনা কর? যাহা এতক্ষণ বলিতেছিলাম, তাহা রহস্য মাত্র। যাহাতে তুমি নিরাপদে থাক, প্রাণপণে আমি সে চেষ্টা করিব। এবারে আমি তদপেক্ষা অধিক বিপদে পড়িয়াছি।"

"বিপদের নাম কর। আমার নিকটে কি চাও, প্রকাশ কর। তুমি বন্ধুত্ব রাখিতে পার নাই, কিন্তু আমি বন্ধুত্ব রাখিতে জানি, বন্ধুত্ব রাখিয়াছি, চিরদিন রাখিব; কিন্তু বিতাসুর! তুমি রাখিতে পারিলে না।"

"সেখানে একদল লোক হইয়াছে, তাহাদের শরীরে নিত্য নিত্য যেন আমি কৃতান্তকে দর্শন করি। তাহারা আমাকে ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প। তুমি আমার এমন বন্ধু থাকিতে যদি সেই যমোপম বিপক্ষদল প্রবল হইতে পারে, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।" কথা বলিয়া, মাথা নীচু করিয়া সেই দুরন্ত দস্যু এমনি ভাবে হাসিল যে, যে কথা শুনিয়া দয়া হওয়া উচিত ছিল, সেই হাসি যেন তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দিল, জাতশত্রুর মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ।

ভূপেশচন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না; এক অগ্নি তাঁহার অন্তরে জ্বলিতেছিল, আর এক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। যাহাকে তিনি জীবনাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়বস্তু মনে করেন, সেই প্রাণাধিক প্রিয় বস্তুর প্রাণধারণের সম্বল এক দস্যুকর্তৃক আকর্ষিত হইবে।

"তুমি কি ভাবিতেছ? ইন্দুভূষণ! যদি তোমার সাহায্য করিবার ক্ষমতা না থাকে, যদি তুমি কাতর হও, আমি চাহি না। তোমার হৃদয়ে আমি আঘাত করিব না। আমার জন্য,—চক্ষে দেখি নাই, শুনিয়াছি, আমারই জন্য তুমি গুরুতর দণ্ড সহ্য করিয়াছ। তোমার কাছে যদি আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে বোধ করি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

"আমাদের জগৎ-পিতা মৃত্যুঞ্জয়। অনন্তকালেও তাঁহার অন্ত নাই।" বিনা নিমন্ত্রণে সতীদেবী যখন দক্ষালয়ে গমন করেন, শিবনিন্দা করিয়া দক্ষ প্রজাপতি সেই সময় দর্প করিয়া কহিয়াছিলেন,——

বিধবা হইবি যবে করিব শ্রবণ।
অন্নবস্ত্র দিয়া তোরে করিব পালন॥

শিব যখন মরিবে, তখন তুই আমার কাছে আসিস্ আশ্রয় পাইবি। ভগবতী সতী হাস্য করিয়া পিতৃবাক্যে উত্তর করিয়াছিলেন,—

"কারে মোর্ত্তে বল পিতা, সে হরের কি মৃত্যু আছে?
মৃত্যুকে জয় করি হর মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরেছে॥"

আমাদের মনোময় সেই মৃত্যুঞ্জয়।——কথা কহিতে কহিতে সহসা থামিয়া ক্ষণকাল সেই পিশাচের দিকে মুখ ফিরাইয়া ভয়চকিত স্বরে

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "সে দুর্দ্দিনের কথা কেন তুমি আমারে স্মরণ করাইয়া দিতেছ? আর আমি সে কথা সহ্য করিতে পারিব না। ধৈর্য্যের উপরে আমার যে প্রভুত্ব আছে, তাহাও বোধ হয় আর রাখিতে পারিব না। বিপক্ষ! সাংঘাতিক বিপক্ষ! নরপিশাচ!! যে নিষ্ঠুরদণ্ড তোর জন্য আমি ভোগ করিয়াছি, আমাব অন্তরাত্মা তাহা জানেন।—" অন্তরাত্মার নামের সঙ্গে ভূপেশচন্দ্রের নয়নে যেন অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল।

"যদি সহ্য কবিতে না পাব, সে কথা আর আমি উচ্চাবণ কবিব না।"

অপ্সরাসুন্দবী এতক্ষণ কেবল স্থিরনেত্রে উভয়ের দিকে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু ভূপেশচন্দ্র তাঁহাব দিকে চাহেন নাই। এই সময় একটু বক্রভাবে কটাক্ষপাত কবিলেন। উভয়েব অন্তরে তখন যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব, তাহা তাঁহাবা ভিন্ন আব কেহ অনুভব করিতে পাবিল না। অধিক লোক নিকটে থাকিলেও বোধহয়, পাবিতেন না। দুষ্টবুদ্ধি বিতাস্থ ইত্যগ্রে অপ্সবাসুন্দবীকে ভাল কবিয়া দেখে নাই। ভূপেশকে অন্যমনস্ক দেখিয়া কটমট্ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া সেই বিদ্যাধরীরূপিণী কামিনীকে দেখিল। দেখিল, কিন্তু অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পাবিল না। মূর্ত্তি যদিও ম্লানমুখী, তথাপি সেই মূর্ত্তিতে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। পবিত্র নয়ন, পবিত্রভাবে সেই পবিত্র মূর্ত্তিব প্রতি পবিত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতে পারে, কিন্তু পাপাচারীব পাপনয়ন সে আগুনেব দিকে চাহিতে পারে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণদেব হস্তে এক প্রকার অগ্নি থাকিত। এখনও পশ্চিম ভারতবর্ষের অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়েব গৃহে সমাধিকাল পর্য্যন্ত,—চিতানলে দগ্ধ হইবার সময় পর্য্যন্ত সূতিকাগ্নি প্রজ্জলিত থাকে, কিন্তু সতী স্ত্রীর দেহে আর নয়নে যে অগ্নি জ্বলে, পতঙ্গেরা সেই অগ্নিতে পুড়িয়া মরে। আমরা যে অগ্নি দেখি, আর যে পতঙ্গ দেখি, তাহা প্রকৃতি সুন্দরীর খেলাইবার সামগ্রী, খেলাইবাব পুতুল। সতী নারীব রূপাগ্নিতে যে পতঙ্গের আহুতি হয়, সে পতঙ্গ এই মর্ত্ত্যধামে নিত্য নিত্য বিচরণ করে। যত দিন বাঁচে, তত দিনই তাহাদের নিত্য। পাঠকমহাশয়! আপনি হয় ত অনেক পতঙ্গ দেখিয়াছেন, কিন্তু আপনি যে নিজে একটী পতঙ্গ, তাহা হয় ত সকল সময় মনে পড়ে না। পতঙ্গেরা ইচ্ছা করিয়া

অনলে ঝাঁপ দেয়, ইচ্ছা করিয়া পুড়িয়া মরে। কেন জানেন? সে কেবল ভালবাসার খাতিরে। আপনি হয় ত সংসারকে সুখধাম বলিতে পারেন, কিন্তু আমি সংসারকে অনলক্ষেত্র বলি। আপনি ইচ্ছা করিয়া এ অনলে ঝাঁপিতে আইসেন নাই। দগ্ধ হইতে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

তিন জনকেই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম দেওয়া উচিত। তস্করের মনের কথা প্রকাশ পাইতে যদিও কিছু বিলম্ব থাকে, থাকুক। অনেকক্ষণ পাঠক মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হয় নাই, তাহাব হয় ত অভিমান হইতে পারে, দুটী একটা প্রিয় সম্ভাষণ আবশ্যক হইতেছে।

বাতাসেতে উড়িতেছে কতই পতঙ্গ।
সাগরের সহ খেলে বাতাসে তরঙ্গ ॥
বায়ু সাগরের খেলা অতি চমৎকার।
সে সাগরে ভাসে প্রাণ তোমার আমার ॥
জলেরে জীবন বলি, জীবের জীবন।
তেমনি পবন দেব জগত-জীবন ॥
বাতাসে, সলিলে যদি বিচরণ করি।
মানুষ পতঙ্গ নাম বৃথা আমি ধরি ॥
সলিলে জ্বলিছে বহ্নি, বাতাসে অনল।
বনে বনে জ্বলে বহ্নি নাম দাবানল ॥
জলে আছে, বনে আছে, বাতাসেও আছে।
জন্মাবধি সে অনল থাকে পাছে পাছে ॥
সেই অনলের বন্ধু পতঙ্গ নিচয়।
অনল পতঙ্গবন্ধু দোঁহে খেলা হয় ॥
এই খেলা বিশ্বমাঝে ঘটে নিশি দিবা।
আমরা পতঙ্গরূপী অপরূপ কি বা?

তুমি আর আমি যদি পতঙ্গ না হই।
তুমি আমি যদি ভবে সেইরূপ নই ॥
তবে বল দেখি মিত্র! কোন্ মায়াছলে।
পাখাধারী পতঙ্গেরা পুড়িছে অনলে?

এই দুষ্ট অর্থপিপাসু বিতাসু অনলে ঝাঁপ দিতে আসিয়াছে। সতীর রূপানলে সে দুরাত্মা দগ্ধ হইতে পারিত, কিন্তু অর্থলোভে লোভী পাপাশয় এক একবার সেই অনল হইতে অন্য অনলে দৃষ্টি বিবর্ত্তিত করিতেছে।

অপ্সরার সহিত ভূপেশচন্দ্র চুপি চুপি কি কথা কহিতেছিলেন, বিতাসু কহিল, "চুপি চুপি পরামর্শ শিষ্টাচারের বিরোধী। যাহারা ইহা দেখে, তাহাদের মনে সন্দেহ হয়।"

"বিতাসু!" বক্ষের উপর করবদ্ধ করিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ বদনে ভূপেশ-চন্দ্র কহিলেন, "বিতাসু! ইচ্ছাবশে নহে, দুর্ঘটনাবশে বাধ্য হইয়া এক-বার আমি সৈনিক-বারিক হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। দণ্ডভোগের পর দ্বিতীয় বার প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় বার আমি সরিয়া আসিয়াছি। ইচ্ছা আমারে একবারও অবৈধ কার্য্যে উত্তেজনা করে নাই। যে ঘটনায় আমি উত্তেজিত হইয়াছিলাম, সে ঘটনা হয় ত তোমরা কেহ জানিতে পার না। পৃথিবীতে এমন লোক থাকিতে পারেন, আমার মনের কথা যাঁহারা আকর্ষণ করিয়া বুঝিতে অসমর্থ হন না, কিন্তু তোমার মত মূঢ়ের কথা দূরে থাকুক্, সে ঘটনা তাঁহারা পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত।" তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দুরাচারের প্রতি নয়ন ভঙ্গী করিয়া ভূপেশচন্দ্র আবার কহিলেন, "আমি সৈনিক শিবিরের পলাতক অপরাধী হইতে পারি, তোমার হাতে আমি থাকিতে পারি, পঞ্চলহমার মধ্যে শান্তিরক্ষকেরা আমারে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বিতাসু! যতক্ষণ আমি এখানে আছি, ততক্ষণ আমি এই গৃহের প্রভু। কোন দণ্ডভয় আমাকে ভয় দেখাইতে পারে না। পদাঘাত করিয়া আমি তোমাকে দূর করিয়া দিতে পারি।"

ভূপেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অপ্সরাসুন্দরীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

স্নেহময়ী কামিনী ভূপেশচন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া কাতর বচনে মৃদুস্বরে কহিলেন, "ভূপেশ! এ লোককে রাগাইয়া দিও না।" যেরূপ স্বর সে লোক শুনিতে না পায়, অমায়িকা রমণী সেইরূপ মৃদু মধুর স্বরে ভূপেশচন্দ্রের কর্ণে কর্ণে কি একটী কথা কহিলেন। কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হইল। করধারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "স্বর্গ-সুন্দরি! তোমার কথা আমি বুঝিয়াছি। উত্তেজিত মনকে স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, সেই জন্য কি বলিতে কি বলিয়াছি, মনে নাই। তুমি উপবেশন কর।" একখানি আসন সরাইয়া দিলেন, অপ্সরা উপবেশন করিলেন, নিজেও আর একখানি আসন গ্রহণ করিলেন। সে দস্যু লোক আপনার দুরভিসন্ধিকে আর দুষ্ট প্রতিজ্ঞাকে মনে রাখিয়া সমান গম্ভীর ভাবে স্থির হইয়া বসিয়াছিল। অপ্সরা যখন মৃদুস্বরে কথা কহিলেন, সে তখন শুনিতে পাইল না, কি শুনিল না, তাহা আমাদের জানিবার কি বলিবার আবশ্যক নাই। পাঠকমহাশয় হয় ত অনুভবে জানিয়াছেন, দুষ্ট-লোককে রাগাইলে মঙ্গল হয় না। ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বিতাসু! গোলমাল ছাড়িয়া দাও, স্পষ্ট করিয়া বল, তুমি আমার কাছে কি চাও? বুঝিতে পারিতেছি, তোমার আশা, কিন্তু নাম কর। সংখ্যা বুঝাইয়া দাও। কত তোমার প্রয়োজন?"

বিড়ালচক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া সেই ধূর্ত্ত শৃগাল বক্রোক্তিতে উত্তর করিল, "কত যে প্রয়োজন, তাহা আমি নাম করিতে পারিতেছি না। তুমি এখন বড়মানুষ হইয়াছ, সুসজ্জিত গৃহে বাস করিতেছ, আমার বোধ হয়, এ গৃহের ভাড়ার নিমিত্ত তোমাকে বৎসরে চারিশত টাকা প্রদান করিতে হয়, আজ কাল তোমার যখন এতদূর সৌভাগ্য, তখন কত প্রদান করিলে আমার অভাব মোচন হয়, কত প্রদান করিলে আমি সন্তুষ্ট হই, বিবেচনা করিয়া দুই সহস্র মুদ্রা আমাকে প্রদান কর। তাহা হইলেই তুমি জানিবে, তুমি যেন সৈনিকদল হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছ। সমস্ত সম্ভাবিত আপদ বিপদ হইতে নিরাপদ।"

ভূপেশচন্দ্রের তত টাকা ছিল না। যাহা ছিল, গৃহের আসবাব ক্রয় করিতে তাহার অনেক ফুরাইয়াছে। যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা উভয়ের

জীবিকা। সে অর্থ হস্তান্তর করিতে কোন ক্রমেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এখন বৈরী সাক্ষাৎ। উপায়? উপায় আছে কি না, অনুধাবন করিলেন না। সন্ত্রস্তভাবে কহিলেন, "যাহা তুমি চাহিতেছে, তাহার অর্দ্ধেক আমার আছে। তাহাও আমি হস্তবহির্ভূত করিতে পারি না। যদি পারিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে আমারে আর অপ্সরারে উপবাস করিতে হইবে।"

"যাহা আমার প্রয়োজন, তাহার এক কপর্দ্দকও অল্প আমি গ্রহণ করিব না। এখন যদি অর্দ্ধেক দাও, সপ্তাহ পরে যদি অর্দ্ধেক দাও, তাহা হইলে,——"

কথায় বাধা দিয়া ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "দুই কথার এক কথাও আমি পালন করিতে পারিব না। আমি বলিতেছি না, অবস্থা বলিয়া দিতেছে, দুই কথার এক কথা পালন করিতেও আমি অসমর্থ। যত মন্দ করিবার তোমার সামর্থ্য থাকে, কর।"

"তবে তুমি কি করিতে চাও?" হতাশ হইবার ভয় পাইয়া বিতাস্থ কহিল, "তবে তুমি এখন কত দিতে পার?"

"কত দিতে পারি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি আমার কত অর্থ অপহরণ করিবে, তাহাই জানিতে চাহিতেছ? আচ্ছা, আমি এই করিব, যাহা--"

"তাহা যেন প্রচুর হয়, ইহা যেন মনে থাকে।"

কথায় বাধা পাইয়া হস্ত হিল্লোলিত করিয়া অধৈর্য্যভাবে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "যদি তুমি আমাকে ধরাইয়া দিতে, কিম্বা এখনও ধরাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার গ্রেপ্তারীর জন্য যে টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, তাহা তুমি পাইবে, কিম্বা পাইতে পার। কিন্তু আমি যদি তোমাকে দুই-সহস্র কিম্বা বিংশতি সহস্র মুদ্রা এই মুহূর্ত্তে প্রদান করি, তাহা হইলেও তুমি সেই দুই শত মুদ্রার লোভে কল্য প্রাতঃকালেই বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবে। আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজপুরুষদের নিকট যাহা তুমি পাইবার আশা কর, সেই দুই শত টাকাই আমি এখন তোমারে প্রদান করিতে পারি। আর এমন একটা অঙ্গীকার করিতে পারি, যতদিন

আমি তোমার দ্বারা প্রকাশিত অথবা উৎপীড়িত না হইব, ততদিন যথোচিত বিশ্বাস রাখিয়া বর্ষে বর্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুই শত মুদ্রা তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আমার নিরাপদের নিমিত্ত তোমার সেই স্বার্থ বর্ষে বর্ষে সিদ্ধ হইতে পারিবে।"

"তাহা হইতে পারে না। ভূপেশচন্দ্র!—না,—না—ইন্দুভূষণ! তাহা কখনই হইতে পারে না। এক বৎসর পূর্ণ হইবার বহু পূর্ব্বে যদি তুমি এস্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া যদি দৈবাৎ কখনও আবার তোমাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলেই এই অঙ্গীকৃত টাকার কথা তুলিতে পারিব। নতুবা—না, সে কথা কথাই নহে। তোমার যে সহস্র মুদ্রা এখন আছে, তাহা আমাকে নগদ প্রদান কর, তাহার পর বৎসর বৎসর দুই শত মুদ্রা পাঠাইয়া দিও।"

"এ নিয়মে আমি সম্মত হইতে পারি না।" স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমার এই উৎকট নিয়মে কিছুতেই আমি সম্মত হইতে পারি না।"

অপ্সরাসুন্দরীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিতাস্থ কহিল, "বিরাট-কেতুর কন্যা! তুমি ইহাকে নিবারণ কর। বারবার আমার বাক্যে অস্বীকার করিয়া যেন আপনার অমঙ্গল আপনি ডাকিয়া না আনে। তুমি—"

সক্রোধ ভ্রূভঙ্গী করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বিতাস্থ! তুমি কর কি? পবিত্র কুমারীর সহিত ঐরূপ রুক্ষভাবে কথা কহিতেছ? এতদূর দুঃসাহস তোমার! যে কথা একবার উচ্চারণ করিয়াছ, শ্রবণ কর, সাবধান হও, আর তাহা পুনরুক্তি করিও না। আমি তোমার অত তাচ্ছিল্যের পাত্র নহি। তুমি মনে কর, আমি জীবনে মায়াদয়াশূন্য মরিয়া লোক। বাস্তবিক তাহাই যথার্থ। আমি স্বইচ্ছায় সাজা লইবার জন্য সেনাদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি। সেখানে যত নৃশংস লোক আছে, তাহারা যতদূর সাধ্য, আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে পারে; তাহাতে আমি ততদূর ভয় রাখি না। যেখানেই যাই, যত বিপদের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করি, দুরাত্মা লোকদের যতদূর দৌরাত্মই আমার মস্তকের উপর বর্ষিত হউক, ভয় রাখি না।

মনে এক প্রবোধ থাকিবে, অর্থাভাবে আমার অপ্সরাসুন্দরীর কোন ক্লেশ হইতেছে না। দুরাচারদিগের অত্যাচারে যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, গ্রাহ্য করি না। জানিয়া মরিব, অন্নবস্ত্রের অভাবে আমার অপ্সরাসুন্দরী ভিকারিণী হইয়া সংসারের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেছেন না। বিতাম্বু! এতক্ষণে তুমি আমার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে? সাহসে নির্ভর করিয়া আমি সমস্ত ক্লেশ, সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু তোমার মত পাষণ্ডের ঘৃণিত লোভরিপু চরিতার্থ করিবার জন্য অপ্সরাসুন্দরীকে আমি কাঙ্গালিনী করিতে পারিব না।"

এই সকরুণ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী সজল সতৃষ্ণ নয়নে ভূপেশচন্দ্রের বদন নিরীক্ষণ করিলেন। ওঃ! যদিও সেই করুণাময়ী কুমারী ভূপেশচন্দ্রের নিরাপদের নিমিত্ত যথাসর্ব্বস্ব প্রদান কবিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, তথাপি ভূপেশচন্দ্রের তাদৃশ করুণাপূর্ণ সতেজ বাক্যে তদ্বিপরীতে একটী কথাও উচ্চারণ করিলেন না।

"তবে আমি যাহা জানি, তাহাই করি।" ভূপেশের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিতাম্বু কহিল, "তবে আমি যাহা জানি, তাহাই করি।" মুষ্টিবদ্ধ হস্তে বক্ষদেশ স্পর্শ করিয়া ধনলোভী নরপিশাচ গৃহের দ্বারপথে অগ্রসর হইল।

"দোহাই পরমেশ্বর! উহাকে যাইতে দিও না।" যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক স্বরে ভূপেশচন্দ্রের কর্ণে অপ্সরাসুন্দরী এই কটী কথা কহিলেন।

তদনুরূপ মৃদু অথচ ত্বরিতস্বরে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "না রাজকুমারি! ও ব্যক্তি যাইবে না।"

দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিতাম্বু কহিল, "আর একটী কথা আমার; যাহা তুমি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ, তাহা সমস্ত আকর্ষণ করা বোধ হয় অত্যন্ত কঠিন কথা। যদি তোমার কেবল সহস্র মুদ্রা সঞ্চিত থাকে, অবশ্যই তাহা অধিক নয়। আচ্ছা; আমি বিবেচনা করিব। আপাততঃ পাঁচশত মুদ্রা প্রদান কর; আর বর্ষে বর্ষে যে দুই শত মুদ্রা প্রদানের অঙ্গীকার, তাহার যেন অন্যথা হয় না।"

"তুমি তাহাই কর।" তাড়াতাড়ি ভূপেশচন্দ্রের কাণে কাণে অপ্সরা-

সুন্দরী কহিলেন, "তুমি তাহাই কর। যত শীঘ্র হয়, এই ভয়ঙ্কর লোককে বিদায় করিয়া দিতে পারিলেই বাঁচি।"

"তোমার যখন এই ইচ্ছা, তখন অবশ্যই ইহা পূর্ণ হইবে।" চুপি চুপি অপ্সরাকে এই কথা বলিয়া, সেই ভয়ঙ্কব লোকের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বিতাস্থ! বিতাস্থ! তোমার যখন বিবেচনাশক্তি জন্মিয়াছে, তুমি যখন নরম হইয়াছ, তখন আমি সম্মত হইলাম।"

বিতাস্থকে আশ্বস্ত করিয়া ভূপেশচন্দ্র অপ্সরাসুন্দরীর দিকে নয়ন ইঙ্গিত করিলেন। অপ্সরাসুন্দরী অর্থ আনয়নের নিমিত্ত কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। এই অবসরে চক্ষু নাচাইয়া বিতাস্থ কহিল, "অনেক বাক্যব্যয় হইয়া গিয়াছে এক্ষণে কিঞ্চিৎ শ্রান্তি-বিনাশক———"

"ওঃ! যাহা তুমি মনে করিতেছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি। সে বস্তু আমার গৃহে থাকে না। এক বিন্দুও না। যখন তুমি আমার অর্থ গ্রহণ করিয়া আমার গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে, তৎকালে তোমার ইচ্ছা-মত যথাস্থানে আরাম করিতে পার।"

মুখখানি কাঁচু মাচু করিয়া বিতাস্থ কহিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। এখন রাজকন্যা এখানে ফিরিয়া আসিতে না আসিতে তোমাকে আমি আর একটী বড় চমৎকাব মজার কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাজা বিরাট-কেতুর কোন সংবাদ রাখ?"

"অনেক দিন সংবাদ পাই নাই। সংবাদ রাখিবারও কোন প্রয়োজন হয় না।"

"রাজা বিরাটকেতু পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। অষ্টাদশ মাস হইল, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। বরং আরও কিছু বেশী হইবে। চমৎকার সুন্দরী! কাশ্মিরী-মহিলা। তুমি তাহারে দেখিয়া থাকিবে। নারীজাতির মধ্যে সেই নারী সৌন্দর্য্যে আর চাতুর্য্যে প্রধান দলে গণনীয়। যাহাতে নূতন রাণীর স্বভাবে দোষ পড়ে, এমন মনে করিয়া আমি এ কথা বলিতেছি না। কিন্তু—কিন্তু বৃদ্ধ বিরাটকেতুর পক্ষে সে সুন্দরী যুবতী ঠিক মানাইতেছে না। বৃদ্ধ রাজা এই অযোগ্য পরিণয়ে যথার্থ দাম্পত্যসুখে সুখী হইতে-ছেন কি না, তাহা আমি জানি না। আমি বোধ করি, এই নবীন পরি-

ণয়ে রাজা বড় অসুখী। বোধ হয় তিনি ইহার জন্য অনুতাপ করিতে-ছেন। শুধু কেবল তাহাও না, যৌবনগর্ব্বে সেই নূতন রাণী যত ইচ্ছা, ততই অপব্যয় করেন। এমন কোন পরিচ্ছদ নাই, এমন কোন অলঙ্কার নাই, যাহা তিনি নিত্য নিত্য পরিধান না করেন। উপর্য্যুপরি দুই দিন কাল একবিধ পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে উঠিতে পারে না। নিত্য প্রাতঃকালে অন্তঃপুরমধ্যে বস্তা বস্তা বস্ত্র উপস্থিত হয়। স্বর্ণকার ও মণিকারগণও প্রায় সর্ব্বদাই নবীন নবীন আভরণ প্রস্তুত করিয়া আনে।"

"সত্যই তবে রাজা বিরাটকেতু পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন? এই বৃদ্ধ বয়সে নবীন পরিণয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল কিসে? মনে মনে এই কথা কটী বলিলেন, মুখে কিছু ফুটিলেন না। জুয়াচোরের সহিত আর অধিকক্ষণ আলাপ করিতে ভূপেশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না; সংক্ষেপে তাচ্ছিল্যভাবে ঐ প্রশ্ন করিয়া পুনরায় উদাস ভাবে কহিলেন, "সে সংবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া তৃতীয়বার কহিলেন, "চুপ কর। অপ্‌সরা আসিতেছেন।"

থত মত খাইয়া বিতাস্থ চুপ করিল। অপ্‌সরাসুন্দরী প্রবেশ করি-লেন। টাকাগুলি গণনা করিয়া জুয়াচোরের হস্তে প্রদান করা হইল। ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "আমার অঙ্গীকার ত আমি পালন করিলাম। তুমি যে বাক্য রাখিতে পারিবে, তাহাতে ত আমার বিশ্বাস হয় না। সে প্রত্যাশাও আমি তোমার কাছে রাখি না। পুরস্কার পাইবার লোভে তুমি যেআবার বিশ্বাসঘাতক হইবে, তাহা জানিয়াই আজ আমি এ কথা বলি-তেছি। কিন্তু মনে রাখিও, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া একদিনে তুমি যাহা পাইবে, তাহাই শেষ। আমার কাছে বৎসরে বৎসরে যাহা পাইবার আশা, তাহা সেই অঙ্গীকৃত পুরস্কার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক।"

"তুমি তোমার কথা রাখিও, আমিও আমার কথা রাখিতে পারিব। এখন বিদায় হইলাম।" এইরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিতাস্থ চলিয়া গেল। সে ব্যক্তির বিদায়ের পর সতৃষ্ণনয়নে ভূপেশের মুখপানে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "এখনও কি তুমি ঐ লোককে বিশ্বাস কর? এখনও ঐ বিশ্বাসঘাতকের বাক্যে প্রত্যয় হয়?"

"না," মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "না, সহস্রবার না; যতক্ষণ আমি উহার সহিত কথা কহিয়াছি, ততক্ষণ আমার মনে একটী নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল।"

"আমিও তাহা বুঝিয়াছিলাম। তোমার অন্তরের কথা আমি যেমন একটী একটী করিয়া পাঠ করিতে পারি, এমন আর কেহই পারে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই নিগূঢ় অভিপ্রায়টী কি? আবার আমাদিগকে নিরাশ্রয় হইয়া এ দেশ ত্যাগ করিতে হইবে, সেই চিন্তাই কি সেই অভিপ্রায়? কিন্তু ভূপেশ! এই গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে আমি প্রস্তুত। সত্য বলিতেছি, তাহাই আমার ইচ্ছা। তোমাকে নিরাপদে রাখাই আমার একান্ত বাসনা।"

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "হাঁ, আগাগোড়া আমি সেই কথাই চিন্তা করিয়াছি। সে লোককে আমি ভাল চিনি। তাহার কথায় আমার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই। স্থানান্তর হইতে না পারিলে নিরাপদ হইবার উপায় নাই। সেই কারণেই আমাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ তাহাকে প্রদান করিলাম না। কিঞ্চিৎ সময় লইবার জন্য তাহার অপহরণে আমি সম্মত হইলাম। যতদিন সেই অপহৃত অর্থ তাহার হস্ত হইতে ফুরাইয়া না যাইবে, ততদিন সেই প্রতারক আমাদের উপর দৌরাত্ম্য করিবে না, ইহা আমি জানি। বিশেষ, বার্ষিক মাসহারার লোভে বোধ হয় আরও এক বৎসর কাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে। জগদীশ্বর আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি কখনও ছলনা জানি না। মিথ্যা-প্রবঞ্চনায় আমি চিরদিন অনভ্যস্ত। কিন্তু আজ আমি ঐ প্রবঞ্চক লোকের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছি। এমন কার্য্যে পাপস্পর্শে না। আত্ম নিরাপদ ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত অগত্যা আমি যে উপায়ের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি, সে উপায়ের জন্য আমি পাপী হইব না। ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"তিনি করুণাময়, অবশ্যই তিনি ক্ষমা করিবেন। তোমার কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয় আমার আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এখন কি পরামর্শ তোমার?"

"পরামর্শ এই, যে রাজার রাজ্যে আমরা ছিলাম, যে রাজার রাজ্যে

আমরা এখন আছি, সে রাজার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজ্যে আমরা প্রস্থান করিব। সেখানে আর ছলনাকারী দুরন্ত লোকেরা আমাদের কিছু-মাত্র সন্ধান জানিতে পারিবে না। দূরদেশে, অন্য রাজ্যে আমরা স্বচ্ছন্দে নিরাপদে থাকিতে পারিব।"

"উত্তম কল্প।" অপ্সরাসুন্দরী সানন্দস্বরে কহিলেন, "উত্তম কল্প। ভাগ্যে ঐ ধূর্ত্ত লোকটা আসিয়াছিল, সেই জন্যই ত তোমার অন্তরে এই সুন্দর কল্পনার উদয় হইল। নতুবা এই শক্রবেষ্টিত স্থানে আরও কত দিন আমাদিগকে পদে পদে শঙ্কিত হইয়া অবস্থান করিতে হইত। পরমেশ্বর সদয় হইলেন, শক্র হইয়াও সেই লোকটা আজ আমাদের এক প্রকার উপ-কার করিয়া গেল।"

"সে কথা সত্য। যে অর্থ তাহাকে প্রদান করা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের শুভ অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইতে পারে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভূপেশচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "অপ্সরা! আজ আমি তোমাকে একটী সংবাদ দিই। তোমার বৃদ্ধ পিতা পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া-ছেন। রাজারা সচরাচর প্রায় বিলাসী হইয়া থাকেন। বৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁহাদের বিলাসস্পৃহার লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রাজা বিরাট-কেতু সেই বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই এই শেষাবস্থায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন।" ভূপেশচন্দ্র অপ্সরাকে এই সংবাদটী দিলেন বটে, কিন্তু শেষাংশটী অপ্রকাশ রাখিলেন। শেষাংশ কি, পাঠকমহাশয় বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হন নাই। নবীনা রাজ্ঞী স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়া বৃথা বিলাসে ক্রমাগত অপব্যয় করিতেছেন। এ সংবাদ অপ্রকাশ রাখিবার হেতু কি, রাজা বিরাটকেতু অপুত্রক। অপ্সরাসুন্দরী তাঁহার একমাত্র দুহিতা। অপ্সরা যদি পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবার বাসনা রাখেন, ঐ অপ্রিয় সংবাদে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। সেই সংশয়েই অপ্রকাশ।

অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "পুনরায় বিবাহ করিয়া পিতা যদি সুখী হইয়া থাকেন, আমিও তাহাতে সুখী আছি।" এই কথার পর তৎকালে আর তাঁহাদের কোন কথোপকথন হইল না। প্রস্থানের আয়োজনে উভয়েই ব্যস্ত রহিলেন।

একত্রিংশ প্রবাহ।

আবার এক নূতন বিপদ!

"Here the grim tyrant meditates his wrath;
Here arms his winds with all subduing frost:
Moulds his fierce hail, and treasures up his snows,
With which he now oppresses half the globe."

Thomson.

প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূপেশের মনে,—অপ্সরার মনে সেই পূর্ব্ব প্রস্থানকালের মহাভয়ঙ্কর বিপদের কথা সমুদিত হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই কম্পিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরমপিতার অনুগ্রহে এবারের যাত্রা-কালে কোন বিপদ সংঘটিত হয় নাই। নিরাপদে তাঁহারা দূরপথ অতি-ক্রম করিয়া চীনদেশে গিয়া বাস করিলেন। ভারতবর্ষের লোক সকল দেশেই অবাধে গতিবিধি করিতে পারেন; সমুদ্রপথ পর্য্যটন করিয়া ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিলে হিন্দুসন্তান জাতিচ্যুত হয়, কত দিনের এই ব্যবস্থা, আমাদের শাস্ত্রকারগণের অনুগ্রহে তাহার ঠিক সময় নিরূপণ করা দুর্ঘট। সে তর্কের মীমাংসাও এস্থলে প্রয়োজন হইতেছে না। চীনরাজ্য ম্লেচ্ছ-রাজ্য নহে। চীনবাসীরা বুদ্ধদেবের উপাসক। সে রাজ্যে গমনে হিন্দু-জাতির বাধা নাই। মিবার, মাড়োয়ার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নানা রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী লোক তৎকালে চীনদেশে বাস করিতেছিলেন। অপ্সরা-সুন্দরীর সহিত ভূপেশচন্দ্র একজন মহারাষ্ট্রীয় সওদাগরের আবাস-ভবনে বাসা গ্রহণ করিলেন।

এক বৎসর অতীত। শীতকাল সমাগত। প্রসিদ্ধ কবিবর টমসন সাহেব শীতকালকে নিষ্ঠুর দুরন্ত ঋতু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখানে শীতকালকে কালরূপে পরিচয় দিব না। সঙ্গীত-বিশারদ পণ্ডিতেরা আমাদের দেশের রাগরাগিণীর যেরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন,

সেইরূপে আজ আমরা টম্‌সনের নিন্দাভাজন শীতঋতুকে নিদারুণ নৃশংস নররূপে এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিব। এক বৎসর অতীত। এই এক বৎসরের মধ্যে ভূপেশচন্দ্রকে কোন উৎপাত সহ্য করিতে হয় নাই। অপ্সরা-সুন্দরীও সুখে ছিলেন। শান্তি তাঁহাদিগের শান্ত কুটীরে নিরন্তর সহাস্য বদনে ক্রীড়া করিতেন। একদিন ভূপেশচন্দ্রের নিকটে বসিয়া প্রফুল্লবদনে অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ভূপেশ! অনেক দিনের পর পিতাকে একখানি পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।" সরলহৃদয় ভূপেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সম্মতিদান করিলেন। ঠিকানা দিও না, ভূপেশচন্দ্র সে পরামর্শ দিলেন না। সন্দেহ ক্রমে অপ্সরা তথাপি সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সরলহৃদয় ভূপেশ-চন্দ্র অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, "গোপন করিবার কোন কারণ দেখি-তেছি না। আমরা যে স্থানে আছি, এ স্থান নিরাপদ। এত বড় রাজ্যের কোন্ প্রান্তে আমরা বাস করিতেছি, তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করা কাহারও সাধ্য নয়। পত্রে তুমি কিছু গোপন রাখিও না।"

অপ্সরাসুন্দরী পত্র লিখিতে বসিলেন। লিখন সমাপ্ত হইলে, স্বয়ং পাঠ কয়িয়া ভূপেশচন্দ্রকে শুনাইলেন। পত্রে এইরূপ লেখা হইলঃ—

"পিতা! অনেক দিন আমি তোমারে দর্শন করি নাই, অনেক দিন আমি তোমারে পত্র লিখি নাই। বহুদিনের পর আমার হস্তাক্ষর তোমার নিকট অনাদৃত হইবে না, এই ভরসায় আজ আমি লেখনী ধারণ করিলাম। আমরা এক্ষণে চীনদেশে রহিয়াছি। প্রিয়তম ভূপেশচন্দ্রের সাধুশ্রমার্জ্জিত অর্থে এখানে আমি নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখী। পিতা! ঘটনাক্রমে আমার কর্ণ-গোচর হইল, তুমি পুনরায় বিবাহ করিয়াছ। পিতা! এই নূতন পরি-ণয়ে যদি তোমার সংসারের সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই সুখে আমি মঙ্গল আচরণ করিতেছি। পিতা! যদিও নূতন মহিষী আমার গর্ভধারিণী জননী নহেন, তথাপি তিনি আমার মাতা। তাঁহারে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবেন। আর একটী নিবেদন, আমি ভক্তিভরে প্রার্থনা করি, এই পত্রের উত্তরে দুই ছত্র লিখিয়া আমারে শুনাইবেন, তোমরা কেমন আছ। দুঃখিনী নন্দিনী বলিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ কি না, এত দীর্ঘ কালেও সংসারদুর্লভ পিতৃস্নেহ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি কি না;

আশা করি, স্নেহ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, অপরাধ ক্ষমা হইয়াছে। পিতা! তোমার হস্তাক্ষরে যদি আমি এই মার্জ্জনা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমার হৃদয় অমল আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। সেই নিমিত্ত আরও সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা, এই পত্রখানি যেন তাচ্ছিল্যে অনাদৃত না থাকে। যেন স্নেহপূর্ণ প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হই। অন্ততঃ যদি একছত্রও হয়, তাহাও আমি শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিব। পিতা! ভূপেশচন্দ্রের সদ্গুণ, সদ্ব্যবহার, সাধু প্রকৃতি আর অকপট প্রণয়ভাব এখনও কি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পার না? এখনও তুমি কি তাহা সত্য সত্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে না।"

"প্রত্যুত্তর পত্র প্রাপ্ত হইলে আমার হৃদয় মহানন্দপ্রবাহে পরিপুরিত হইয়া সমুদ্রপ্রবাহের তুল্য হিল্লোলিত হইতে থাকিবে।

তোমার স্নেহভিকারিণী কুমারী—

শ্রীমতী অপ্সরা।"

"পুনশ্চঃ——

আমারে পত্র লিখিবার সময় যদি ভূপেশচন্দ্রের নাম লিখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভূপেশচন্দ্র না লিখিয়া ইন্দুভূষণ বলিয়া লিখিও। কারণ ভূপেশ এ রাজ্যে সেই নামে পরিচিত।"

পত্রখানি শ্রবণ করিয়া ভূপেশচন্দ্র আহ্লাদপূর্ব্বক প্রেরণ করিতে কহিলেন।

যথা সময়ে যথারীতি পত্র প্রেরিত হইল। প্রেরিত হইবার কিয়দ্দিবস পরে ভূপেশচন্দ্রের কর্ণে এক অস্পষ্ট জনশ্রুতি প্রবেশ করিল, প্রয়াগধাম হইতে একজন ভদ্রলোক সম্প্রতি সস্ত্রীক চীনদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বড়ই কষ্ট! সেই ভদ্রলোকের নাম শিবদীন মিশ্র। এত কষ্টে তাঁহারা এই বিদেশে বাস করিতেছেন যে, সকল দিন তাঁহাদের আহার হয় না। যে ক্ষুদ্র কুটীরে তাঁহারা বাস করিতেছেন, তাহার ভাড়া প্রদানে অসমর্থ হওয়াতে কুটীরস্বামী তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে কৃত-সংকল্প। করুণহৃদয় ভূপেশচন্দ্রের স্বভাবতঃ সদয় হৃদয় করুণাপ্রবাহে বিগলিত হইল।

দয়াবতী অপ্সরাসুন্দরীও এই সংবাদে একান্ত কাতরা হইলেন। তাঁহারা উভয়েই ইচ্ছা করিলেন, সেই বিপন্ন দম্পতীকে দেখিতে যাইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে দয়াপরবশ ভূপেশচন্দ্র আর দয়ার্দ্রহৃদয়া অপ্সরাসুন্দরী সেই দরিদ্র দম্পতীকে কিছু দান করিবার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। শীতকাল; সায়ংকালে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, শীতে তাঁহারা ক্লিষ্ট হইয়াও ক্লেশবোধ করিলেন না। যাহা-দিগকে দেখিতে যাইতেছিলেন, তাঁহারা যে গৃহে বাস করেন, সে গৃহ অন্বেষণ করিয়া লইতে তাঁহাদের কিছু কষ্ট হইয়াছিল। নগরের এক জঘন্য পল্লীতে সেই গৃহ অবস্থিত। ভূপেশচন্দ্র এবং অপ্সরা অন্ধকারে সেই গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত। একজন কদাকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া দিল। কিন্তু যে গৃহে সেই দরিদ্র দম্পতী থাকেন, সেই বৃদ্ধা সে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গেল না। যেমন ঘৃণিত আকার, তেমনি ঘৃণিত ব্যবহার। অনুমানে অনুমানে অপ্সরাকে সঙ্গে লইয়া ভূপেশচন্দ্র সেই নিভৃত কক্ষ নিরূপণপূর্ব্বক দ্বারে আঘাত করিলেন। একটা বর্ত্তিকা হস্তে এক যুবতী আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। সুপরিচ্ছদধারী ভদ্র স্ত্রীপুরুষকে সম্মুখে দর্শন করিয়া যুবতী যেন তাঁহাদের আগমনের হেতু বুঝিতে পারিল। যুগপৎ লজ্জায় ও দুঃখে পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া গেল। দুটী চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই যুবতী দেখিতে পরমসুন্দরী, বয়স সপ্তদশ বর্ষের অধিক নহে। কেশ রুক্ষ, পাণ্ডুবর্ণ বদনে দুঃসহ বিষাদচিহ্ন, পরিধান একখানি জীর্ণ মলিন বস্ত্র।

অপ্সরাসুন্দরী স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর সুকোমলস্বরে সেই যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি শিবদীন মিশ্রের স্ত্রী?"

প্রশ্ন শ্রবণমাত্রে কে একজন গৃহমধ্য হইতে বলিয়া উঠিল, "কে আসিয়াছে অপর্ণা?"—শিবদীনের পত্নীর নাম অপর্ণা।—সে স্বরে অপর্ণার প্রতি প্রশ্ন আসিল, তাহা যেন কোন শয্যাশায়ী পীড়িত লোকের ভগ্নস্বর।

"বিদেশবাসী বিপদাপন্ন শিবদীন কি পীড়িত?" অপর্ণার হস্তধারণ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী করুণস্বরে এই প্রশ্ন করিলেন। আরও কহিলেন, "আমরা অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, বিনয়ে প্রার্থনা করি, ক্ষমা কর।

আমরা ভাবিয়াছিলাম, তোমাদের কিছু উপকার করিতে পারিব। তোমা-দের স্বদেশবাসিনী নারী আমি। কোন প্রকারে যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি, এই মনে করিয়াই আসিয়াছি। এই ইনিও তোমাদের স্বদেশবাসী যুবা পুরুষ। আমার অত্যন্ত প্রিয়তম। তুমি যদি বল, তাহা হইলে ইনি তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।"

সেই ক্ষীণস্বরে পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কে উহারা অপর্ণা ? কি পাপ-বুদ্ধিতে উহারা এখানে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, কি কথা বলিতেছে, তাহা তুমি কেন আমাকে বলিতেছ না ? উহারা চায় কি ? উহারা কি কৃষ্ণবর্ণ ? যদি তাহা হয়, তবে আমার পক্ষে বড় কষ্ট,—বড় খেদ রহিল, এই কাল ব্যাধির উৎপাতে শয্যা হইতে উঠিয়া আমি উহাদিগকে পদাঘাতে নিম্নে নিক্ষেপ করিতে পারিলাম না।"

মহা বিষাদে অপর্ণার মন এত চঞ্চল হইয়াছিল, যে তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। একদিকে করুণাবতী অপ্সরাসুন্দরীর অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত করুণা-বাক্য,—আশা-বাক্য, আশ্বাস বাক্য,—আর সাহায্য প্রদানে অঙ্গীকার ;—অন্য দিকে স্বীয় পতির তাদৃশ সুতীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর স্বর। দুই দিকেই অপর্ণার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। স্তবকে স্তবকে যেন স্বীয় পতির বাক্য-বাণ সেই কোমল অন্তঃকরণকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল।

ভূপেশচন্দ্র আর অপ্সরাসুন্দরী তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, যাহার প্রতি এই যুবতীর অকৃত্রিম প্রণয়, যে পতির এতদূর ধৈর্য্য, এতদূর ভক্তি, সে ব্যক্তি তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। লোকটা কে ? ভূপেশচন্দ্র ক্ষণ-কাল চিন্তা করিয়া মনে মনে অবধারণ করিলেন, সেই ভগ্ন, ক্ষীণ অথচ সগর্ব্ব স্বর তাঁহার কর্ণে নিতান্ত অপরিচিত নহে।

অপর্ণাসুন্দরী যুগলহস্তে অপ্সরাসুন্দরীর হস্ত ধারণ করিয়া নীরবে এরূপ কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন যে, সেই নিস্তব্ধ ভাব যেন কত কথাই কহিতে লাগিল। তিনি এরূপ কাতরভাবে অপ্সরার মুখের দিকে চাহিলেন যে, বোধ হইল যেন সেই অপ্রত্যাশিত দয়ার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত সেই মুহূর্ত্তে তিনি একটীও শব্দ অন্বেষণ করিয়া পাইলেন না। ভূপেশকে আর অপ্সরাকে সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার ইঙ্গিত

করিয়া অপর্ণাসুন্দরী কক্ষমধ্যে তাঁহার পতির ব্যাধি-শয্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। দয়া-মোহিত দর্শকেরা বিমুক্ত দ্বারপথ হইতে সেই শয্যার কিয়দংশ দেখিতে পাইলেন।

অপর্ণাসুন্দরী,—কিম্বা আমরা এ ক্ষেত্রে বলিতে পারি,—অপর্ণাদেবী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বিনম্র মধুরস্বরে স্বামীকে কহিলেন, "দুটী আগন্তুক মিত্র,—একটী স্ত্রী, একটী পুরুষ,—দয়াবশে আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কি গৃহে আসিতে বলিব? তুমি এমন করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছ কেন? অত অধৈর্য্য হইও না।" এই শেষ কথাগুলি যাহাতে দর্শকদ্বয়ের কর্ণগোচর না হয়, এইরূপ মৃদুভাবে মুখ নত করিয়া অপর্ণাদেবী পতির কর্ণে তাহা চুপি চুপি কহিলেন; কিন্তু তাঁহার সাবধানতা বৃথা হইল। কথাগুলি দর্শকদ্বয়ের কর্ণে গেল।

উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবার শক্তি নাই, তথাপি সেই ক্ষীণ ভগ্নস্বরকে যথাসাধ্য উচ্চ করিয়া শয্যাগত রোগী কর্কশকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "মিত্র? তুমি তাহাদিগকে মিত্র বলিতেছ? মিত্র নামে সংসারে যে কোন পদার্থ আছে, বহুদিন আমি তাহা দর্শন অথবা শ্রবণ করিতে অনভ্যস্ত। যাহা-হউক, তাহাদের আসিতে বল।"

শয্যার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া পতির অনুমতিবর্ত্তিনী অপর্ণাদেবী সানন্দ হৃদয়ে ভূপেশচন্দ্র আর অপ্সরাসুন্দরীকে গৃহপ্রবেশে সঙ্কেত করিলেন। যদিও পতির কর্কশ বাক্যে সম্ভবত অনিচ্ছায় সেই অনুমতি সমাহৃত, তথাপি অপর্ণার আনন্দ হইল। প্রশস্ত সরল হৃদয়ের যথার্থই এইরূপ ক্রিয়া।

ভূপেশচন্দ্র আর অপ্সরাসুন্দরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শয্যাশায়ী রোগী কষ্টে অর্দ্ধশায়িত ভাবে উখিত হইয়া শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। মুখমণ্ডল এরূপ পাণ্ডুবর্ণ যে, মৃত্যু যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গ্রাস করিতে আসিতেছে। প্রথমে ইহার আকৃতি যদিও দুষ্টতামাখা ছিল, কিন্তু নিতান্ত নিস্তেজ ছিল না। ভূপেশচন্দ্র তাহাকে দেখিবামাত্রই চিনিলেন, সেই সেনাদলের নানা কলঙ্কাঙ্কিত, অনিবার্য্য অপরাধী কুতর্কী সৈনিক হনুমন্ত সিংহ,—ছদ্মনাম শিবদীন মিশ্র।

দেখিবামাত্র, চিনিবামাত্র, ভয় বিস্ময়ে ভূপেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ চারি পাঁচ

হস্ত পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। ওষ্ঠ হইতে এক প্রকার অস্ফুট চীৎকার শব্দ বিনির্গত হইল। তাঁহার আত্মসম্বন্ধে ভয়ের সঞ্চার হইল না, সে ক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণও বিদ্যমান ছিল না, তবে ভয় হইবার কারণ এই যে, তাঁহার নয়ন অকস্মাৎ সেই পূর্ব্বের অহঙ্কৃত, সবল, তেজস্কর হনুমন্তের মৃত্যুশয্যা দর্শন করিল।

“এ লোক এ প্রকারে চীৎকার করিয়া উঠিল কি জন্য ?”—তৎকালের সম্ভবমত ভয়ঙ্কর স্বরে হনুমন্ত সিংহ জোরে জোরে এই কথা বলিয়া স্থির দৃষ্টিতে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিল, “ওঃ! আমি চিনিয়াছি! এই সেই পাষণ্ড পলাতক ভূপেশচন্দ্র।”

ভূপেশ যখন হঠাৎ চীৎকার করিয়া পশ্চাতে হটিয়া আসেন, কারণ বুঝিতে না পারিয়া অপসরাসুন্দরী আর অপর্ণাসুন্দরী এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। যখন হনুমন্তের মুখে ঐ শেষ কথা উচ্চারিত হইল, অপ্সরা তখন যেন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পড়িতেছিলেন, ভূপেশচন্দ্র ধারণ করিলেন।

পতিকে সম্বোধন করিয়া অপর্ণাসুন্দরী কহিলেন, “কেন রাগ কর ? শান্ত হও। যাহাকে তুমি ভূপেশচন্দ্র বলিয়া জানিতেছ, পূর্ব্বে তিনি যাহাই করুন, তাহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি ? আজ ইনি শুভ উদ্দেশে করুণা-বশবর্ত্তী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।”

“তুই দূর হইয়া যা ! আমি মরিতে বসিয়াছি, তাহার উপর কেন আর দগ্ধ করিস্ ? ঐ পামর কেন এখানে থাকিবে ? এত যে উঠিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি আমি উঠিয়া লাথি মারিয়া উহাকে নীচে ফেলিয়া দিব। ঐ পাপাত্মা আমার সহিত বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছে ; ছলনা কিছুই বুঝা যাইতেছে না।” কথা বলিতে বলিতে সেই মুমূর্ষু রোগী সত্য সত্যই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। বন্য পশুবৎ ব্যবহারে অপর্ণাকে এক প্রকার তাড়াইয়া দিল। ভূপেশকে ধরিতে ছুটিল। কিন্তু তাহা কি পারে ? সাংঘাতিক ব্যাধি ক্ষণমাত্রেই তাহাকে যেন শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া শয্যার উপর পাড়িয়া ফেলিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে অনেকক্ষণ হনুমন্ত সিংহ সজীবের মত নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না।

কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "হনুমন্ত সিংহ! একটু স্থির হও। মিনতি করিয়া বলিতেছি, স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, যথার্থই উপকারের বাসনায় আমরা এখানে আসিয়াছি। জানিতাম না, তুমি এখানে। যাহারা সংবাদ দিয়াছিল, তাহারা তোমার সত্য নাম জানে না। তথাচ আমরা তোমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি। তুমি যে হনুমন্ত সিংহ,—তুমি যে শিবদীন নামে এখানে বিপদগ্রস্ত হইয়া আছ, এ তত্ত্ব জানিবার জন্য আমি অতি অল্পই আশা করিয়াছিলাম। তুমি যে আমার জানা, আমি যে তোমার চেনা, স্বপ্নদেবীও এ কথা আমারে বলিয়া দেন নাই।"

"আবার যদি তুই আমার সঙ্গে কথা কহিস্, তোর সঙ্গে আমার জানা-শুনা ছিল, আবার যদি সেই কথা উচ্চারণ করিস্, এই শরীরে তোরে খুন করিয়া আমি ফাঁসি যাইব। দূর হ! এখনও বলিতেছি,—এখান হইতে দূর হইয়া যা! আজ যদি আমি সেই পদে থাকিতাম, বিনা বাক্যব্যয়ে তোকে আমি ফৌজদারীতে সমর্পণ করিয়া দিতাম।"

কাঁদিতে কাঁদিতে অপর্ণা সতী হনুমন্তের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সকাতরে কহিতে লাগিলেন, "বার বার কেন তুমি অমন্ করিতেছ?" নৈরাশ্য যন্ত্রণার হস্তে হস্ত পেষণ করিয়া পুনঃপুন অপর্ণা কহিতে লাগিলেন, "তোমাকে দেখিয়া আর তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে। একটু স্থির হইয়া কথা কও। তুমি অমন করিলে আমিও হয় ত বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারিব না।" হনুমন্তকে এই কথা বলিয়া ভূপেশের দিকে ফিরিয়া অপর্ণা কহিলেন, "পরমেশ্বরের শপথ, উঁহার কথায় কাণ দিও না। আর তুমি ভগিনি! তুমি দয়াবতী ভগ্নি!——————" অপ্সরার হস্ত ধারণ করিয়া কৃতজ্ঞস্বরে অপর্ণা কহিলেন, "তুমি দয়াবতী ভগ্নি! ইহাঁর কথায় রাগ করিও না। পীড়ায় ইহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। ইহাঁর কথা শুনিয়া বিষাক্ত বাষ্পে যেন আমার কণ্ঠরোধ হইতেছে। আমি যেমন সহ্য করিতে জানি, তুমি দয়াময়ী, তাহা অপেক্ষা অধিক জান, আমার মনে হয়!"

ব্যাধিশয্যাসমীপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন,

"হনুমন্ত সিংহ! আমার কথায় বিশ্বাস কর। নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমাদের উপকারের নিমিত্ত আমি যথাসাধ্য দান করিতে পারিব। আর সেই উপকারের চেষ্টা করিবার জন্যই আমার আসা। যত কেন তুমি আমাকে ঘৃণা কর না, সমাজের অনুরাগবন্ধন কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা আমি জানি।"

"জানিস্ তুই? সে জানা তোরই কাছে থাক্। এখানে তুই এখনও দাঁড়াইয়া আছিস্ কি জন্য? যদি মরি, তথাপি আমি তোর সাহায্য চাহি না। যেমন কষ্টে আছি, এমনি কষ্টে থাকিয়া জীবন পরিত্যাগ করিব, তথাপি তুই পাপিষ্ঠ পলাতক, তোর দত্ত ঘৃণিত অর্থে প্রাণ ধারণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। কি বল অপর্ণা? কি বল তুমি?—যদি অনাহারে মরিতে হয়, তাহাও স্বীকার; তথাপি এতাদৃশ লোকের হস্ত হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না। এখন আর কি তোদের বলিবার আছে? দূর হইয়া যা! এখনও দূর হইতেছিস্ না কি জন্য? অপর্ণা! অবিলম্বে ইহাদের উভয়কে গৃহ হইতে বাহির কর। শুনিতেছ আমার কথা? শীঘ্র বাহির কর। যদি অবাধ্য হইতে শিখিয়া থাক, তথাপি আদেশ করিতেছি, ইহাদের বাহির করিয়া দাও।" নিতান্ত ক্ষীণাবস্থায় জোরে জোরে কথা কহিতে কহিতে হনুমন্ত সিংহ অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

চীৎকারস্বরে রোদন করিয়া বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক অপর্ণা কহিলেন, "হায়! হায়! কি হইল! দেখিতে দেখিতে মরিয়া গেল! এ অকস্মাৎ মৃত্যুর জন্য আমিই অপরাধিনী হইলাম।" শয্যাতলে জানু পাতিয়া উভয় হস্তে উভয় চক্ষু আবরণ করিয়া মহাশোকে অপর্ণাসুন্দরী ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

"না, না, মৃত্যু হয় নাই। উতলা হইও না, কাতরা হইও না। ক্ষীণাবস্থায় অনেক কথা কহিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছেন। দেখ তুমি, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি উঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেছি।" এতদ্রূপ প্রবোধ বাক্যে অপর্ণাকে আশ্বাস দান করিয়া চৈতন্যশূন্য রোগীর মুখে, চক্ষে, বক্ষে বারি সিঞ্চন করিলেন। একটু পরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হনুমন্তের

চৈতন্যের সঞ্চার হইল। নাগপাশ বন্ধনের পর গরুড়ের প্রসাদে রাম-লক্ষ্মণের যেমন অল্পে অল্পে নয়নের উন্মেষ হইয়াছিল, সেইরূপ উন্মেষ প্রাপ্ত হইয়া হনুমন্ত সিংহ মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া দেখিল।

দেবোপম রামলক্ষ্মণের সঙ্গে আমরা এই দুরাচারের উপমা দিলাম না। কিন্তু অচৈতন্যের পর চৈতন্য যেমন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করে, সেই তুলনার সঙ্গে এই তুলনা। অপ্সরাসুন্দরী একাকিনী করুণার উপদেশে এক জন অপরিচিত পিশাচের যেরূপ সুশ্রূষা করিলেন, অপর্ণাদেবী সেরূপ করিতে পারিলেন না। শুদ্ধ কারণ, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, সত্য কিম্বা মিথ্যা পরিচয়ে যে লোককে তিনি দেবতার মত ভালবাসেন, দেবতার মত ভক্তি করেন, সে লোক মরিয়া গিয়াছে। অন্ধ প্রণয়ের উপদেশে এ যে শোক, তাহার ক্ষতি পূরণ যে কোথায় আছে, বিশ্ববিধাতা ভিন্ন বিশ্বজীব মাত্রে কেহই তাহা জানে না।

অপর্ণা যখন দেখিলেন, অল্পে অল্পে হনুমন্ত সিংহের চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে, তখন তাঁহার প্রণয়বিদগ্ধ হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশ্বাসের সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন, "অপসরা! স্নেহময়ী ভগিনি! তুমি মৃতদেহে জীব সঞ্চার করিলে, আমিও যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম।"

অবলা অন্তরের কৃত্রিম কিম্বা অকৃত্রিম স্নেহ একটী সাগর সদৃশ। সে সাগরে হাঙ্গর, মকর, কুম্ভীর ভাসে। সে সাগরে ঢেউ হয়। নাম করা যায় স্নেহ-সাগর। স্নেহসাগরে পবনের খেলা বড় চমৎকার! পাঠক মহাশয় কি ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন? প্রণয়সাগরে যখন স্নেহঢেউ খেলিয়া বেড়ায়, তখন ছোট ছোট তরণীরা শীঘ্র শীঘ্র কূল পায় না। বড় বড় ডুবুরীরা শীঘ্র শীঘ্র থাই পায় না। আমাদের নায়ক নায়িকা সাগরে ডুবিয়াছেন। থাই নাই, কূল কিনারা নাই, কিন্তু তাঁহারা জীবনের মায়ায় কাতর হইতেছেন না; পরের উপকার করিবার তরে সাগরতলে, সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছেন না। অঞ্জনারঞ্জন পবনদেব সতীত্ব *পর্ব্বতকে মৈনাক পর্ব্বতের মত সাগরতলে ডুবাইতে পারিতেছেন না। হনুমন্ত সিংহের চৈতন্য হইয়াছে। সেখানে তাঁহার বন্ধু কে ছিল? অপর্ণা? উত্তর করিতে হাসি আইসে। অপর্ণা তাঁহাকে মিত্রভাবে বরণ করিয়াও

ভূপেশ আর অপ্সরাব প্রতি অধিকতর মিত্রভাব প্রদর্শন করিতেছেন। পাপীদের অন্তঃকরণ কি যে বিষানলে দগ্ধ হয়, মৃত্যুকালেও চিতানলের পূর্ব্বে কি যে বিষানল তাহাদিগকে দগ্ধ করে, সকলে তাহা অনুধাবন করিতে পারে না। পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, রামায়ণের কথা। মহারাজ লঙ্কেশ্বর যে দিন শ্রীরামের কাটামুণ্ড আর বিশ্ব-বিজয়ী কোদণ্ড রাক্ষসী-মায়া-প্রভাবে অশোক কাননে সীতাদেবীরে প্রদর্শন করেন, লঙ্কাব অশোকবনে সে দিন কি ভয়ঙ্কব শোকাবহ কাণ্ডই ঘটিয়াছিল! যদি সরমা সতী সেই সময়ে সেই স্থলে না আসিতেন, তাহা হইলে জানকীর জীবনরক্ষা হইত কি না সন্দেহ! এখানেও ঠিক সেই অবস্থা। হনুমন্ত সিংহ মরিয়াছেন, অপর্ণা তাহা স্থির করিয়াছিলেন, সরমারূপিণী অপ্সরা সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, মৃত্যু নহে, মূর্চ্ছা! সত্য, সত্য, তাহাই সত্য। আমাদের আখ্যায়িকার প্রধান নায়ক ভূপেশচন্দ্র রোষে, বিমর্ষে, কখন কখনও হর্ষে দূরে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাঁহার রসনা যেন তাড়িতবেগে পুনঃপুন সঞ্চালিত হইয়াও কেবলমাত্র ক্ষণপ্রভার মত দীপ্তি বিকাশ করিল, শব্দ উচ্চারিত হইল না।

হনুমন্ত বাচিয়া আছে। অপর্ণাসুন্দরী আশ্বাস পাইয়াছেন, কিন্তু প্রবেশকারীরা শত্রু কি মিত্র, সে তখনও তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যম যাহারে আকর্ষণ করেন, মানুষবিশেষে,— —মানুষ কি অমানুষ, আমরা জানি না,— —যম যাহারে আকর্ষণ করেন, হয় ত তাহার ভয় হয়, কি শান্তি আছে। কেন? বলিতে পারি না। আমার বুদ্ধি সংসারের বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। পাঠক মহাশয়! আপনি যাহাকে ভয় করেন, আমি তাহাকে ভয় করি না। মৃত্যুর নাম শুনিলে হয় ত আপনার চক্ষে জল আসে, আমার মুখে হাসি আসে।

ভব ধামে যম নামে ভয় করে যারা।
ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ্যে মিথ্যাবাদী তারা॥
ভবজীবে শান্তি দাও শান্তি-নিকেতন।
নতশিরে করি আমি মরণ শরণ॥

হনুমন্তের কর্ণে কোন কথা প্রবেশ করিল না। তাহার স্তিমিত চৈতন্য কোন কথা তাহারে বুঝাইয়া দিল না। হেমন্তে বসন্ত যেমন, মেঘান্তে চন্দ্র যেমন, অচেতনান্তে চৈতন্য সেইরূপ মূর্ত্তিমান হইয়া হনুমন্তের মুখে বলাইয়া দিলেন, "কোথায় আমি?" এই কথার পর,—এই ক্ষুদ্র কথার পর, মুমূর্ষু হনুমন্ত নানা প্রকার প্রলাপ উচ্চারণ করিল, ভূপেশের দণ্ডের উল্লেখ করিয়া আরও অনেক কথা বাড়াইয়া বলিল। কিন্তু মূর্চ্ছাপন্নের মূর্চ্ছাপনয়নের জ্ঞান কতক্ষণ সমান থাকে? হনুমন্ত সব কথার সমন্বয় রাখিতে পারিল না। জাগিয়া জাগিয়া মানুষে যেমন মনের কথা স্বপ্ন দেখে, হনুমন্ত সেইরূপ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

প্লেটো একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, পৃথিবী আকাশে যায়, আকাশ পৃথিবীতে আসে। কখন না কখনও সেই স্বপ্ন একদিন সত্য হইতে পারে, কিন্তু পাপিষ্ঠ হনুমন্ত যেরূপ সে প্রলাপ স্বপ্ন দেখিতে পাবে না। জ্ঞানীর কল্পনার সঙ্গে দস্যুকল্পনা সহবাস করে না। হনুমন্তের কল্পনা লোকের সর্ব্বনাশের জন্য, আর সেই গ্রীসীয় পণ্ডিতের কল্পনা লোকের হিতের জন্য। আমরা এখন বিষম বিপাকে পড়িলাম। গ্রীক পণ্ডিতের কল্পনার আদর করিতে হইবে, অসংশয়ে। কিন্তু হনুমন্তের কল্পনার আদর করিতে হইবে একজন সাধু পুরুষের জীবনের সংশয় ভয়ে। হইতে পারে হউক, আমরা ধর্ম্মের অনাদর করিব না। হনুমন্ত নিজে ধর্ম্মের অনাদর করিয়া মুমূর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাপ্ত না হইলে ভাল হইত। পাপী লোক যতদিন সংসারে বাঁচিয়া থাকে, ততই ভাল। লোকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া প্রায়শ্চিত্ত শিক্ষা করে, যদি শিক্ষা করিতে না পারে, সাবধান হয়। পাপী লোকের আশুমৃত্যু আমরা ভালবাসি না। তুমি আমি হয় ত দেখি, একজন পরাস্বহারক দস্যু, পরস্ত্রীর সতীত্বহারক লম্পট, পরজীবনহন্তা দুরন্ত হত্যাকারী তোমার আমার চক্ষে লুকাইয়া লুকাইয়া পার পাইয়া যাইতেছে, আর একজন ধর্ম্মশীল সাধু এই পাপময় সংসারের কলুষবন্ধনে বিজড়িত হইয়া কুচক্রীর চক্রে চক্রে রাধাচক্রের মত দুঃখচক্রে ঘুরিতেছেন, আমার তাহাতে কি? তোমার তাহাতে কি? যিনি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারই বা তাহাতে কি?

তাঁহার মহিমা ভবে বুঝিব কি তুমি আমি ?
তাঁরি পদে পাপপুণ্য, তিনিই জগতস্বামী ॥
অধর্ম্ম কাহারে বলে, ধর্ম্ম কারে বলে।
লেখা আছে অভিধানে ভব বাক্যছলে ॥
হৃদি-পদ্মে হৃষীকেশ ! কর অধিষ্ঠান।
তোমারে স্মরণ করি তৃপ্ত করি প্রাণ ॥
কোথা থাক, কোথা যাও, জগত জীবন !
ঘুরে ঘুরে তত্ত্ব করে নাহি পায় মন ॥
অনন্ত করুণাসিন্ধু তুমি দয়াময়।
অনন্ত অভয় পদে লয়েছি আশ্রয় ॥
কত রূপে কত লোক ভাবিছে তোমারে।
এক রূপ বিশ্বরূপ ! বিতর আমারে ॥
কে জানে তোমার রূপ রূপের নিধান।
আমারে করুণা কর করুণা-নিধান !
দুখী সুখী যত জীব বিচরে সংসারে।
নামে নামে জলে স্থলে পূজিছে তোমারে ॥
তুমি জগতের জীব তুমি সদাশিব।
চরণ আশ্রয় করি জীয়ে সর্ব্ব জীব ॥

এ কি কথা দয়াময় ? নিরাকারবাদীরা তোমায় নিরাকার বলিয়া পূজা করে, কিন্তু নিরাকারের কি চরণ আছে ? তবে তুমি বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি করিলে কিরূপে ? তবে তুমি বিশ্ব সংসারে বিচরণ কর কিরূপে ? এ তর্কে আমাদের সাঙ্খ্যদর্শন পরাভব মানে। আর্য্যাবর্ত্তের দর্শন-শাস্ত্রে তুমি সজীব। কিন্তু দয়াময় ! মহম্মদকে ছোট করিয়া, চৈতন্যদেবকে বৈরাগী করিয়া, যিশু খ্রীষ্টকে আমরা একটু মান্য করি। তুমি বিশ্বময় ! ভারতভূমির

আদি দেবতা। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ভারতবর্ষ বলিয়া জানিতেন। সত্যমিথ্যা তুমি জান, আমরা জানি না। আমাদের শাস্ত্রের এক স্থানে লেখা আছে,—অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা, বিশ্বক্রান্তা বসুন্ধরা। যেটী অশ্বক্রান্তা, সেইটীর ইংরাজী নাম এসিয়া। তুমি যিশু ঠাকুর! এসিয়ার দেবতা। যদি এসিয়ার দেবতা হও, তবে অন্য রাজ্যে গমন করিয়াছিলে কেন? রথক্রান্তা আমেরিকা। ইংরাজ রাজ্যের একজন কলম্বস্ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু এসিয়ার ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশু! তুমি অবশ্যই জানিতে, নূতন জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। তুমি যদি দেবতা হও, আমাদের জগতেরই দেবতা। আমাদের আর্য্যবর্ষ সমস্ত বর্ষ অপেক্ষা প্রবীণ। তবে তুমি কাহাদের ত্রাণকর্ত্তারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে? ক্ষুদ্র রাজ্যবাসীরা তোমাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া কিরূপে অবধারণ করিয়াছিল?

কাহার কথা বলিতে আমরা কাহার কথা বলিতেছি? হনুমন্ত সিংহ! তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। ভাল বুদ্ধিতে ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার আমার পরিত্রাণকর্ত্তা কে? প্রথম, এক অচিন্ত্য অব্যক্ত পরমেশ্বর। দ্বিতীয় হয় ত বৃন্দাবনের কৃষ্ণচন্দ্র। তৃতীয় হয় ত, প্রভু যিশুখ্রীষ্ট। চতুর্থ হয় ত নবদ্বীপের চৈতন্যদেব। দশাবতারের কথা আমরা কহিব না। ঐ পঞ্চদেবের মধ্যে কাহারে তুমি মুক্তিদাতা বলিয়া ভক্তি কর, আমারে কি তাহা বুঝাইয়া দিতে পার? অস্থির! অস্থির!! অস্থির!!!

মহাদেব! যে মানুষ মরে, তাহার কর্ণে কি মন্ত্র দিতে হয়? হনুমন্ত মরিতেছে, তাহার কর্ণে কি মন্ত্র দিতে হইবে? মহাদেব! তোমারে প্রণাম করি। অবতার যদি সত্য হয়, সমস্ত অবতারকে প্রণাম করি। কিন্তু—

তুমি সত্য, তুমি সত্য, নিত্য নিরঞ্জন।
তুমি সত্য জগতের বিপত্ত-ভঞ্জন॥
আরো কারে মানি যদি করি নমস্কার।
একান্ত শ্রীকান্ত আমি আশ্রিত তোমার॥

শুনেছি অনেক নাম ইহ মায়াধামে ।
বিকাইয়ে আছি প্রভু ! তব নিত্য-নামে ॥
সে নাম পাশরি যদি টলে মম মন ।
শাস্ত্রমতে সত্য হবে নিরয়-গমন ॥
কে তুমি ? কোথায় থাক দেখিতে না পাই ।
হৃদয়-দর্পণে তবু নিহারি সদাই ॥
রূপ নাই, হেরি আমি কি নির্ম্মল রূপ ।
জগতের অপরূপ তুমি বিশ্বরূপ ॥
যত রূপ শুনি আর মনে ধ্যান করি ।
সব রূপে ভবধব ! তোমারেই স্মরি ॥
কি যে অপরূপ রূপ অনন্ত বিকাশ ।
কি মহিমা ভবেশ্বর ! বিশ্বেতে প্রকাশ ॥
কে জানে, আমি কি জানি, মহিমা তোমার ।
অনন্ত অব্যয় রূপ জগতে প্রচার ॥
রূপ কি তোমার আছে ? অরূপ-স্বরূপ !
মনে মনে ভাবি আমি ওই বিশ্বরূপ ॥

স্তুতি সমাপ্ত হইল। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের অনন্ত স্তুতির সমাপ্তি নাই, অতি সংক্ষেপে সেই স্তুতি সমাপ্ত হইল। তাহা শ্রবণ করিয়াও সেই মমূর্ষ পাপাত্মার পাপহৃদয় একটুও টলিল না। কিছুমাত্র বিগলিত হইল না। কর্কশস্বরে অপর্ণাকে কহিল, “তাড়াইয়া দাও! বিলম্ব করিলে এখনি আমি উঠিয়া গলা টিপিয়া, লাথি মারিয়া নয়নের পাপকে বিদায় করিব। ঐ নরাধম আমার চাকর ছিল। আমি উহার প্রভু ছিলাম। এখনও আমি প্রভু। উহার সাহায্যে যদি জীবন ধারণ করিতে হয়, সে জীবন রাখিব না। উহার বিনাসাহায্যে

যদি অনাহারে,—উপবাসে জীবন যায়, তাহাও এখন আমার পক্ষে মঙ্গল।”

“কেন বল দেখি তুমি বারবার অমন নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারণ করিতেছ?” কাঁদিতে কাঁদিতে অপর্ণা কহিলেন, “কেন বল দেখি তুমি বারবার অমন নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারণ করিতেছ?”

“নিষ্ঠুর বাক্য? সিদ্দেশ্বর! কোথায় তুমি? স্বর্ণভূষণ! কোথায় তুমি? আনোয়ার বখত! কোথায় তুমি? কোড়াবরদার ডাক। বাদ্যকর ডাক। নূতন কোড়া ধারণ করিতে বল। নূতন করিয়া অপরাধীর গাত্রে শত শত বেত্রাঘাত কর।”

এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে শয্যাশায়ী পাপী হাঁফাইয়া উঠিল। অপ্সরাসুন্দরী ভয় পাইয়া অপর্ণাসুন্দরীকে কহিলেন, “এ কি হইতেছে? ইহাঁকে আর বিনা-চিকিৎসায় রাখা উচিত হইতেছে না।” ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, “আমি একজন হাকিম ডাকিয়া আনিতেছি।”

অশ্রুবর্ষণ করিয়া অপর্ণা কহিলেন, “ইনি চিকিৎসার নামে, হাকিমের নামে বড়ই বিরক্ত। আর, তা ছাড়া——”

অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, “অগ্রেই তাহা আমি বুঝিয়াছি। অর্থাভাব! এখানে যাহাই ঘটুক্, ইনি যতই কটুবাক্য বলুন, আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য যতই ব্যস্ত হউন, আমরা শেষকাল পর্য্যন্ত সত্য সত্যই মিত্রবৎ আচরণ করিব।”

কথার অবসরে ভূপেশচন্দ্র তথা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, বলিয়া গেলেন না। রোগীর অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতে লাগিল। অপ্সরার মুখের কাছে মুখ আনিয়া অপর্ণা কহিলেন, “ভগ্নি! তোমার কি বিবেচনা হয়?”

“আমার বিবেচনায় এক্ষণেই একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন। আমি নিজেই সেই কার্য্য সাধন করিব। তুমি এস্থান হইতে সরিও না।”

উত্তর শুনিবার প্রতীক্ষা না করিয়াই অপ্সরাসুন্দরী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে অন্য কক্ষে দেখিলেন, গৃহকর্ত্রীর নিকটে বসিয়া ভূপেশচন্দ্র সমস্ত ভাড়া পরিশোধ করিয়া দিতেছেন। ত্রস্তপদে সমীপবর্ত্তিনী

হইয়া অপ্সরা কহিলেন, “ভূপেশ! প্রাণ আমার তোমাকে দেবতার মত ভক্তি করে। এখন আমি সত্য জানিলাম, তুমি স্বর্গের দেবতা, নররূপে পৃথিবীতে আসিয়াছ। এখন এসো। মনে যদি কিছু শক্রভাব থাকে, ভুলিয়া যাও। শক্র মহা সঙ্কটাপন্ন। বোধ হয় তাহার জীবনের আর আশা নাই। চিকিৎসকের নিতান্ত আবশ্যক। এসো আমরা উভয়েই চিকিৎসকের অন্বেষণে যাই।”

হিসাবপত্র শোধ করিয়া দিয়া ভূপেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, “চল। স্বর্গসুন্দরি! জানিলাম, তোমার হৃদয়ে স্বর্গের দয়া আছে। আমার মনে শক্রভাব শঙ্কা করিতেছিলে, আর কেহ এরূপ শঙ্কা করিলে আমি কি করিতাম জানি না, কিন্তু তোমার মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। চল। এই দণ্ডেই চিকিৎসক আনিতে হইবে। লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিয়াছি, অবস্থা ভাল নয়। চল।”

উভয়ে পথে বাহির হইলেন। অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। সকাতরে ভূপেশের মুখপানে চাহিয়া অপ্সরা কহিলেন, “শিবদীন ত বাঁচিবে না, নিশ্চয়; কিন্তু ঐ সবলা অবলার দশা কি হইবে? কোথায় থাকিবে? কোথায় আশ্রয় পাইবে?”

“কেন ভাবিতেছ? আমাদের কাছে আশ্রয় পাইবে, আমরা আশ্রয় দিব। দুটীতে আছি, তিনটী হইব। যিনি জগৎকে আহার দেন, তিনিই আহার দিবেন। কেন ভাবিতেছ?”

কি যেন মনে আসিল; জলশূন্য চক্ষে কুরঙ্গনয়না অপ্সরাসুন্দরী গ্রীবা উন্নত করিয়া একটু থামিয়া থামিয়া কহিলেন, “ভূপেশ! লজ্জা স্ত্রীজাতির ভূষণ। সেই লজ্জাকে দূরে রাখিয়া আজ এই অন্ধকার রাত্রে,—যদি কেহ দেখে দেখুক,—যদি কেহ শোনে, শুনুক্,—লজ্জাকে দূরে রাখিয়া আজ আমি এই অন্ধকারে,—তোমারে বলি,—অপরাধ ক্ষমা করিও, লজ্জাহীনা বলিয়া তিরস্কার করিও না; আমি ইচ্ছাকে আদর করি। সেই আদরিণী ইচ্ছার উপদেশে লজ্জাকে দূরে রাখিয়া, আজ আমি তোমারে বলি,—বলি বলি করিয়া বলিতে পারিতেছি না। ভূপেশ! তুমি ত সর্ব্বশাস্ত্র জান, বল দেখি, লজ্জারও কি লজ্জা আছে? থাকে, থাক্, আজ আমি তাহা মানিব

না।—শত্রুর প্রতি তোমার যেরূপ দয়া, অনাথার প্রতি তোমার যেরূপ মমতা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে তোমার যেরূপ বাসনা, তাহা স্মরণ করিলে নারীজাতির লজ্জা হয় ত আপনা হইতেই পলাইয়া যায়। পলাইতে বলি না, ইচ্ছায় তাহারে একটু অন্তরে রাখিয়া বলি, যদি আমাদের বিবাহ হইত, আমি তোমারে আলিঙ্গন করিতাম, আমি তোমারে চুম্বন করিতাম!"

কাছাকাছি ছিলেন, ভূপেশচন্দ্র তিন হস্ত তফাতে সরিয়া গেলেন। কহিলেন, "অপ্সরা! চিকিৎসকের গৃহ এখান হইতে কত দূর, তাহা বলিয়া দেয়, পথে এমন একটীও লোক ত দেখিতে পাইতেছি না।"

"এ অপ্রশস্ত অন্ধকার পথ। লোকালয় নাই। দোকান পসার নাই। আর একটু অগ্রসর হইলে বোধ হয়, লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব।"

"তবে এসো।"

প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া পরোপকারী নায়ক নায়িকা একজন পথিককে দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এ পল্লীতে চিকিৎসক কোথায় থাকেন, বলিয়া দিতে পারেন?"

"আমিই ত একজন চিকিৎসক। কোথায়, কাহার বাটীতে যাইতে হইবে, পথ দেখাইয়া লইয়া চল।"

"আমাদের সঙ্গে আসুন।"

"বাত্রে আমার দর্শনীর পরিমাণ কত, তা ত তোমরা জান না?"

"জানিবার আবশ্যক নাই। রোগীকে যদি বাঁচাইতে পারেন, আমরা তাহার উপযুক্ত পুরস্কার জানি।"

পথিক চিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া আমাদের নায়ক নায়িকা ব্যাধিগৃহে প্রবেশ করিলেন। দস্তরমত নাড়ী পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক মহাশয় মুখ বাঁকাইয়া, মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আশা অতি কম! কিন্তু এক মাস যদি আমার ঔষুধী শেবনে তিকিচ্চে হয়, তা হলে শরীলের গ্লানি মুশ্চিত হইতে পারে। আমি মকক্ষু লোক নই, তিকিচ্চে শাস্তর আমার পড়া আছে।"

"অজ্ঞানে তিমীরে ঘোরে ঔষুধী মিশ্ছতি যে নরাঃ।
তে নরা তিকিচ্চে শাস্ত্রেতু শতং জীবতু জীবতি॥"

"আরও বচন আছে।"

পির্ত্ত শ্লেশা কফো শ্লেশা রামরাবণ সম্ভাবা।
আমি এক চিকিৎসকো নাস্তি নাস্তি ধরাতলে॥"

ভূপেশচন্দ্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর একজন সুনামলব্ধ হকিমকে প্রাপ্ত হইয়া শিবদীনের মৃত্যুশয্যা সমীপে উপস্থিত হইলেন।

রহস্যের অবসর থাকিলে, রোগ সঙ্কট না হইলে আমাদের ধৈর্য্যশীল জ্ঞানবান নায়ক হয় ত সেই বিদূষককে আরও কিয়ৎ ক্ষণ সেই স্থলে রাখিয়া তামাসা দেখিতেন। কিন্তু সময় ছিল না। একটা রজতমুদ্রা তাহার হস্তে প্রদান করিয়া, "তিকিচ্ছা ব্যবসায়ী" পণ্ডিতকে বিদায় করিয়া দিলেন।

রোগীর সংজ্ঞা নাই। জিহ্বা যেন ক্ষণে ক্ষণে ভিতর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তথাপি দুষ্ট লোকের রসনা অন্তকালেও ভাল কথা কহিতে জানে না। সে রসনা বলিতেছে, "শত শত বেত্রাঘাত। দূর কর, দূর কর। অপর্ণা! অপর্ণা! প্রহার করিব। দূর কর।"

প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে, জানি না, বর্ণ কি বাক্য, তবুও প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঈর্ষা, রোষ, কলুষ, আর নির্য্যাতন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নূতন হকিম অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীর নাড়ী আর লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন, মুখ শুকাইয়া গেল।

লক্ষণ বুঝিয়া অপ্সরাসুন্দরী সকাতর সস্নেহ ভাবে অপর্ণাকে কহিলেন, "ভগ্নি! আর এক ঘরে চল।" কেন অপ্সরা এ কথা কহিলেন, বিজ্ঞ পাঠক তাহা বুঝিবেন। যে যাহাকে অন্তরে অন্তরে ভালবাসে, যাহার ভালবাসায় কপটতা নাই, ছলনা নাই, চাতুরী নাই, তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিতে যে কত দুঃসহ যন্ত্রণা, সে জানে সেই জানে। কিন্তু অপর্ণা রাজী

হইলেন না। সেই মৃত্যুগৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতে কিছুতেই তাঁহার মতি হইল না। গ্রীবা নত করিয়া অপ্সরাকে কহিলেন, "চিকিৎসক কি বলিতেছে?"

"চিকিৎসক বলিতেছে, চিকিৎসা হয় নাই। এখনও যদি——"

"এখনও যদি! তবে ত জীবনের আশা নাই!"

"চিকিৎসক তাহা ত বলিতেছেন না।"

সকলেই রোগীর মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। ঘন ঘন রোগীর নিশ্বাস পড়িতেছে। একবার নিশ্বাস পড়িল না। অপর্ণা যেন উন্মাদিনী হইয়া বুকের উপর পড়িয়া অশ্রুপ্রবাহে শ্বশুর বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া সন্ন্যাসিনীর মত পৃথিবী ত্যাগের সঙ্কল্পে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি তোমার নিশ্বাস পড়িবে না? আর কি আমি তোমার নিশ্বাসের শব্দ শুনিব না? যে কেন তুমি হও না, আমি তোমারে প্রাণ দান করিয়াছি; প্রাণের অধিকারি! আমারে পরিত্যাগ করিয়া গেলে?"

তখনও জীবন যায় নাই। অপর্ণাসুন্দরী মিথ্যা ভয় পাইয়াছিলেন। মূর্চ্ছা আসিয়াছিল, চিকিৎসক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মূর্চ্ছা সরিয়া গিয়াছে, একটু একটু জ্ঞান হইয়াছে, সেই জ্ঞানের অনুমতি অনুসারে হনুমন্ত সিংহ, ওরফে শিবদীন মিশ্র, অতি মৃদু ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "একটু জল!" অপর্ণাদেবী তৎক্ষণাৎ জল প্রদান করিলেন। সে জল গলতলে প্রবেশ করিল না। মৃত্যুকালে যে শ্বাস হয়, সে শ্বাসকে আমরা ভাল বলি। কেন বলি? তেমন শ্বাস জন্মাবধি জীবনকাল পর্য্যন্ত আর কেহ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু কেন যে অন্তকালে সেই শ্বাস তত প্রবল হয়, জগজ্জীবের নিশ্বাসদাতা ভিন্ন সেই শেষ শ্বাসের যথার্থ মর্ম্ম আর কেহ জানেন না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্বাস আসে। সূতিকাগৃহে যে শিশুর ক্রন্দনস্ফূর্ত্তি হয় না, তাহারও নিশ্বাস থাকে। নিশ্বাস ফুরাইবার নাম মৃত্যু। হনুমন্ত সিংহ উপর দিকে নিশ্বাস টানিতেছেন, নীচের দিকে তাঁহার শ্বাস পড়িতেছে না। ভূপেশচন্দ্রের কাণে কাণে চিকিৎসক কহিলেন, "আর আশা নাই। যতদূর প্রবল লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ

করি, আজিকার রজনী প্রভাত হইবে না। রজনী প্রভাত হইবে, কিন্তু ইহার চক্ষু সে প্রভাত দেখিবে না।"

দন্ত বিকাশ করিয়া পরিতাপী রোগী অনেকক্ষণ পরে এক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। নাভিস্থল হইতে বক্ষঃস্থল, বক্ষঃস্থল হইতে কণ্ঠস্থল, ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল। আর এক নিশ্বাস।

অপ্সরাসুন্দরী শুনিলেন,—চিকিৎসক একবার কহিয়াছিলেন, পুনর্বার কহিলেন, "অপর্ণা! একটী বিশেষ কথা আছে, এসো, আমরা অন্য ঘরে যাই।"

"না। মস্তকে বজ্রাঘাত হইলেও, এই অনন্ত জগৎ রসাতলে যাইবার উপক্রম হইলেও, এই ব্যাধিগ্রস্তের নিকট হইতে দুই হস্ত অন্তরে আমি যাইব না। চিকিৎসক কি বলিলেন?"

অপ্সরা উত্তর দিলেন না। চিকিৎসক চলিয়া গেলেন। হস্তে নেত্র আচ্ছাদন করিয়া ভূপেশচন্দ্র বাহিরে গেলেন। অপ্সরাসুন্দরী নির্ব্বাক্।

"বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, বুঝিয়াছি। সংসারে আমি আর তবে কোথায় দাঁড়াইব?" উন্মাদিনীর ন্যায় এই কথা বলিয়া অপর্ণাদেবী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চক্ষে জল নাই। অপ্সরাসুন্দরী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নেত্রনীর পরিমার্জ্জন-পূর্ব্বক করুণস্বরে কহিলেন, "চিন্তা কি ভগিনি! পরমেশ্বর না করুন, তোমার পতির জীবনের কোন অমঙ্গল না ঘটুক, তুমি নিরাশ্রয় হইবে কেন? আমাদের গৃহ তোমারই গৃহ। আমার পক্ষে জগৎ যেমন, তোমার পক্ষেও তাই। আমি তোমাকে আশ্রয় দিব।"

"দিবে? দিবে? করুণাময়ি! তুমি আমাকে আশ্রয় দিবে? ওঃ! এই প্রফুল্ল জগৎ আজ কেন আমার চক্ষে অন্ধকার দেখাইতেছে? ঐ সব বিকট মূর্ত্তি কেন আজ আমার চক্ষের নিকটে নৃত্য করিতেছে? নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য একত্রে উদয় হইয়া কেন অকস্মাৎ আজ অন্ধকারে কালীবর্ণ হইয়া গেল? তবে কি আমার জীবিতেশ্বরের জীবন রক্ষা হইল না? দয়াময়ি! একটু থাক, আর একবার আমি দেখিয়া আসি।"

হস্তপদ বিস্তার করিয়া পাপী, অনুতাপী রোগী একবার হাঁ করিল। অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে একবার কহিল, "একটু জ—ল! একটু জ—ল!"

ছুটিয়া গিয়া অপর্ণাদেবী বিন্দু বিন্দু করিয়া বারি প্রদান করিলেন, রসনা হইতে নীচে নামিল না। ঘন ঘন, দীর্ঘ দীর্ঘ,—রোগীর নাসিকায়,—নাসিকায় কি মুখে, বুঝা গেল না, ঘন ঘন, দীর্ঘ দীর্ঘ তিনটী নিশ্বাস পড়িল। অপর্ণাসতী যেন বাতাহত তরুর মত হেলিয়া পড়িতেছিলেন, অপ্সরাসুন্দরী বাহু বিস্তার করিয়া ধরিলেন।

"কে তুমি মা! কেন আমারে ধর? ছাড়িয়া দাও, আর একবার দেখিয়া আসি। জীবন! প্রাণ! কোথায় পলাইয়া যাও? পথ দেখাও, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

অপর্ণাদেবী শয্যা-সমীপে। কেবল সমীপে মাত্র নয়, সেই অভাগা বীরপুরুষের বক্ষ-সমীপে। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া দেখিলেন, উত্তান-চক্ষু। বদন বিবৃত। নাসারন্ধ্র শ্বাসপ্রশ্বাস পরিশূন্য। "আর কি দেখিব! দেখিবার ত আর কিছুই নাই! জন্মশোধ আলিঙ্গন করি!"

অপ্সরাসুন্দরী লাফাইয়া উঠিলেন। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানিতে পারিলেন, কিন্তু অভাগিনী সতীলক্ষ্মীকে বাঁচাইবার জন্য হস্তধারণপূর্ব্বক বারংবার আকর্ষণ করিলেন; কিন্তু কাহাকে? অপর্ণা কি আর আছে? তাঁহার শরীর করকার মত শীতল। পতির বক্ষের উপর শয়ন করিয়াছেন, সেই শয়ন তাঁহার শেষ শয়ন। মৃত পতির গাত্রবস্ত্রে শোণিত বৃষ্টি! একটু পূর্ব্বে হয় ত অপর্ণা কি বিষ পান করিয়াছিলেন, যাহাতে রক্ত উদ্গারণ হয়। মুখ দিয়া রক্ত বমন হইয়াছে, শবগাত্র প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, সতী এখন পতিসঙ্গ শয্যাগতা। অনন্ত শয্যা! উভয়েরই জীবনবায়ু বহির্গত।

গৃহে একাকিনী অপ্সরা। তিনি কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহা তিনি জানেন, আর যাহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা জানেন। আমাদের দেশের লোক প্রায় সচরাচর বলেন, শোকে, দুঃখে, বিরহে কাতর হইলেই বলেন, বুক ফাটিয়া যায়। কাদম্বরীর গ্রন্থকার আর কাদম্বরীর পাঠক এ কথার প্রতিধ্বনি করিবেন,—বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু সত্য, বুক ফাটিয়া যায় কিরূপে, তাহা এই অপর্ণাসুন্দরী,—সতী অপর্ণাসুন্দরী দেখাইয়া দিলেন। পাষণ্ড পতির বিচ্ছেদে কোন সতী ললনা এত দূর অগ্রবর্ত্তিনী

হইয়া এরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এই সতীক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রেও এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

ভূপেশ! ভূপেশ! এমন দুঃসময়ে তুমি কোথায় গেলে? সমস্তই যে ফুরাইয়া গেল। যাহাদের উপকার করিবার জন্য দয়া আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, একটী কথাও না বলিয়া তাহারা সচ্ছন্দে ভূতদেশে চলিয়া গেল। ভূপেশ! আমি একাকিনী রহিয়াছি। কে যেন রক্তবাস পরিধান করিয়া আমারে বিভীষিকা দেখাইতে আসিতেছে। বিভীষিকা কি অভয়, স্পষ্ট তাহা এখন আমি বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু—কিন্তু—এইরূপ প্রলাপ বলিতে বলিতে অপ্সরাসুন্দরী মূর্চ্ছাগতা।

মূর্চ্ছা কতক্ষণ ছিল, মূর্চ্ছিতা দয়াময়ী তাহা জানেন না। কিন্তু মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর সম্মুখে দেখেন, ভূপেশচন্দ্র! শোকের বার্ত্তা অনেক। শোকের সময় দুজনে কত কথাবার্ত্তা হইল, আমাদের নায়িকার নেত্রে কত অশ্রু বর্ষিত হইল, তাহা গণনা করা দৈবজ্ঞদিগেরও অসাধ্য। অপ্সরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি কত?"

ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "রাত্রি কি হইয়াছে?"

বিকট হাস্য করিয়া অপ্সরা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ত পাগলিনী। তুমিও কি পাগল হইলে? রাত্রিকালে আসিয়াছি, তাহার পর আর সূর্য্য দেখি নাই; যে ব্যক্তি তোমারে শত্রুজ্ঞান করিতেছিল, ঘোর নিশান্ধকারে কৃতান্ত তাহার জীবন হরণ করিয়াছেন। এখন ভূপেশচন্দ্র! ধর্ম্মানুরোধে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর।"

ভূপেশচন্দ্র সঙ্কেতে সে কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন। নিশাকালেই শিবদীন মিশ্র, ওরফে হনুমন্ত সিংহ আর অপর্ণাসুন্দরীর সমাধিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া গেল। ভূপেশচন্দ্র অপ্সরাকে লইয়া আবাস ভবনে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি আর বেশী ছিল না, নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বেই ঊষা আসিয়া দর্শন দিলেন। ঊষাপক্ষীরা কলরব করিয়া উঠিল, অন্ধকার কমিয়া গেল। আকাশের পূর্ব্বদিক অল্পে অল্পে সুপ্রকাশ, নক্ষত্রেরা ম্লান হইয়া দেখিতে দেখিতে আকাশপথে মিলাইয়া গেল। প্রভাতী পাখীরা মধুরস্বরে গীত ধরিল, নূতন সূর্য্যের সমুদয়ে জলে নূতন কমল ফুটিয়া

ভাসিয়া উঠিল। প্রকৃতী সুন্দরী যেন স্বর্ণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া স্বর্ণ-ভূষণ অঙ্গে দিয়া দশদিক সমুজ্জ্বল করিলেন।

প্রভাত হইয়াছে। আকাশের অন্ধকার দূরে গিয়াছে। আকাশের নক্ষত্রেরা লুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের নায়ক নায়িকা এমন সুখ-প্রভাতেও কেন অন্ধকার দেখিতেছেন, তাঁহারা ভিন্ন আমরা সে কথার উত্তর দিতে পারি না। কি বিষাদে ভূপেশচন্দ্র বিষাদিত, ভূপেশচন্দ্রই জানেন। কি বিষাদে অপ্সরাসুন্দরী বিষাদিনী, অপ্সরাসুন্দরীই জানেন। কিন্তু প্রভাত হইয়াছে।——

এই ছিল ভবধাম ঘোর অন্ধকার।
দূরে গেল সে আঁধার না দেখি ত আর॥
কোথা গেল কে বলিবে কেন আসে যায়।
কি মায়া বিশ্বের মায়া সুধাইব কায়॥
আঁধারে জ্বলিতেছিল নক্ষত্র নিচয়।
মাণিকের সম জ্যোতিঃ চক্ষু জ্যোতির্ম্ময়॥
আর নাই সেই জ্যোতি দেখিতে না পাই।
এই ছিল কোথা গেল আকাশে ত নাই॥
কি আছে আকাশে তবে? সমুজ্জ্বল কর।
উদিয়াছে প্রভাকর নব বিভাকর॥
সলিলেতে ফুটিয়াছে নবীন নলিনী।
মুদিয়াছে কুমুদিনী শশী-বিরহিণী॥
কি শোভা অপূর্ব্ব শোভা রজনী প্রভাতে।
স্বর্ণবর্ণ এ ব্রহ্মাণ্ড দিনেশ প্রভাতে॥
যে দিকে চাহিয়া দেখি সব স্বর্ণময়।
তবে কেন কৃষ্ণবর্ণ নায়িকা হৃদয়॥

কেন তবে ভূপেশের মন অন্ধকার।
কেন তাঁরা হেরিছেন আঁধার সংসার?

সংসার কেন তাঁহাদের নয়নে আঁধার বোধ হইতেছে, আমরা বলিতে পারিব না। বেলা এক প্রহর হইয়াছে। এক জন ডাকহরকরা একখানি পত্র দিয়া গেল। আগ্রহে হস্ত বিস্তার করিয়া অপ্সরাসুন্দরী সেই পত্রখানি গ্রহণ করিলেন। স্ত্রীলোকের হস্তের লেখা। মোহরে অঙ্কিত "প্রয়াগধাম।" প্রয়াগ হইতে কোন্ স্ত্রীলোক পত্র লিখিবে, অপ্সরা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। পত্রখানি হাতে করিয়া হাত কাঁপিতে লাগিল। শিরোনামে লেখা "অপ্সরাসুন্দরী।"—অপ্সরাসুন্দরীর নবীন নেত্রনীর সেই শিরোনামটী ভিজাইয়া দিল। ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পত্র?"

অশ্রুমার্জ্জন করিয়া অপ্সরা উত্তর করিলেন, "জানি না।"

"পাঠ করিয়া দেখ, জানিতে পারিবে।"

"পাঠ করিবার অগ্রে বাষ্প আমার নয়ন রোধ করিতেছে।"

"শান্ত হইয়া বাষ্পকে বিদায় দাও, নেত্রকণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।"

অপ্সরাসুন্দরী আবার নেত্র মার্জ্জন করিলেন। পত্রাবরণ মোচন করিয়া আমাদের স্নেহময়ী নায়িকা পাঠ করিতে লাগিলেন। লেখা আছে;——

"প্রিয়তমা অপ্সরা!

বর্ষা গিয়াছে, শরৎ গিয়াছে, শীতকাল আসিয়াছে, কিন্তু মা! প্রাণাধিকে! আমি তোমাকে কখনও দেখি নাই। তোমার পিতার নামে তুমি যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা পাইয়াছি। তোমার মা নাই, এখন আমিই তোমার মা। তোমার পিতা আমারে নূতন বিবাহ করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে আমি তোমার মা। প্রাণাধিকে! পত্রে তুমি আমারে প্রণাম জানাইয়াছ, উদ্দেশে চুম্বন করিয়া আমি তোমারে আশীর্ব্বাদ করিলাম, সুখে থাক। কল্যাণময় বিশ্ববিধাতা তোমার কল্যাণ বিধান করুন। মা! তুমি কেমন আছ? যাহার প্রতি তুমি গাঢ় অনুরক্ত, সে ভূপেশচন্দ্র কেমন আছেন? তোমার পিতা তোমার প্রতি কঠোর কর্কশ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এখন তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করিতেছেন।

পত্রে তোমার মিনতি পাঠ করিয়া তিনি ক্ষমা করিতেছেন। মা! তোমার পিতার বক্ষঃস্থলে যে কন্যাস্নেহ আছে, আমি তাহার অংশী হইয়াছি। যে দিন তোমার পিতা আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন তাঁহার প্রতি পতিভক্তি আর তাঁহার কন্যার প্রতি অপত্যস্নেহ মনের সহিত অর্পণ করিয়াছি। মাস, মাস, কত মাস গিয়াছে, কোথায় তোমারে দেখিতে পাইব, ব্যস্ত হইয়া আকাঙ্ক্ষাকে নিমন্ত্রণ করিতেছিলাম, ঠিকানা জানিতাম না। তোমার পিতা তোমার পত্রখানি আদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। অবশ্যই যাহা কিছু ঘটনা, তাহা তিনি বিস্মৃতি-সাগরে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হৃদয়বাঞ্ছা! তোমার কাছে কোন কথা আমি গোপন করিব না, সত্য বলিতেছি, ইহাই তাঁহার বাঞ্ছা। কেবল তাঁহার নহে, আমারও তাহাই বাঞ্ছা। প্রাণাধিকা অপ্সরা! শুনিয়া হয় ত তোমার আহ্লাদ হইবে, তোমার পিতা তোমারে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিয়াছেন। ভূপেশচন্দ্রকেও ক্ষমা করিয়াছেন। তোমার পত্রে পাঠ করিলাম, ভূপেশ-চন্দ্রকে তুমি যত দূর ভক্তি কর; সেই ভক্তির পরিচয় পাইয়া রাজা আমারে কহিলেন, তোমারে কোলে করিবার জন্য তাঁহার আত্মা একান্ত ব্যগ্র হইতেছে। মা! তুমি দেশে এসো; ভূপেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তুমি দেশে এসো। রাজা তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিবেন।"

"প্রয়াগধাম হইতে আমি এই পত্র লিখিতেছি। দুই মাস কাশীতে ছিলাম, সম্প্রতি প্রয়াগে আসিয়াছি। আসিতাম না, কিন্তু দৈব ঘটনায় কাশীতে তোমার পিতার শরীর অসুস্থ হওয়াতে কুশলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবেরা প্রয়াগে ফিরিয়া আসিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি নিজেও কিছু ভয় পাইয়াছেন। ভয় পাইতেছেন, হয় ত বাঁচিবেন না। কিন্তু প্রাণাধিকে! সে পীড়াকে আমি ততদূর সঙ্কট বিবেচনা করি না।"

"অপ্সরা! তোমার পিতার এত দূর আকিঞ্চন হইয়াছে যে, চীনরাজ্যে গমন করিয়া তোমারে কোলে লইবেন। মা! তাঁহার শরীরের যেরূপ অবস্থা এখন;—বিমাতা বলিয়া আমারে সন্দেহ করিও না, আমি তাঁহারে চীন দেশে গমন করিতে বারণ করিতেছি, তোমার হৃদয়ে যদি সেই পূর্ব্ববৎ পিতৃভক্তি থাকে, ভূপেশচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া প্রয়াগধামে আসিয়া দেখা

কর। আমি তোমারে দেখি নাই, দেখিবার নিতান্ত বাসনা, একবার দেখা দিলে সুখী হইব।"

এ পত্রখানি কাহার লেখা, পাঠক মহাশয় অবশ্যই বুঝিয়াছেন, নবীন রাজমহিষীর। অপ্সরাসুন্দরী পত্র পাঠ করিলেন, মনে মনে না, সম্ভবমত উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিলেন, প্রত্যেক বর্ণ, প্রত্যেক শব্দ ভূপেশচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। উদাসনেত্রে অপ্সরার মুখপানে চাহিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "অপ্সরা! আমার মনে হয় রাণী হয় ত মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। আমার মনে হয় পীড়া সঙ্কটাপন্ন। তুমি চল, প্রয়াগে যাইতে হইবে।"

"আর যদি কোন বিপদ ঘটে?"

"বিপদ? বিপদকে আর আমি ভয় করি না। যে বিপদের সহিত অনেকবার আমি সাক্ষাৎ করিয়াছি, সে বিপদ আর আমারে অবসন্ন করিতে পারে না।"

"আর যদি সেই—— "

বাধা দিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ? সেই বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড পামর, যে আমারে পুনঃপুন প্রতারণা করিয়াছে, তাহারে আমি ভয় করি না। তাহার কোন অহিত চিন্তা করি না, করিবও না। তাহার যতদূর সাধ্য থাকে, চেষ্টা করুক, আমি তাহাতে টলি না। আমার এক জন সহায় আছেন:——

যাঁহার সহায়ে আমি জয়িব সংসার।
হৃদিপদ্মে ভাবি সদা চরণ তাঁহার॥
সেই মম মনোময় তিনি বিশ্বময়।
তাঁহার কৃপাতে মম অভয় হৃদয়॥
সেই পাদপদ্ম হৃদে করিয়াছি সার।
যে পদ প্রসাদে, বিঘ্ন রবে না আমার॥
কারে আমি ডরি সতি! ইহ বিশ্বধামে।
সর্ব্বজয়ী হতে পারি বিশ্বনাথ নামে॥

বিকায়েছি সেই পদে জনমের মত।
সে পদ কৃপায় যায় শোক তাপ যত॥
অনন্ত বিশ্বের পিতা ব্রহ্ম সনাতন।
অনুক্ষণ হৃদে ভাবি তাঁহারি চরণ॥
সদয় অভয় নাম অনন্ত অব্যয়।
যে নাম স্মরণে সতি! নাহি কোন ভয়॥
যাইব প্রয়াগধামে সাজ সাজ সতি!
সহায় হবেন পথে অগতির গতি॥
কোন ভয় রাখি না ত, কারে বা কি ভয়।
দীন জানি দীননাথ দিবেন আশ্রয়॥
বড় ভালবাসি আমি পরমার্থ ধনে।
দিবানিশি সেই রূপ জাগিতেছে মনে॥
রূপ নাই তবু আমি রূপ দেখি তাঁর।
জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বময় তবু নিরাকার॥
নিরাকারে ভাবি আমি মানসে সাকার।
ভাবনায় ঘুচে যায় মানস আঁধার॥
বিপদ্‌কাণ্ডারী সেই অখিলের পতি।
ধ্যান করি মনে মনে অগতির গতি॥
চল লো অপ্সরা সতি! বিলম্ব কি আর।
আগে আগে যাইবেন ভবেশ আমার॥
বিপদ সম্পদ সেই অনাথের নাথ।
যোড় করে তাঁরি পদে করি প্রণিপাত॥

সহায় আছেন তিনি অন্তরে বাহিরে।
ভক্তিভাবে ডাকি আর ভাসি নৈত্রনীরে॥
কে মুছাবে নেত্রনীর বিনা নিরঞ্জন।
সত্য নিরঞ্জন তিনি নিত্য নিরঞ্জন॥
কি ভয় অপ্সরা সতি! সামান্য বিপদে।
মতি আছে শ্রীপতির অভয় শ্রীপদে॥
চল সতি! চল যাই নাহি কোন ভয়।
অবশ্য জগত পিতা দিবেন অভয়॥

মানুষের মস্তিষ্কে বা নাড়ীতে বিদ্যুৎ ছুটিলে যেমন হয় মানুষের শরীর তখন থর-হরি কাঁপিতে থাকে। ভূপেশের বিশ্বভক্তি আর অসমসাহসিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার কোমল কলেবরে যেন চপলা চমকিয়া গেল। প্রতিবন্ধকতা করিবার আকিঞ্চন ছিল, সে আকিঞ্চন যেন ভুলিয়া গেলেন। উন্মাদিনী হইয়া কহিলেন, "ভূপেশ! তুমি নরলোকে আসিয়াছ কেন? আমি দেখিতেছি, যেন তুমি স্বর্গীয় বস্তু। স্বর্গই তোমার উপযুক্ত স্থান। আমি অভাগিনী পাপীয়সী, আমারে পবিত্র করিবার জন্যই নররূপে তুমি অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি কৃতার্থ হইয়াছি। যদি ভাগ্যে থাকে, তোমার মত অমূল্য নিধিকে পতিত্বে বরণ করিয়া এই বিপদবেষ্টিত মায়াময় সংসারে একদিনের জন্যও আমি সুখী হইতে পারিব।"

"কেন এমন কথা বলিতেছ অপ্সরা? তোমারে আমি হৃদয়ে পূজা করি। লোকে তোমাকে যে চক্ষেই দেখে, দেখুক, আমার চক্ষু দেখে স্বর্গ-সুন্দরী! তোমারে দর্শন করিয়াই——"

"কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না, অনেক বার উদ্ভ্রান্তমানসে অনেক প্রকার সম্বোধন করিয়াছি, মুখ ফুটিয়া মনের কথা বাহির হইয়াছে, কিন্তু আজ?—আজ আমি তোমারে কি বলিয়া সম্বোধন করি? সত্য কথা বলিলে হয় ত তুমি আমারে উন্মাদিনী বলিয়া উপহাস করিবে। কিন্তু

মনো—(শ্রীবিষ্ণু!) কিন্তু ভূপেশ! আমার প্রাণ যেন বলিতেছে, তুমি স্বর্গের দেবতা।"

"আমারও প্রাণ যেন বলিতেছে, তুমি যেন স্বর্গের দেবী।"

"কেন আর অবিশ্বাস করব? আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। আর তোমার ইচ্ছার বিরোধী হইব না। পিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে।"

"তবে চল।"

চল বলিবার অপেক্ষা ছিল না, পদব্রজে যাইতেছেন, সে স্থানে অধিক বিলম্ব হইবারও সম্ভাবনা ছিল না, অধিক জিনিসপত্রও সঙ্গে লইবার প্রয়োজন হইল না, তাঁহারা উভয়ে গৃহ হইতে রাজপথে বাহির হইলেন। কি আশ্চর্য্য দেখ! বিপদ যখন আসে, তাহার একটু পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারা যায় না। বিপদ অলক্ষিতে চুপি চুপি আসে, সংবাদ দিয়া আসে না। বাটীর অদূরে একটী ছোট নদী। নদী পার হইবার নিমিত্ত ভূপেশচন্দ্র একজন নাবিককে আহ্বান করিতেছেন, নাবিক আসিয়া গম্ভীর বদনে ভূপেশচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিল। রাত্রিকাল নহে, দিনমান। কোন রাজ-প্রহরী নহে, হইতে পারে তাহা, কিন্তু নাবিকবেশে মূর্ত্তিমান। ভূপেশের হস্ত ধারণ করিয়াই গম্ভীরস্বরে সে ব্যক্তি বলিল, "তুমি আমার বন্দী।"

যিনি বন্দী হইলেন, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই; কিন্তু অপ্সরাসুন্দরী কাঁপিয়া উঠিলেন। অপ্সরার রসনায় এক প্রকার মৃদুল অস্ফুট শব্দ,—শব্দ বুঝিতে পারা গেল না, অধরোষ্ঠ বিকম্পিত হইয়া সেই শব্দ বাতাসে মিশাইয়া দিল। চপলা যেমন শীঘ্রগামিনী, প্রণয়শীলা নারীর দৃষ্টিও তদ্রূপ দ্রুতগামিনী। স্বর্গের দূতী সময়ে সময়ে মানবকুলকে যেমন কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিয়া সৎ-সঙ্কল্পে আশা দেয়, অপ্সরাও সেই রূপে ভূপেশচন্দ্রের কাণে সময়োচিত কর্ম্মের আশা দিলেন। আশা যেন ভূপেশের সর্ব্ব শরীরের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইল। তাহাই ত হইয়া থাকে। আশা-চপলা! চপলার যেমন খেলা আছে, আশারও তেমনি খেলা।

ভূপেশচন্দ্র ইঙ্গিত বুঝিলেন, কিন্তু ইঙ্গিতকারিণীর ইঙ্গিতে উত্তর করিলেন না। যে লোক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়াছিল, সে লোক যে নৌকার

কাণ্ডারী নয়, তাহা তিনি জানিলেন। আর কি জানিবেন? সে লোক ছদ্মবেশধারী রাজপ্রহরী। জানিতে পারিয়া, মিনতি করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি, কিন্তু ভাই! একটী অনুরোধ রাখ। রাস্তায় অনেক লোক, এত লোকের সাক্ষাতে আমায় কোন প্রকার অপমানের কথা বলিও না।"

"যতদূর আমার সাধ্য, ততদূর আমি ভদ্রসন্তানের সম্ভ্রম রাখিতে জানি, রাখিবও তাহা।"

প্রহরীর এই উত্তরে ভূপেশচন্দ্র আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন, কহিলেন, "প্রহরি! আমি তোমার বন্দী হইলেও এই সততার জন্য উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব।"

নদী পার হইয়া যাহারা সেই সময়ে তীরে উঠিতেছিল, গৃহে যাইবার জন্য যে তাহারা কত ব্যস্ত, আত্মীয় স্বজনের মুখদর্শনের নিমিত্ত তাহাদের যে তখন কত আগ্রহ, বিদেশ হইতে দেশে আসিবার সময় যাঁহারা তরণী বা শকট হইতে অবতরণ করেন, তাঁহারাই তাহা জানেন। কে কাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহা তাহারা চাহিয়াও দেখিল না। ভূপেশচন্দ্রের সৌভাগ্য। বন্দীদশায় আরও কিছু বেশী অপমান থাকিতে পারে, কিন্তু সে অপমান যদি অন্য লোকের চক্ষে না পড়ে, তাহা হইলে তত অপমান বোধ হয় না।

অপ্সরাসুন্দরী,—সতী পবিত্র কুমারী অপ্সরাসুন্দরী শব শরীরের মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উভয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু চক্ষে জল পড়িল না। নাসিকায় নিশ্বাস পড়িল না। কিন্তু ইচ্ছায় নয়। ইচ্ছাকে রোধ করিয়া পবিত্র কুমারী নিশ্বাস-অশ্রু সম্বরণ করিলেন। কথা না কহিলে কি কাহারও মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারা যায় না? আমি বলি, আরও অধিক বুঝিতে পারা যায়। মৌনবতী মূর্ত্তি যখন নয়নে নয়নে চাহিয়া থাকে, মৌনবতী মূর্ত্তি যখন কাতরতা প্রকাশ করে, ছোট দুঃখকে তখন ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয়।—যাহাদের হৃদয় আছে, তাহাদের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়। নিঃশব্দে তিন জনের কথা হইল। দুটী চক্ষু অনেক কথা জানে। কিন্তু এখানে ছয় চক্ষু একত্র। বিপদ-সময়ে,—ঘোর বিপদ-সময়ে

এই ছয় চক্ষু যে কত কথা কহিল, সংক্ষেপে তাহা আমি বুঝাইয়া দিতে পারিব না। পাঠক মহাশয় যদি কখনও এমন বিপদে পড়িয়া থাকেন, স্মরণ করিবেন, অনুমানে বুঝিয়া লইবেন, সুখের অবসানে দুঃখের দশা কতদূর ভয়ঙ্করী।

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইতে চাও? এ রাস্তায় এখন গাড়ী মিলিবে না। তোমার অনেক অর্থসম্বল আছে, তাহা লইয়া তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার ইচ্ছামত স্থানে গমন করিতে পার।"

ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন না। তাঁহার মস্তকে কি এক ভয়ানক মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। বোধ হইল যেন, স্বপ্নে স্বপ্নে তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। আর দুইজন প্রহরী সেই সময় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন কহিল, "ভূপেশচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে কে? ইহার হস্তে হাতকড়ি দেওয়া হয় নাই?"

"কাহার কথা বলিতেছ?" লম্ফ প্রদান করিয়া ভূপেশচন্দ্র চীৎকারস্বরে কহিলেন, "কে তুমি? কাহার কথা লইয়া এখানে আসিয়াছ? কে সে? কোথায় সে? আসিতে বল। আমার হৃদয়ে কখনও প্রতিহিংসা ছিল না, কিন্তু প্রতিহিংসা আসিয়াছে। প্রতিহিংসা এক পাষাণময়ী দেবী। সেই দেবীর নিকটে সে লোককে আমি বলিদান করিব। আসিতে বল।"

অপ্সরাসুন্দরী তখনও নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ধৈর্য্য তাঁহাকে যেন পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু জোর করিয়া তিনি ধৈর্য্যকে বুকে রাখিলেন। সজলনয়নে তিনি কহিলেন, "ভূপেশ! আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ। মনে যদি কোন প্রকার আগুন জ্বলিয়া থাকে, শান্তিবারি সেচন করিয়া নির্ব্বাণ কর। বিপদে চঞ্চল হইতে নাই। সুস্থির হও! শান্ত হও।"

"শান্ত হব! সুস্থির হব! অপ্সরা! আমি শান্ত হব! প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণে ওষ্ঠদন্ত ঘর্ষণ করিয়া অপ্সরার বাক্যে ভূপেশচন্দ্র প্রতিধ্বনি করিলেন। মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা তাঁহার নয়নে বদনে যেন আলো জ্বালিয়া দিল। আবার কহিলেন, "অপ্সরা! আমাকে যদি শান্ত হইতে বল, আকাশের ঝড়কে শান্ত হইতে অনুমতি কর, সমুদ্রের তরঙ্গকে শান্ত হইতে অনু-

মতি দাও, অগ্নিবর্ষী বজ্রকে নিস্তব্ধ হইতে উপদেশ কর। পরমেশ্বর! জগতের,—ত্রিজগতের দুর্লভ করুণাময় পরমেশ্বর!—আ! কি অসহ্য যন্ত্রণা! কি নিদারুণ ভয়! এই যন্ত্রণা আর এই ভয় শিরায় শিরায় আমায় দগ্ধ করিতেছে। এ যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। এ বিকট ভয় আর আমি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না। যন্ত্রণানিবারণ ভয়ভঞ্জন বিপদবারণ মধুসূদন! জন্মাবধি সংসারে আমি কাহার কি অপরাধ করিয়াছি? ইহারা আমায় এত যন্ত্রণা দেয় কেন? ভয় দেখায় কেন, অকারণে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে কেন? সব যেন আমি ভুলিয়া গিয়াছি। খড়্গহস্তা প্রতিহিংসা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন আমার সম্মুখে—আমার নয়নসম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে। জগদীশ্বর! অকারণে যাহারা আমায় বিপদগ্রস্ত করিতেছে, তোমার অনন্ত জগতে কি তাহাদের কোন প্রকার শাস্তি নাই? অপ্সরা! সরিয়া যাও। সরিয়া দাড়াও। না অপ্সরা! হৃদয়-প্রতিমা তুমি! তোমারে সরাইয়া একাকী আমি কি নিদারুণ নরিব? মনে আছে তোমার অপ্সরাসুন্দরি? সঞ্চিত অর্থ প্রদান করিয়া যাহাকে আমি সেই সময়ে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম, সেই লোক আবার নিমকহারাম,—আবার বিশ্বাসঘাতক। সেই লোকের কুচক্রে—অপ্সরা! সেই লোকের কুচক্রে আবার আমি বন্দী। প্রহরী সেই কথাই বলিতেছে। শুনিতেছ না তুমি? প্রহরী সেই বিশ্বাসঘাতকেরই নাম করিতেছে। এখন অপ্সরা! এখন কি আর তুমি আমাকে নিন্দা করিতে পার? তুমি কাছে আছ, সেই নিমিত্তই হৃদয়ে আলো আছে। তোমার অদর্শনে আমার চক্ষু বিশ্ব-সংসার অন্ধকার দেখে। কিন্তু অপ্সরা! আজি আর আমি অধিকক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব না। প্রতিহিংসা প্রতিক্ষণে আসিয়া আমারে উত্তেজনা করিতেছে।—রাত্রি কত? হাঃ! হাঃ! হাঃ! সত্যই আমি পাগল হইলাম! দিনমানে জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাত্রি কত? অপ্সরা! তোমার কি রামায়ণ মনে আছে? রাবণ যখন জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া যান, সেই সময় জানকীনাথ লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ! সূর্য্যকে নিবারণ কর, আর যেন তিনি আমাকে দগ্ধ না করেন।—তখন রাত্রিকাল! রাত্রিকালে সূর্য্য আকাশে থাকেন না। তবে কি রামচন্দ্রের ভ্রান্তি

হইয়াছিল?—ভ্রান্তি নয়। মনের দুঃখে রঘুনাথ প্রাণাধিক ভ্রাতাকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।—আবার বলিতেছি, তখন নিশাকাল। অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া লক্ষ্মণঠাকুর কহিয়াছিলেন, জানকীজীবন! তোমাতে ত ভ্রান্তি সম্ভবে না। রাত্রিকালে সূর্য্য থাকিবেন কেন?—রামচন্দ্র কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি বালক, আমি দেখিতেছি, সূর্য্য আমার গাত্র দগ্ধ করিতেছেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, রঘুনাথ! অনেক রাত্রি হইয়াছে। নিশানাথ সুশীতল করবর্ষণ করিয়া ধরাধামকে শীতল করিতেছেন।—লক্ষ্মণ! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, সুশীতল কর নয়, অগ্নিময় প্রখর কর।—কেন নারায়ণ? চন্দ্রকিরণ কখনও কি প্রখর হয়?—হয় না, কিন্তু চন্দ্র ত আকাশে নাই।—কেন সীতানাথ?—তুমি তাহা জান না।—তুমি যাহা জান, তাহা আমি না জানিতে পারি, কিন্তু দেখিতেছি, আকাশে চন্দ্র।—চন্দ্র নয় লক্ষ্মণ! চন্দ্র নয়। সূর্য্য।—সূর্য্যে কি কলঙ্ক থাকে?—হইয়াছে।—কেন জান ভাই! আমাদের বংশে সগর-কীর্ত্তি সাগর। ভগীরথের কীর্ত্তি ভাগীরথী। কিন্তু আমি অভাগা রাম, সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই কীর্ত্তি রাখিলাম, একটী মাত্র ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না! সেই জন্যই সূর্য্যে কলঙ্ক হইয়াছে। আকাশে চন্দ্র নয়, সূর্য্য।—দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "অপ্সরাসুন্দরি! শত্রুর কুচক্রে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াও এতক্ষণ আমি এত কথা কহিতেছি, প্রহরী বড় ভালমানুষ। উৎকোচের বড় মাহাত্ম্য।—সূর্য্যকে আমি কলঙ্কিত বলিব না, কিন্তু অপ্সরা! চক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া থাক। সূর্য্যকে আমি গুটীকতক কথা বলিব।

"প্রভাকর! কেন তুমি আমার নয়নে।
ঝাকিতেছ জ্বলিতেছ রজত বরণে?
জ্বলিয়া যাইছে কেন আমার হৃদয়।
দয়াময় দিননাথ এত কি নিদয়!!
সহে না উত্তাপ আর! অরাতির করে—
বাঁধা পড়িয়াছি দেব! দিবা দ্বিপ্রহরে॥

জ্বলিছে জ্বলিত চিত কিরণে তোমার।
সম্বর সম্বর জ্বালা, জ্বালায়ো না আর॥
কোথা আছে প্রতিহিংসা? ডেকে দাও তারে।
অরি দলে পুড়াইব ভীম অন্ধকারে॥
কেন তারা অকারণে দহিছে আমায়।
দেখিব দেখাব কিসে জীবন জুড়ায়॥
নিকটে জীবিতেশ্বরী অপ্সরাসুন্দরী।
শান্তি পাই সেই মুখ নিরীক্ষণ করি॥"

কথা কহিতে কহিতে ভূপেশচন্দ্র একবার নেত্র নিমীলন করিয়াছিলেন, চাহিয়া দেখিলেন, অপ্সরা নিকটে নাই। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া করুণস্বরে কহিলেন, "করুণাময়ি! এই ছিলে কোথা গেলে?"

অপ্সরা নিকটে নাই। কে উত্তর দিবে? প্রহরীরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল, ভূপেশচন্দ্র হতাশ অন্তরে তাহাদের অনুগামী। কিন্তু কোথায় যাইতেছেন, হৃদয়প্রতিমা অপ্সরাসুন্দরী কোথায় গিয়াছেন, তাহা মনে পড়ে না। এমন সঙ্কট তোমার আমার যদি ঘটে, তাহা হইলে হয় ত ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছা যাই। কিন্তু ভূপেশচন্দ্রের হৃদয় বাতাসে নড়ে না, ঝড়ে পড়ে না, সাগরের জলেও ডুবিয়া যায় না। আছে কিন্তু একটী সাগর! সে সাগরে ভাবুকের চিত্ত অহরহ ডুবিয়া থাকে। ডুবিয়া ডুবিয়া সাঁতার দেন, ডুবিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া উঠে। হাঙ্গর মকর গ্রাস করিয়া ফেলে না। ভাবুকের হৃদয়কে হাঙ্গর মকর ভালবাসে। মকরবাহিনী গঙ্গা ভাবুক-হৃদয়ের সুখশান্তি প্রদায়িনী। গঙ্গাসাগরে গিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যান নাই। পাঠক মহাশয় হয় ত জানেন, সূর্য্যবংশের কতগুলি রাজপুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য রাজা ভগীরথ অনেক তপস্যা করিয়া ধরণীতলে গঙ্গা আনিয়াছিলেন। বিষ্ণুপদে গঙ্গার উদ্ভব। তাহার পর প্রজাপতি ব্রহ্মার কমণ্ডলে। তাহার পর শিবের জটায়। পুরাণের এত কথা আমরা যদি না বলি, হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি,

ইহা যদি বলি,—শুদ্ধ, সংক্ষেপে ক্ষুদ্র কথায় ইহা যদি বলি, তাহা হইলে পতিতপাবনী গঙ্গার প্রতি ভারতবাসীর কি ভক্তি হইবে না? ভাগীরথী নাম আমরা দিতে জানি। ভাগীরথী দেবী সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়াছেন, তাহাও জানি, কিন্তু আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। সাগরের অনেক নাম। আমাদের শাস্ত্রে সপ্ত সমুদ্রের নাম লেখা। কিন্তু লেখা আছে, পৃথিবীর স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অধিক। এরূপ স্থলে সাতটী ভিন্ন আর যে অধিক সমুদ্র নাই, এ কথায় বিশ্বাস করিতে আমাদের ভয় হয়।

"সূর্য্যদেব! আর কেন আমারে দগ্ধ কর? অস্ত যাও! অস্ত যাও! দিনমানে তোমার সমক্ষে আমি আর অপদস্থ হইতে পারিব না। আমার অপ্সরাসুন্দরী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, জানি না। তুমি কলঙ্কী! তুমি কি তাহারে হরণ করিয়া লইয়া গেলে? রামচন্দ্র তোমারে কলঙ্কী বলিয়াছিলেন, সেই একদিন আর এই এক দিন।"

"যাইতেছি। বন্দী দশায় রাজপ্রহরীর সহিত যাইতেছি। কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, স্থিরতা নাই। একবার বন্দীগৃহে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম, মনে আছে, কিন্তু আবার যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা ভাবনা করিতে হৃৎকম্প হয়। আশা আমাকে একটী কথা বলিয়াছিল, সে কথা সার্থক হইবে কি না, ধারণা করিতে পারিতেছি না। যাহার প্রাণে প্রাণ গাঁথা, সে প্রাণের বস্তু আমার কোথায় সরিয়া গেল, কহিয়া গেল না। মনে বুঝি অভিমান হইয়াছে, মনের বিভ্রমে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম অপ্সরা! তাহাই মনে করিয়া বুঝি লুকাইয়া রহিয়াছ? অপ্সরাসুন্দরি! নয়নের পলকমাত্র তোমাকে না দেখিয়া জগৎসংসার আমি অন্ধকার দেখি, বৈরিহস্তে আমি বিপদগ্রস্ত; নিষেধ করিয়াছিলে, শুনি নাই, তাহারই এই প্রতিফল। প্রয়াগধামে যাওয়া হইল না, তোমার পিতাকে দেখিবার অভিলাষ ছিল, দেখা হইল না। গ্রহদেবতারা আমার প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন, তাহা যদি না হইত, তবে বিনা কারণে পদে পদে পুনঃপুন এত বিপদের সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে কেন? বিপদ আমি ভালবাসি। কুন্তীদেবী বিপদ ভালবাসিতেন,

কিন্তু কেন জান? বিপদ পড়িলেই বিপদকাণ্ডারীকে মনে পড়ে; তুমি অপ্সরা! তুমি আমাকে একাকী রাখিয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছ? দেখিতে পাইতেছি না। কোথাও ত সরিয়া যাইতে না; তবে আজ কেন জীবিতেশ্বরি! আমাকে একাকী রাখিয়া, অন্ধকার নয়, রাত্রিকাল নয়, আজ কেন অদৃশ্য হইলে?"—ভূপেশচন্দ্র আপনার মনে এই সকল কথা বলিয়া মস্তক নত করিলেন।

আকাশে একটী সূর্য্যফুল ফুটিয়াছে। সেই ফুলটী দেখিয়া সরোবরে পদ্ম-ফুল ফুটিয়াছে, পদ্মফুল ত কষ্ট পাইতেছে না। প্রফুল্ল! প্রফুল্ল! প্রফুল্ল! সুখে হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। মধুকর মধুপান করিতে আসিতেছে, পবনদেব বাতাস দিতে আসিতেছেন। লজ্জাহীনা কমলিনীর লজ্জা হইতেছে;—বাতাসে মাথা নাড়িয়া ভ্রমরকে বিদায় করিয়া দিতেছেন।

"যদি এত জানিস্, তবে আমার হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিতেছিস্ না কেন? গরবিনি! তোর গরব থাকিবে না। যে গরবে তুমি গরবিণী, সে গর্ব্ব ঘুচিয়া যাইবে। একটু পরে সূর্য্যদেব অস্ত যাইবেন। তখন গরবিণী কমলিনি! তোর গর্ব্ব কোথায় থাকিবে?"—নিশ্বাস-সহকারে কমলিনীকে এই কথা বলিয়া ভূপেশচন্দ্র পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, অপ্সরা-সুন্দরী নিকটে।—হৃদয়ে আনন্দ হইল।

সূর্য্যদেব অস্তগত হইতেছেন। বিশ্বসংসারের শোভা ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের কোলে লুকাইয়া যাইতেছে। অপরাহ্ণ চলিয়া গেল। প্রদোষ উপস্থিত। গগনপটে নক্ষত্ররাজী ঝকঝক করিয়া জ্বলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। যে প্রহরী ভূপেশচন্দ্রকে বন্দী করিয়াছিল, তাহার বসনাভ্যন্তরে কি এক বস্তু ছিল, ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। ভূপেশচন্দ্র বুঝিলেন, অপসরাসুন্দরী একটু কম্পিত হইলেন। কিন্তু ভূপেশচন্দ্র সমভাবে অচঞ্চল।

"যদি তুমি আমাকে বিনাবন্ধনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাও, শত মুদ্রা পুরস্কার!" সেই ছদ্মবেশী নাবিক একাকী আইসে নাই, তাহার সঙ্গে আর দুই জন সহচর ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "একটু বিলম্ব কর, আমি আসিতেছি।" সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া সেই বক্তা তথা হইতে

একটু সরিয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বন্দী যখন আমাদের হস্তে, তখন যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে, সে জন্য আমরা সাবধান হইব। হুকুম আছে, আমাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমরা করিতে পারি।"

একজন চুপি চুপি অপরের কর্ণে কহিল, "যাহা কবুল করিতেছে, তাহার যদি দ্বিগুণ দেয়, তবে আমরা হাতকড়ি দিব না।" ভাগ্যক্রমে ভূপেশ-চন্দ্রের হস্তে তখন যথেষ্ট অর্থ ছিল, তিনি তাহাই স্বীকার করিলেন। প্রহরী সন্তুষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ভূপেশচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "প্রহরি! যদি তোমরা অনুমতি দাও, আমার এই সহচরীর সঙ্গে নির্জ্জনে আমি একটী কথা কই।"

প্রহরীরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের দাস না হোক, প্রভুর অনুমতির দাস না হোক, ধর্ম্মের দাস না হোক, কিন্তু অর্থের দাস। দুই শত মুদ্রা পুরস্কার পাইবে, এ লোভে তাহারা যে, কি করিতে না পারে, তাহা বলিবার আমার সাধ্য নাই। পৃথিবীর কোন লোকে হয় ত তাহা বলিতে পারে না। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইল। হাতকড়ি বন্ধন ত ক্ষমা হইয়াইছিল, শেষের অনুরোধটীও রক্ষা হইল। প্রহরীরা তথা হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে গেল। অপ্সরাকে সম্বোধন করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "অপ্সরা! দেখি-তেছ, বিপদের কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি? রাত্রি হইয়াছে, পৃথিবী অন্ধকার হইয়াছে, কিন্তু বিপদের মূর্ত্তি যত অন্ধকার, জগৎসংসারে তত অন্ধকার বস্তু নাই। কৃষ্ণমূর্ত্তি। এমন কৃষ্ণমূর্ত্তি কেহ কখনও গঠন করিতে পারে না, কেহ কখনও চিত্র করিতে জানে না। আমরা ভাগবতের কি মহাভারতের কথা কহি-তেছি না। শাস্ত্রমতে সে কৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের আরাধ্য দেবতা। বিপদের মূর্ত্তি সে কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত উপমিত হওয়া অসম্ভব।" কথা কহিতে কহিতে ভূপেশচন্দ্রের নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। নাসিকার ঘন ঘন নিশ্বাসে বক্ষঃস্থল ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু এমন যে বিপদ সম্মুখে, তথাপি সেই সাহসী সৈনিকের মুখের বর্ণ বিবর্ণ হইল না। কথাগুলি কিছু মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হইল। রাজপ্রহরীরা অধিক দূরে যায় নাই, তাহাদের কর্ণ একটীও কথা বুঝিতে না পারে, এইরূপ

সতর্কভাবে ভূপেশচন্দ্রের রসনা হইতে সেই নির্ব্বেদবাক্যগুলি বিনির্গত হইল।

আবার সজোরে নিশ্বাস পড়িল। ক্ষণকাল সাম্‌লাইয়া পরিতাপী নায়ক পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "শোন প্রাণাধিকে! আমি ত চলিলাম, আমার পরামর্শমতে কার্য্য করিও। আমার ইচ্ছা অনুসারে চলিও। তুমি জান অপ্‌সরা! বিবাহের পূর্ব্বেও আমি তোমাকে প্রাণাধিকা বলিয়া সম্বোধন করি। সম্বোধনটা অতি মধুর। এই মধুব বাক্য হৃদয়ে যেন অমৃত বর্ষণ করে। আমি ছাড়িয়া চলিলাম, ইচ্ছাবশে নয়, দুষ্টলোকের চক্রবশে। কিন্তু অপ্‌সরা! ব্যাকুলিনী হইও না। ধর্ম্মপথে আমার মতি আছে, জ্ঞানে কোন পাপকর্ম্ম করি নাই। চক্রান্ত করিয়া যাহারা আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, মঙ্গলময় তাহাদের মঙ্গল করুন, আমি কিন্তু বিপদজাল হইতে মুক্ত হইতে পারিব। অপ্‌সরা! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বৈশ্য যখন ভগবতীর নিকট বর প্রার্থনা করেন, সেই সময়ে প্রকৃতিসতী দয়াবশে কহিয়াছিলেন,—

"অদেয়ং নাস্তি মে তুভ্যং দাস্যামি মম বাঞ্ছিতম্।
যতো যাস্যসি গোলোকং পদমেব সুদুর্লভম্।
সর্ব্বসারাঞ্চ যজ্জ্ঞানং সুরর্ষিণাম সুদুর্লভম্।
তদ্‌গৃহ্যতাং মহাভাগ গচ্ছ বৎস হরে পদং।"

"অপ্‌সরা! ভগবতী দুর্গার সেই বাক্য আমার কর্ণে যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই অভয় পদ আমার আশ্রয়। সেই অভয় পদ তোমারও আশ্রয়স্থান হইবে। অপ্‌সরা! এখন আমার বাসনা এই, তুমি যে গৃহে ছিলে, সেই গৃহে ফিরিয়া যাও। গৃহে যে সকল অনাবশ্যক সামগ্রী আছে, কল্যই তাহা বিক্রয় কর। আমি যেখানে যাইতেছি, তুমিও সেইখানে যাইও। বুঝিতে পারিয়াছ? আমার বাসনা তুমি পূর্ণ করিবে?"

"অবশ্য! কত বার বলিয়াছি ভূপেশ! তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, কত বার এই মুখে এই অভাগিনী অপ্‌সরা অঙ্গীকার করিয়াছে, তোমার

বাসনা পূর্ণ করা তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত। তোমার বাসনা আর ঈশ্বরের আজ্ঞা আমার পক্ষে একই প্রকার। কিন্তু ঈশ্বরের নাম করিয়া কহিতেছি, সকল আশা পরিত্যাগ করিও না। ভূপেশ! আজ তোমার মুখচন্দ্র আমি মলিন দেখিতেছি কেন? যখন বিচ্ছেদ ঘটিবে, তখন যেন কালসর্প আমার মস্তকে দংশন করিবে। তাই বলিতেছি ভূপেশ! সকল আশা পরিত্যাগ করিও না।"

স্নেহভাবে হস্ত ধারণ করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "অপ্সরা! আশারে পরিত্যাগ করিব না মনে করি, জানিও তা; কিন্তু অপ্সরা! আশা যে চপলা।"

"হইলই বা। তাহাতে তোমার আমার কি? তুমি তাহারে পরিত্যাগ করিবে না, আমিও তাহারে পরিত্যাগ করিব না। তুমিও আমারে পরিত্যাগ করিবে না, আমিও তোমারে পরিত্যাগ করিব না। আশা নিজে চপলা থাকে, থাকুক, আমরা তাহারে অচপলা করিবার চেষ্টা করিব।"

"সত্য কি তুমি অঙ্গীকার করিতেছ? চপলা আশাকে অচপলা করিতে পারিবে?"

"হ্যাঁ! পারিব।"

"না,—পারিবে না। আশা আমাদের চক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন জাগিয়া থাকি, তখনও চক্ষের নিকটে নৃত্য করে, যখন নিদ্রা যাই, তখনও স্বপ্নে আসিয়া দেখা দেয়। ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারি না। এত চপলা যে আশা, তাহাকে সুস্থির করা কি মানুষের সাধ্য?"

উভয়ে নয়ন আবরণ করিয়া ক্রন্দন করিলেন। আর আমরা এ শোকাবহ—ভয়াবহ শোকাবহ দৃশ্য দর্শন করিতে পারি না। এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। প্রহরীরা আসিয়া দর্শন দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অপ্সরা-সুন্দরী হৃদয়প্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রতি বক্রভাবে নেত্রপাত করিতে করিতে আবাসগৃহে ফিরিয়া গেলেন। হৃদয়ে কে যেন তীক্ষ্ণধার শলাকা বিদ্ধ করিতে লাগিল।

তিন জন রক্ষকের সহিত ভূপেশচন্দ্র বন্দী-শকটে আরোহণ করিলেন।

এই তিন জনের মধ্যে এক জন কে.? এখন আমরা সে কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সেই লোক শকটে। নাট্যশালার পরিচ্ছদের ন্যায় অভিনব ছদ্ম পরিচ্ছদ, ছদ্ম শ্মশ্রু, ছদ্ম কেশ। অনেক দিন অনেক বার সে মূর্ত্তি যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাও হয় ত দেখিলে চিনিতে পারে না। ভূপেশচন্দ্র অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, মুখে রং মাখা, দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ, চিনিবাব উপায় নাই। ভাগ্যক্রমে অর্থবলে সেই লোক হয় ত উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মশীল ভূপেশচন্দ্রের কি তাহাতে? নূতন বিপদ আসিতেছে, তাহা তিনি জানেন, কিন্তু সেই বিপদে তিনি শঙ্কিত হইতেছেন না। মানসে ভাবিতেছেন জগদীশকে, হৃদয়ে ভাবিতেছেন, একটী প্রতিমাকে, কিন্তু সে প্রতিমা এখন ঢাকা থাকিলে ভাল হয়। যোড়করে কহিতেছেন, "জগদীশ। আমি কাহারও কাছে কখনও কোন অপরাধে অপরাধী নই, আমার উপর এত দৌরাত্ম্য-কেন দয়াময়? তুমি দেব সর্ব্বমঙ্গলেশ্বব মঙ্গলময়, তোমাব প্রতি আমাব চির-মতি আছে। আমার যদি অমঙ্গল ঘটে, তোমাব মঙ্গলময় নামে কলঙ্ক রটিবে, ইহা কি তুমি জান না? কি তুমি না জান সর্ব্বেশ্বব! আমি তোমার মহিমার দাস। তোমার মহিমা আমি জানি না, কিন্তু তোমার একটী অনন্ত মহিমা আছে, তাহা আমি জানি। বিপাকে বিপক্ষেরা আমাকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে, বিপত্তকাণ্ডারি! এ বিপদে তুমি না রক্ষা করিলে আর কে রক্ষা কবিবে রক্ষাময়? বিশ্বনাথ। তোমার চরণে আমি চির-শরণাগত। বিপত্তকাণ্ডারী কি নাম, তাহা আমি ভাল জানি। বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিতেছি, রক্ষা কর! রক্ষা কর! দীনদয়াময় রক্ষা কর!"

"ঐ যা! কি কথা কহিতে কি কথা কহিলাম। অপ্সরা! অপ্সরা! অপ্সরা! প্রাণের অপ্সরা! তুই আমার দীনদয়াময়ী। তোরে পরিত্যাগ করিয়া আমি কোথায় যাইতেছি?"

অপ্সরা ত নিকটে ছিলেন না, সে কথার উত্তর কে দিবে? শকট ছুটিয়া চলিল। কোথায় যাইবে, ঠিক নাই। পাঠক মহাশয়! আপনি হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, ভূপেশচন্দ্রকে কুচক্রী লোকেরা বন্দী করিয়াছে। বন্দী করিবার পরে কি হয়, পুনরুক্তি করিলে আপনাদিগকে ভাল লাগিবে না।

আপনারা নূতন কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন। এখন আমার নূতন কথা নাই। সেই প্রকার বিচার, সেই প্রকার দণ্ডাজ্ঞা, সেই প্রকার দণ্ড, সেই প্রকার যন্ত্রণা, বার বার সে কথা বলিলে বাঙ্গালী পাঠক অবশ্যই বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আমি কাহাকেও বিরক্ত করিব না।

"অপ্‌সরা! প্রাণের অপ্‌সরা! আমার মৃত্যুকাল আসন্ন। দেবি! স্বর্গসুন্দরি! মৃত্যুকালে তুমি কি একটু জল দিবে না? পিপাসায় প্রাণ যায়। অপ্‌সরা। আমার পিপাসা কি তুমি কখনও দর্শন কর নাই? উঃ! ওরা কারা? ঘরের ভিত্তি ভেদ করিয়া, ফার ফোর করিয়া ওরা কারা প্রবেশ করিতেছে? পিপাসা! পিপাসা! পিপাসা! সত্যসুন্দরি! পিপাসায় যদি আমি মরি, তোমার দশা কি হইবে?"—দণ্ডভোগের পর একটী নির্জ্জন গৃহে একাকী বসিয়া ভূপেশচন্দ্র এইরূপ কাতরোক্তি করিতেছেন; সহসা অপ্‌সরাসুন্দরী প্রবেশ করিলেন।

"কেন ভূপেশ! আমি কোথায় গিয়াছি? তোমারে পরিত্যাগ করিয়া আমি যদি স্থানান্তরে যাইতে পারি, সেই স্থানান্তরের নাম কৃতান্তনিবাস। ভূপেশ! আমি আছি! তোমার অপসরাসুন্দরী এখনও পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে। ভয় কি তোমার জীবিতেশ্বর? এই সকল দুষ্ট লোক দূরে থাকুক, যম যদি তোমারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, সাবিত্রীর মত অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমি তোমারে ফিরাইয়া আনিব। আমি বাঁচিয়া থাকিতে যমরাজ তোমারে স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ছোট কথা ছাড়িয়া দাও, এই সকল কুচক্রী লোক উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শাস্তি পাইবে। বিবাহের অগ্রে আমি যদি সতী হই, পাপাত্মারা দেখিবে, ধর্ম্মশীলকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিতে পারি কি না।"

"তুমি আবার এ সময় কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে?"

"কেন প্রাণেশ্বর! আমি ত তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি। যে কোন বৈরী তোমার অমঙ্গল সাধনে সংকল্প করিবে, সর্পিণী হইয়া আমি তাহাদের মস্তকে দংশন করিব।"

"চুপ কর। তোমার কথা তাহারা শুনিতে পাইবে।"

"শুনিতে পাইবে বলিয়াই বলিতেছি। আমি চুপ করিব না। তুমি

ক্ষত্রিয়কুমার! তুমি ভূপেশচন্দ্র! ধিক্ তোমারে! তুমি বিপক্ষকে ভয় কর? কিন্তু আমি;—আমি ক্ষত্রিয়কুমারী অপ্সরাসুন্দরী, আমি কাহাকেও ভয় করি না।"

"তুমি জান, কত দণ্ড আমি সহ্য করিতে পারি? উহারা আমার বুকে দাগ দিয়া দিয়াছে। দগ্ধ লৌহে আমার বক্ষঃস্থলকে দগ্ধ করিয়াছে। তোমারে স্মরণ করিয়া আমি কাতর হই নাই।"

"তাহা শুনিয়াছি।"

"যদি শুনিয়াছ, তবে আরও কি বিপদ আছে?—থাকিতে পারে, কিন্তু সে সকল বিপদকে আমি পদতলে বিমর্দ্দন করি!"

"তবে চল ঘরে যাই।"

"আর একটু বিলম্ব।"

"আর কেন বিলম্ব জীবিতনাথ?"

"উহাদের যত দূর সাধ্য———"

লিঙ্গেশ্বর আসিয়া দেখা দিল। বজ্রস্বরে কহিল "ভূপেশ! ভূপেশ! আবার কি ইন্দুভূষণ হইতে ইচ্ছা কর?"

"যদি করি, তোমার তাহাতে কি? তোমাদের যতদূর শক্তি, তাহা তোমরা করিয়াছ। আমার ইচ্ছার উপরে বাধা দাও কেন?"

"দাসের আবার ইচ্ছা কি?"

"আমি তোমাদের দাস?"

"অবশ্য।"

"সে অবশ্য আমি বুঝিলাম না! আমার অপ্সরাসুন্দরী যেখানে, স্বাধীন হইয়া আমি সেইখানে যাইব।"

হস্ত বিস্তার করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "সেই কথাই যথার্থ।"

ভূপেশকে সম্বোধন করিয়া লিঙ্গেশ্বর কহিল, "জান তুমি অপরাধী পলাতক আসামী! আমি তোমার প্রভু।"

ভূপেশচন্দ্র কথা কহিলেন না। মহাদর্পে কালসর্পের মত নিশ্বাসে নিশ্বাসে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লিঙ্গেশ্বর আবার কহিল, "জান তুমি আমি তোমার প্রভু!"

অপ্সরাসুন্দরী ভুজঙ্গিনীরূপিণী হইয়া খড়্গহস্তে নৃত্য করিতে করিতে কহিলেন, "অমন প্রভুর মস্তকে আমি পদার্পণ করি! পাপিষ্ঠ! নরাধম! পিশাচ! যদি আর একটী কথা কহিস্, আমার এই বাম পদ তোর ঐ মস্তকের,—তোর ঐ পাপ-মস্তকের একটী একটী কেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। আমার এই বাম করের খড়্গ তোর ঐ পাপদেহ হইতে তোর ঐ পাপমস্তককে দূরে দূরে-বহু দূরে বিনিক্ষিপ্ত করিবে। চামুণ্ডার মন্দির তোর মনে পড়ে? সেই মন্দিরে পাষাণময়ী দেবী মূর্তিমতী ছিলেন না, আমি ছিলাম। আমি অপ্সরাসুন্দরী, আমার হস্তে চামুণ্ডার খড়্গ ছিল। এই খড়্গ এখনও আমার হাতে। যে কোন পিশাচ পিশাচী আমার ভূপেশ-চন্দ্রের অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহস করিবে, তাহার মস্তক শ্মশানের শৃগাল-কুক্কুরের ক্রীড়াসামগ্রী মনে করিয়া——"

"কে তুই পিশাচি? আমাদের বন্দীকে আমরা লইয়া যাইব, কে তুই পিশাচি? কে তুই রাক্ষসী?"

"কে আমি?—কে আমি জানিস্ না? আমার ভূপেশচন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য আজ আমি মূর্তিমতী খড়্গরূপিণী হইয়া এই মন্দিরে দাঁড়াইয়া আছি। চামুণ্ডাদেবী সে মন্দিরে পাষাণী ছিলেন, কিন্তু আজ আমার হৃদয়-মন্দিরে রক্তময়ী। আমি বিপক্ষের রক্ত পান করিব। আমি হিন্দুস্থানী অবলা, আমি যদি রক্ত পান না করিতে পারি, আমার এই অসি রক্ত পান করিবে। জানিস তোরা, ভূপেশচন্দ্রের সহিত আজো আমার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু এই ভূপেশের রক্ষার জন্য আজ আমার প্রাণপণ। ভূপেশ! থাক তুমি! তোমার গাত্রে হস্তার্পণ করিতে পারে কে? অনেক দণ্ড সহ্য করিয়াছ, জানি সত্য; তুমি ক্ষত্রিয় রাজকুমার, জানি সত্য, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি কাহারেও ভয় করি না। যদি অহঙ্কার মনে না কর, আমি শ্লাঘা করিয়া বলিতে পারি আমি বীরাঙ্গনা। যে দিন আমি তোমার পত্নী হইব, সে দিনের কথা অন্য কথা; কিন্তু ভূপেশ! ভূপেশ! এখন! তোমার এই পবিত্র গাত্রে আমার সাক্ষাতে যদি কেহ হস্তার্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে জানিব, চন্দ্রসূর্য্যবংশে এমন কোন——আয় দেখি! দেখি দেখি কে তোরা! বীরাঙ্গনার গর্ভের কন্যা আমি। আমার

সম্মুখে বীরদর্পে কে দাঁড়ায় ? আমার হৃদয়নিধিকে কে হরণ করিয়া লইয়া যায়, দেখিব। অটল—অটল—অটলভাবে তাহা আমি দেখিব। লিঙ্গেশ্বর ! তুমি বুঝি রাক্ষস ? রাক্ষসকে আমি ভয় করি না। তোমার নামে যেন হিন্দু হিন্দু গন্ধ কয়, কিন্তু চেহারাতে ত হিন্দু বলে না ! কে তুমি ? আমার ভূপেশচন্দ্র তোমার সহিত যাইবেন না, তুমি বিদায় হও ! তুমি মুসলমান। আর এক মুহূর্ত্ত যদি তুমি আমার সম্মুখে অপেক্ষা কর, এই মহাশয়ার খড়্গ তোমার মস্তকে অনেক দূরে,—কত দূরে জানি না,—তোমাদের মক্কা কি মদিনা ;—কত দূরে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে।”

লিঙ্গেশ্বর মনে করিল, এ মেয়ে মায়াবিনী। মায়াবলে আমাদের সব তত্ত্ব জানে। অধিকক্ষন সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া শঙ্কিতভাবে বাহির হইয়া গেল। অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই। ইহারা মায়াবী। মায়া করিয়া আমার ভূপেশচন্দ্রকে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। কিন্তু আমি কি মায়ার মহিমা জানি না ? মা ! আমি কি তোর মহিমা জানি না ? দেখি দেখি, স্তব করি, আসিস্ কি না আসিস্। মায়া ! মহামায়া ! সত্য কথা বলিস্ কি না বলিস্ ; একবার দেখি। আমারে ছলনা করিয়া কি হইবে মা ! আমি অপরাধিনী। আমার সঙ্গে তোর কি মা প্রতারণা চলে ? আমি কোন দোষে দুষী নই। তবে এত ছলনা কেন মা ? জানিলাম, ছলনা করিবার জন্যই,—যদি অবতার থাকে,—ছলনা করিবার জন্যই ভবধামে তোমার অবতার। কিন্তু মা ! যে লোক নিরপরাধ, তাহাকে ছলনা করিয়া তোমার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ? আমি জানি না, তুমি জান, সেই জন্য তোমারে ডাকি :—

“হৃদয় কমলদলে এসো মা সর্ব্বমঙ্গলে।
তোমার মঙ্গলে মম জগত মঙ্গল ॥”

“ঐ বুঝি কে কথা কহিতেছে ? সে কথার অর্থ ত বুঝিতে পারিলাম না। অপ্সরা ! তুমি কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ?”

ভূপেশচন্দ্রের প্রশ্নে দুঃখে হাস্য করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

"কি বল দেখি?"

"চপলা।"

"চপলার মহিমা কি ঐরূপ?"

"ঐরূপ কি কিরূপ, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতেছে কে?"

"আমি।"

"তুমি কে?"

"আমি ভূপেশচন্দ্র।"

"ভূপেশচন্দ্র?—আঃ! এ নাম আমার কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করিল। বিপক্ষ কি বিদায় হইয়াছে?"

"তুমি জান।"

"আমি কিছুই জানি না। আমার খড়্গ জানে।"

"তাহারা কি তোমার খড়্গকে ভয় করে?"

"নিকটে আসিলে বুঝিতে পারিবে।"

কেহই আসিল না। অপ্সরা কহিলেন, "যদি পলায়নের অবসর থাকে, সেই অবসর এই অবসর।"

"কিন্তু না ত। দুই বার দুই বার যখন আমি নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, দুই বার দুই বার যখন আমি বিনাদোষে কিম্বা সামান্য দোষে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছি, তখন—"

লজ্জা পাইয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "তবে কি এখন সেই কথার কথা?"

"না ত! সে কথার কথা এখন অনেক দূরে।"

"কেন ভূপেশ! এখনও সেই কথা অনেক দূরে কি জন্য?"

"আরও অনেক কথা আছে, আরও অনেক কারণ আছে।"

"সে সকল কথার,—সে সকল কারণের নিষ্পত্তি হইবে কত দিনে?"

"কত দিনে, তাহা আমি কিরূপে জানিব? আমি জগতের ক্ষুদ্র জীব,

ক্ষুদ্র কীট। যিনি বিশ্বসংসারের মাথার উপর বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারে কি মানবচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়? মানবচক্ষু তবে কি দেখে? জীবজন্তু দেখে, যদি জীবজন্তু হাবা হয়, মানুষ দেখে, বৃক্ষলতা দেখে, আকাশে সূর্য্য দেখে, চন্দ্র দেখে, নক্ষত্র দেখে, আরও অনেক প্রকার ভোজবাজী দেখে। কিন্তু এই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা যে একজন আছেন, তাঁহাকে দেখিতে পায় না।"

আমরা বাঙ্গালা দেশে থাকি, আশ্বিন মাসে দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি দেখি;—ঘটে, পটে, মাটীতে, পাথরে কতই দেবদেবী দেখি, বৃন্দাবনের ছবিতে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি, নবদ্বীপের ছবিতে নিতাইচৈতন্যমূর্ত্তি দেখি, মক্কার ছবিতে মহম্মদকে দেখি, জুডিয়ার ছবিতে মেরীমার ক্রোড়ে খ্রীষ্টমূর্ত্তি দেখি, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর যে কে, তাঁহাকে দেখিতে পাই না; দেখি দেখি মনে করি, ভুলিয়া যাই।

"কেন ভুলিয়া যাই জগদীশ! তোমারে কেন আমরা ভুলিয়া যাই? তুমি জান, আমরা জানি না। মায়া! মায়া কে? তুমি সর্ব্বময়, মায়ারূপে তুমি জগতের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দিতে পার, মায়াখেলা দেখাইয়া মানুষের চক্ষে ধাঁধা দিতে পার, কিন্তু বিশ্বনাথ! আমি অবলা, জগতে একমাত্র তুমি আমার সম্বল, আর এই ভূপেশচন্দ্র।—উঃ!"

দয়া কর দয়াময় অধিনী দাসীরে।
তোমার চরণপদ্ম ধরি আমি শিরে॥
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি জগত ঈশ্বর।
তোমার পালিত এই বিশ্ব চরাচর॥
তবে কেন দিবানিশি কাঁদিতেছে দাসী?
আর কাঁদিবে না প্রভু! কৃপা অভিলাষী॥
হৃদয়েতে দেখিতেছি শ্রীপদ তোমার।
সর্ব্বময়! তুমি সর্ব্ব, তুমি সর্ব্বসার॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু করি নমস্কার।
কৃপা করি রক্ষা কর ভূপেশে আমার॥"

দিন চলিয়া গেল, রাত্রি চলিয়া গেল, আবার এক নূতন প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাতে আকাশের বর্ণ কত রূপ ধারণ করে, সকলের চক্ষু তাহা দেখিয়া থাকে। যাহার হৃদয়ে সুখপ্রবাহ, দুঃখপ্রবাহ প্রবাহিত, তাহার হৃদয়ের শোণিত যেন প্রভাতে আকাশে উঠিয়া সূর্য্যকে রক্তবর্ণ করে। কিন্তু সে হৃদয়ের রক্ত ত যায় না, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া হৃদয়কে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

পরমেশ্বর! তোমার সৃষ্টিসংসারে কোথায় কি আছে, কেহ জানে না। রামায়ণে আমরা পাঠ করিয়াছি, লঙ্কায় রাক্ষস থাকিত, তাহারা মানুষ ধরিয়া খাইত, একজন মুনি বলিয়াছিলেন, লঙ্কায় রাক্ষস থাকে না, কালসর্প থাকে। আর এক জন কহিয়াছিলেন, সর্প থাকে না, ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র থাকে। তৃতীয় ব্যক্তি কহিয়াছিলেন, সিংহলের সমুদ্রে স্নান করিবার সময়ে মানুষকে হাঙ্গরে ধরিয়া খায়, কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? কিছুই বুঝিতে পারি না। আমাদের মহাহিতৈষী মেকলে সাহেব কহিয়াছিলেন, মহিষের যেমন শৃঙ্গ, ব্যাঘ্রের যেমন নখর, ভীমরুলের যেমন হুল, বাঙ্গালীর তেমনি অস্ত্র প্রতারণা। কিন্তু দিন দিন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বাঙ্গালীর অস্ত্র আর মেকলে সাহেবের দেশের অস্ত্র কত দূরে দূরে ক্রীড়া করে।

আসল কথা ত্যাগ করিয়া আমরা অনেক দূরে আসিয়াছি। অপ্সরা-সুন্দরী ভূপেশচন্দ্রকে নিকটে পাইয়াছেন। মনে আনন্দ আছে, কত দিনের পর কত দিন, উভয়ে তাহা বুঝিতেছেন। তথাপি একটু ভয় আছে। যেন নৃত্য করিয়া উঠিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "কারা তোরা? দূর হ! আমার ভূপেশচন্দ্র আমারই থাকিবে। যত দিন বিবাহ না হয়, পক্ষীশাবকের মত পক্ষাচ্ছাদনে ভূপেশকে আমি ঢাকিয়া রাখিব। কাহার সাধ্য ইহার অঙ্গ স্পর্শ, কেশ স্পর্শ করিতে পারে? দেখিতেছিস্, দেখিতেছিস্, আমি মুক্ত-কেশী। আয়, সম্মুখে আয়, যদি ভরসা থাকে, যদি জীবনে ভয় না থাকে, সম্মুখে আয়! আমার হস্তে এই ভীষণ—না না, ভীষণ বলিতে নাই, আমার হস্তে এই দস্যুঘাতী খড়্গ। ভূপেশ! ভূপেশ! আমি অবলা; রাজকুমারী হইয়াও ভিকারিণী, কিন্তু নাথ! আমি ভিকারিণী হইব কেন? নেত্রসমীপে

তোমারে দর্শন করিলে আমারে আমি রাজ্যেশ্বরী মনে করি। ভূপেশ! কারা ওরা? আমারে বিভীষিকা দেখাইতেছে। হাসি পায়। ভূপেশ! জান তুমি, তোমার জন্য আমি জগৎসংসারকে বিসর্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু আমি অবলা, আমি যদি তোমারে রক্ষা করিতে না পারি, আমার এই খড়্গ,—ভীম খড়্গ!"

কোথাকার কথা কোথায় আসিয়া পড়িল। অপ্সরাসুন্দরী কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন? দস্যুরা ত কেহ উপস্থিত নাই, ছিল, কিন্তু এই মানবীর মহাকালীরূপ দেখিয়া তাহারা সরিয়া গিয়াছে। বৈরনির্যাতন আর প্রতিহিংসার কি শেষ নাই? থাকে যদি, নরকে থাকিবে, পৃথিবীতে থাকিবে না।

এইটী হয় ত স্ত্রীলোকের কথা। পাঠক মহাশয় হয় ত মনে করিবেন, আমরা হয় ত পৃথিবী ছাড়া আর কোন নূতন নরকের কথা কহিতেছি। অসম্ভব; নরক যদি থাকে, আমাদের শাস্ত্রে অনেক নরকের নাম আছে। সত্য নরক যদি কিছু থাকে, তাহা কিরূপে বুঝাইয়া দিব? একখানি দর্পণ আনয়ন কর, সেই দর্পণে সর্ব্ব নরকের ছায়া পড়িবে। যাঁহারা সংসারে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করিবেন, দর্পণে কেবল মুখ দেখা যায়। কিন্তু আমরা যে দর্পণের কথা কহিতেছি, সে দর্পণ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও বড় দর্পণ। তাহাতে যে কি কি ছায়া পড়ে, তুমি আমি হয় ত দেখিতে পাই না, কিন্তু যাঁহারা ভাবুক, যাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্বভাবের আবির্ভাব আছে, তাঁহারা এক দুই তিন করিয়া অনন্তব্রহ্মাণ্ড সেই দর্পণে দেখিতে পান।

ঐ যা! আকাশে বুঝি নক্ষত্র ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহারা কোথায় মিলাইয়া গেল? এ খেলা কাহার খেলা? এ ইন্দ্রজাল কাহার ইন্দ্রজাল? আমরা বুঝিতে পারি না। বীডনষ্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারের কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিমন্যুবধ অভিনয়ে কহিয়াছেন,—নিজে কহেন নাই, রাজা দুর্য্যোধনের মুখ দিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বলাইয়াছেন, গুরুদেব! প্রভাতে যেমন একে একে আকাশের নক্ষত্রেরা খসিয়া পড়ে, এই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে আমার সৈন্যেরাও তেমনি একে একে খসিয়া পড়িতেছে। বড় চমৎকার কথা।

প্রভাতে নক্ষত্র খসিয়া পড়ে, কবিবর গিরিশচন্দ্রের কবিতা ভিন্ন আমরা অনন্ত সাগরসদৃশ সংস্কৃতশাস্ত্রের আর কোথাও তেমন কথা পাঠ করি নাই! অপ্সরাসুন্দরী জ্ঞান হইয়া অবধি অতি অল্প কথা কন। কিন্তু আজ অনেক কথা কহিতেছেন। তাঁহার মনের কথা তিনি নিজে বুঝাইয়া দিতে পারিতেছেন কি না, তিনি বোধ হয় না জানিতে পারেন। কেন না, এমন অনেক লোক আছে, তাহারা অনেক কথা কয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে অর্থ বলিতে পারে না। শুদ্ধ অর্থের কথাই বা কেন, যে যে কথা বলে, তাহা ধারণা করিতে পারে না। বিকারপ্রাপ্ত রোগীর প্রলাপ যেরূপ, বহুভাষী লোকের বক্তৃতাও সেইরূপ। আশাকে আমরা চপলা বলিতেছি কেন? আশার যদি জীবন থাকে, তিনি হয় ত এ বিশেষণ শুনিয়া হাসিবেন। ব্যাকরণের মর্য্যাদা রাখিলে চপলাকে বিশেষণ বলা যায় না, কিন্তু যদি একটু ঘুরাইয়া লওয়া যায়, চপলা বিশেষ্য পদ। সেই চপলারে যদি আশার বাম দিকে অর্থাৎ পশ্চাতে রাখি, আশা চপলা না বলিয়া যদি চপলা আশা বলি, সেই বিশেষ্য পদ তখন বিশেষণ পদে বাচ্য হইবে। ব্যাকরণ অশুদ্ধ হইবে না। কিন্তু আমরা তাহা বলি না। আমরা বলিব, আশা-চপলা। অপ্সরাসুন্দরী বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ের মত অনেক কথা কহিতেছেন। সে সকল কথায় জগতের জন্মদায়িনী প্রকৃতি সতীর মহিমা রক্ষা হইতেছে সত্য, কিন্তু সে সকল কথার তাৎপর্য্য সকলে বুঝিতেছেন না। আমি যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে বুঝাইয়া দিতাম, অপ্সরা কি কথা কহিতেছেন। এক দল দস্যু প্রবেশ করিল।

খড়্গহস্তে নৃত্যকালী নৃত্য করিতেছেন। কথা কহিতেছেন, কি? "কারা তোরা? আয় তোরা! আমার ভূদেবের গাত্রে যদি একটী মাত্র অঙ্গুলী স্পর্শ করিস্, এই অবলার অসি তোদের শোণিত পান করিবে। জানিস্ তোরা, পদ্মিনী সতী, জানিস্ তোরা, সরোজিনী সতী, জানিস্ তোরা, সাবিত্রী সতী, যে বংশে তাহাদের জন্ম, সেই বংশে এই অপ্সরা-সুন্দরীর জন্ম। চিতোরে কত সতী যবনের ভয়ে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন। আলাউদ্দীন! আকবর সাহ! তোমরা কোথায়? দেখ আসিয়া, এই অপ্সরাসুন্দরী এই বিশ্বসংসারে আজ প্রলয় উৎপাদন করিতে পারে, ক্ষুদ্র

প্রলয় নয়, মহাপ্রলয়। চিতোরের সতীরা অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সতীত্বকে অনাদর করেন নাই। সেই জন্য উদয়পুর আজ অন্ধকার। অস্ত্র ধারণ করিতে হয় নাই, কেবল বাক্য অস্ত্রে যমরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাবিত্রী সতী রাজা সত্যবানের নূতন জীবন আনয়ন করিয়াছিলেন। আমার ভূপেশচন্দ্র ত বাঁচিয়া রহিয়াছেন, যমরাজের সহিত ত আমারে যুদ্ধ করিতে হইতেছে না, কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যে দিনে আমাদের জননীরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মাথার চুল কাটিয়া বীর কুমারগণের ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সে দিন অনেক দিনের কথা। কিন্তু সেই দিনের সূর্য্য যেন আমার চক্ষের কাছে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি অপ্সরাসুন্দরী, এ নাম কে রাখিয়াছিল? আমার মা! মা আমার কোথায়? উঃ! মা আমার স্বর্গবাসিনী। পিতার দুহিতা আমি। সেই পিতা আমারে অভিসম্পাত করিয়া গিয়াছেন। তবে,—তবে,—যদি আমি সতীনাম ধরি, এখনও ত আমি বিবাহ করি নাই;—তবুও যদি আমি সতীনাম ধরি,—তোরা কি আমারে পরাস্ত করিতে পারিবি? কখনই না! আমার হাতে খড়্গ আছে; তাহা তোরা দেখিতেছিস্। কিন্তু আমার হৃদয়ে কি আছে, তাহা কি তোরা জানিস্?"

ওই, ওই, ওই যেন চপলা খেলিয়া।
মানস উজল করি যাইছে জ্বলিয়া॥
দেখিতে কি পাস্ তোরা? হৃদয়ের ধন।
হৃদয়ের ধনে করি হৃদয়ে ধারণ॥
যাঁর বিশ্ব তাঁরি এই অপ্সরাসুন্দরী।
ভক্তিভাবে সেই পদে প্রণিপাত করি॥
দূরে যারে দুরাচার পাপিষ্ঠ পামর।
সাক্ষাতে তোদের সনে সাক্ষাৎ সমর॥
অবলা বলিয়ে বুঝি উপহাস কর?
এই শক্তি মহা শক্তি ধর ধর ধর॥

আমার ভূপেশচন্দ্র, আমি রাখিয়াছি।
রাখিতে হৃদয়চাঁদে দাঁড়াইয়া আছি॥
ঘুরিছে তারকামালা গগনমণ্ডলে।
দেখি না ত? ছায়া দেখি জলনিধি জলে॥
ভীম খড়্‌গধারী আমি অপ্সরাসুন্দরী।
ব্রহ্মাণ্ডের রিপুদলে তৃণজ্ঞান করি॥
কারা তোরা দুরাচার! কোথা এসেছিস্?
শমন ভবনে কেন আজি পশেছিস্?
উন্মাদিনী আজি আমি অপ্সরাসুন্দরী।
দাঁড়াইয়ে আছি দ্বারে এই খড়্‌গ ধরি॥
ত্রিসংসারে কারে আমি নাহি করি ভয়।
ক্ষত্রিয়কুমারী আমি অভয় হৃদয়॥
রেখেছি বুকের ধন লুকাইয়ে বুকে।
কে পারে আসুক্ দেখি আমার সম্মুখে॥
আমার ভূপেশচন্দ্র হৃদয়-রতন!
তাঁরি পাদপদ্মে আমি সঁপিয়াছি মন॥
তোরা কি পারিবি তাহা করিতে হরণ?
প্রাণপণ রণক্ষেত্রে প্রাণ সমর্পণ॥
এই পণ করিয়াছে অপ্সরাসুন্দরী।
না পারি যদ্যপি তবে বৃথা খড়্‌গ ধরি॥
দেখ দেখি এলোকেশী দাঁড়াইয়া আছি।
যারে রাখিবার তরে পণ করিয়াছি॥
রাখিব তাহারে বুকে লুকায়ে রাখিব।
প্রাণ যদি যায় তবু ছাড়িয়া না দিব॥

ছোট কথা বুঝি দস্যু? তা নয় তা নয়।
পাষাণে গঠিত আছে আমার হৃদয়॥
অসি করে আমি নারী অপ্সরাসুন্দরী।
ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে পারি যদি ইচ্ছা করি॥
তোরা কারা? দুরাচার! সম্মুখে আমার।
পলকে করিতে পারি সমস্ত সংহার॥
তবে কেন ক্ষমা করি? নারীজাতি আমি!
স্নেহ দয়া দিয়াছেন ত্রিলোকের স্বামী॥
সেই হেতু——”

হুহুঙ্কার গর্জ্জনে একজন দস্যু কহিয়া উঠিল, “চুপ! নারীজাতির এত অহঙ্কার? এ অহঙ্কার চূর্ণ করিতে আমরা বেস জানি।”

“জানিস্ তুই পাপাত্মন্! জানিস্! আমার চক্ষে আগুন জ্বলে। সে আগুনে,—কীট পতঙ্গ আগুনে ভস্ম হয়, কিন্তু আমার চক্ষে যে আগুন জ্বলে, সে আগুনে তোরা! তোরা! তোদের মত লক্ষ লক্ষ পাষণ্ড দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয়। আর দেখ্, আমার এই হস্তের খড়্গ,—মুক্তকেশী আমি, রণকালীর মত এলোকেশী আমি, আমার এই খড়্গ রক্ত ভালবাসে। ছোট ছোট কথা কহিলাম, গ্রাহ্য হইল না, কিন্তু দেখ্ দেখি দুরাত্মন! অবলার হস্তের এই খড়্গ কি দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে না পারে!”

“যত দূর সাধ্য থাকে, কর, কিন্তু এই পলাতককে কখনই আমরা জীবন থাকিতে ছাড়িব না।”

“তোরা কি কথা বলিতেছিস্?”

“আসামী ধরিয়া লইয়া যাইব।”

“আসামী তোদের কে?”—হাস্য করিয়া অপ্সরা কহিলেন, “অসিকে যদি ভয় থাকে, তফাতে,—তফাতে,—তফাতে গিয়া দাঁড়া। অপ্সরা-সুন্দরী বাঁচিয়া থাকিতে—যে নামে কেন হোক্ না, আমার ভূপেশচন্দ্রকে কেহই স্পর্শ করিতে পারিবে না।”

একজন দস্যু ভীমতর গর্জ্জন করিয়া হুহুঙ্কারে কহিল, "আর তোরে যদি আমরা মেরে ফেলি?"

"তাহা হইলে ভূপেশচন্দ্র—"

"বল না কি বলিতেছিলে?"

"বলিব! বলিব! উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর! আমারে তোরা মারিতে চাস্? উঃ! কি লজ্জা! কি ঘৃণা! ক্ষত্রিয়কুমারীকে,—খড়্গাধারিণী ক্ষত্রিয়কুমারীকে যাহারা মারিয়া ফেলিতে চায়, তাহাদের মস্তকে এই অপ্সরাসুন্দরী শত শত সহস্র সহস্র পদাঘাত করে। দেখ্, এখনও আমার হাতে এই খড়্গ। আমি ছোট মেয়ে হইতে পারি, আমার এই খড়্গ কখনও ছোট হইবে না। অপ্সরাসুন্দরী বাঁচিয়া থাকিতে——

খণ্ড খণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব সংসার।
কে আসে আসুক দেখি কি সাধ্য কাহার!
তুচ্ছ জ্ঞান করি আমি আমার জীবন।
আমার ভূপেশচন্দ্র জীবন জীবন॥
আয় দেখি! কে পারিস্, আয় মোর কাছে।
বিনাশিব সৃষ্টি আজি দেবীখড়্গ আছে॥
কে তিনি, জানিস তাঁরে? দেবী মহামায়া।
যাঁহার মায়ার বলে জ্বলে বিশ্বছায়া॥
সেই মহামায়া দেবী হৃদয়ে আমার।
বিরাজেন অহরহ নাশি অন্ধকার॥
তারিণী করুণাময়ী তাঁহারি প্রসাদে।
যুঝিতেছি, হাসিতেছি, মানস আহ্লাদে॥
পাষণ্ড পামর দস্যু! এত অহঙ্কার?
আমার ভূপেশচন্দ্রে করিবি সংহার?"

"তুই ছুঁড়ি সোরে যা। আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমরা অবশ্য পালন করিব।"

"কি? এখনও এত দূর সাহস? কথায় কথায় ক্ষমা করিতেছি, কিন্তু আর একটু বিলম্ব হইলে আমি আমার আত্মার উপর কর্তৃত্ব রাখিতে পারিব না। দেখিতেছিস্, আমি কে? দেখিতেছিস্, আমার কি মূর্ত্তি? আমি সৃষ্টিসংহারিণী, পলক মাত্রে আমি তোদের নিপাত সাধন করিতে পারি। করিতেছি না কেন? একটু বিশ্বদয়ার অনুরোধে। আমারে লংঘন করিয়া যদি তোরা ভূপেশচন্দ্রকে ধরিতে পারিস্, জানিস্, জানিস্, জানিস,—

বৃথা নাম ধরি আমি অপ্সরাসুন্দরী।"

মহাকালী যেরূপে শুম্ভনিশুম্ভকে সংহার করিয়াছিলেন, রসনা বিস্তার করিয়া যেরূপে রক্তবীজ বিনাশ করিয়াছিলেন, আমাদের নায়িকার এখন ঠিক সেই রূপ। কিন্তু কেন বল দেখি? তিনি ছিলেন দেবী, ইনি হলেন মানবী, দেবীর সঙ্গে মানবীর তুলনা দিই কেন?

কারণ আছে। পর্ব্বতের রণক্ষেত্রে মহাদেবী কালিকা যে কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, নরলোকে সচরাচর সে কার্য্য কেহই করিতে পারে না। কিন্তু অপ্সরাসুন্দরী সেই কার্য্য দেখাইতেছেন। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমাদের অপ্সরাসুন্দরী তবে বুঝি দেবকন্যা?

না ত, অপ্সরাসুন্দরী দেবকন্যা নয়,—মানুষের কন্যা। কিন্তু সতীত্ব নামে এমনি একটী বস্তু আছে, দেবতারাও তাহার মর্ম্ম ভাল জানেন না। কেন জান? ইন্দ্রচন্দ্র, এমন কি, প্রজাপতি ব্রহ্মাও এক এক সময় সতীর সতীত্বের অনাদর করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অপ্সরা, যদিও কুমারী, যদিও বিবাহ হয় নাই, তথাপি দেবী অপেক্ষা দেবী। এই দেবীর শরীরে দিবারাত্রি চন্দ্রসূর্য্যের আলো জ্বলে। নিশ্বাসে নিশ্বাসে পবনদেবের খেলা হয়। চক্ষের দীপ্তিতে নক্ষত্র হাসে। এমন দেবীমূর্ত্তি কি আমরা পুরাণে দেখিতে পাই? আজ কাল এমন লোক অনেক হইয়াছে, পুরাণে তাহাদের বিশ্বাস হয় না। আশা-চপলার পাঠক মহাশয়দের মধ্যে তেমন লোক যদি কেহ থাকেন, তাঁহারা দেখিবেন,—অন্ততঃ আমার অনুরোধে

তাঁহারা বুঝিবেন, স্বর্গের দেবী অপেক্ষা অতি পবিত্র, পরম পবিত্র অপ্সরা-সুন্দরী দেবী। অসি ধারণ করিয়াও পৃথিবীর মত শান্ত।

লোকেরা আবার হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল। একটু শান্ত দেখিলেই দুষ্ট লোকে অধিক দুরন্ত হয়। ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ। হুহুঙ্কার করিয়া সেই সকল লোক কহিল, "বাহির করিয়া দাও। তুমি স্ত্রীলোক, তোমাকে আমরা স্পর্শ করিতে পারিব না, অথচ আসামীকে ধরিতে হইবে। তুমি সরিয়া যাও।"

"কি? আমি সরিয়া যাইব? তোমরা ভূপেশচন্দ্রকে স্পর্শ করিবে? তাহা যদি সত্য হয়, ইন্দ্রের বজ্র ঘুমায় কেন? ভগবতীর শক্তি অচলা কেন? মহাদেবের ত্রিশূল নিশ্চল কেন? ধর্ম্মরাজের দণ্ড নিশ্চেষ্ট কেন? পারি না, পারি না, পারি না, আর পারিলাম না। পতঙ্গ হইয়া স্ব ইচ্ছায় তোমরা এই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতে আসিয়াছ। পুড়িয়া মরিবে, আমি কি করিব? স্ব ইচ্ছায় যাহারা জীবন পরিত্যাগ করিতে চায়, তাহাদের রক্ষা-কর্ত্তা কেহই নাই। আমি সরিয়া যাইব?" মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "আমি সরিয়া যাইব?" স্বর আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। কহি-লেন, "আয় তোরা! আর নিস্তার নাই। এতক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি, আর ক্ষমা করিতে পারিলাম না, আয় তোরা!"

দলের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল, "এই ছুঁড়ীকে কেটে ফেল!"

হাস্য করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "তাহা হইলে ভাল হয়।"

আর এক জন কহিল, "এ ছুঁড়ীর বড় অহঙ্কার!"

অপ্সরা কহিলেন, "আমার যদি অহঙ্কার থাকে, ভূপেশচন্দ্রকে রক্ষা করিব। আয় তোরা! কে আমারে কাটিয়া ফেলিতে চাহিতেছে? সম্মুখে আনিয়া দেখা। উঃ! রাত্রি কত?"

"কে জানে? তোমার কি ঘুম পায় না?"

"আমি বহু দিন ঘুমাই নাই।—আমার ঘুম নাই। কে আমারে কাটিতে চাহিতেছে, তাহারে দেখিব। দেখিয়া হয় ত জন্মের শোধ ঘুমাইব, নতুবা তাহাকে জন্মের শোধ ঘুম পাড়াইব।"

ঘন ঘন হুহুঙ্কার গর্জ্জনে পাঁচ সাত জন অস্ত্রধারী লোক গৃহমধ্যে

প্রবেশ করিতে আসিল, অসিধারিণীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু সে কন্যা ত বাঙ্গালীকন্যা নহে, তাহার শরীরে ক্ষত্রিয় শোণিত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, কে কোথায় যাইবে? ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধ, ক্ষণে ক্ষণে শান্তি। রাবণের অশোকবনে সীতাদেবীর ক্রোধ ছিল না; বিরাট রাজের অন্তঃপুরে দ্রৌপদী সতীর ক্রোধ ছিল না, মহারণ্যে পতিহারা হইয়া দময়ন্তী সতির ক্রোধ ছিল না, আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রধানা নায়িকা অপ্সরাসুন্দরীরও ক্রোধ ছিল না; কিন্তু তখন তখন এক প্রকার শাপ দেওয়া ছিল। সেই শাপে লোকেরা ভস্ম হইয়া যাইত, যাইত কি না যাইত, শাস্ত্র তাহা বলিয়া দিতে পারে, কিন্তু অপ্সরাসুন্দরী শাপ দিতে জানিতেন না। তিনি মুক্তকেশে লম্ফ প্রদান করিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কালসর্পিণীর লাঙ্গূলে পদার্পণ করিলে, সে যেমন ফণা ধরিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠে, সেইরূপে গর্জ্জন করিয়া আমাদের অপ্সরাসুন্দরী এক জন প্রবেশকারীর গলদেশে অসি প্রহার করিলেন। গর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, "আর আমি ক্ষমা করিতে পারিব না। যাহাদের এত দূর স্পর্দ্ধা তাহারা প্রতিফল ভোগ করুক।" একে একে ছয় সাত জনের দেহ হইতে ছয় সাতটী মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমে পড়িল। অপ্সরাসুন্দরী নাচিতে লাগিলেন! আশ্চর্য্য একটী স্ত্রীলোক এতদূর বীরত্ব দেখাইল, কিন্তু ভূপেশচন্দ্র সম্মুখে আসিতে পারিলেন না। অথচ তিনি সেনাদলের সৈনিক পুরুষ! ধিক সৈনিক নামে। একবার ফরাসী রাজ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তখন রুসিয়ায় ছিলেন। ফ্রান্সের সেনাপতি সমস্ত অস্ত্রে সস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন, সৈন্যগণ! অগ্রসর হও! সেনাপতি অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সৈন্যগণ অগ্রসর হইবে, এখানেও তাহাই। ভূপেশচন্দ্র অগ্রসর হইতে পারিলেন না, অপ্সরাসুন্দরী অগ্রসর হইলেন, সাত মুণ্ড ভূমিতলে গড়াগড়ি।

এই ঘটনার সাত দিন পরে, ভূপেশচন্দ্র কোথায় চলিয়া গেলেন, অপ্সরাসুন্দরী কোথায় গেলেন, কেহই জানিতে পারিল না।

দ্বাত্রিংশ প্রবাহ।

বিজয়কেতু।

কাহার তনয়া এই নবীন সুন্দরী।
আমারি দুহিতা বুঝি, আয় কোলে করি॥

আর্য্যরত্ন।

অনেক পশ্চাতে ফিরিয়া আসিতে হইল। যে রাজ্যে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির, যে রাজ্যে অপ্সরাসুন্দরীর পিতৃপ্রাসাদ, উদয়পুরের এক জন অধীন রাজা বিজয়কেতু সেই রাজ্যের প্রান্তভাগে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। জনশূন্য প্রান্তর, ধারে ধারে সারি সারি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, সেই সকল বৃক্ষে সবুজবর্ণ শুকপক্ষীরা নিশাকালে বাসা করিয়া থাকে, রজনী প্রভাতে শাবকগুলিকে বাসায় রাখিয়া, আহারান্বেষণে দিগ্‌দিগন্তরে উড়িয়া যায়। সেই সকল বৃক্ষাবরণে শিবিরের চতুর্দ্দিকে সুশীতল ছায়া। রাজা বিজয়কেতু শিবিরে বসিয়া আছেন, অদূরে এক জন মন্ত্রী। রাজার দক্ষিণ ভাগে এক বীর মূর্ত্তি; বোধ হয় সেনাপতি। কটিবন্ধে কোষবদ্ধ তরবারি।

যে রাত্রে অপ্সরাসুন্দরী চামুণ্ডার মন্দির হইতে চলিয়া আইসেন, তাহার পর দিন প্রভাতে রাজা বিজয়কেতুর সেনাপতি সদর্পে রাজার নিকট কহিয়াছিলেন।—

"মহারাজ! গিয়াছিনু ভেটিতে তাহারে।
লুকাইয়ে ছিল দুষ্ট চামুণ্ডামন্দিরে।
সঙ্গিনী তাহার ছিল এক বীরাঙ্গনা।
কে যে সে, জানি না রাজা, সাহসে তাহার—
পরিহার মানিয়াছি। আর কি কহিব?

নাশিয়াছে পঞ্চবীরে একা মুক্তকেশী ;—
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে মুক্তকেশী যেন—
স্বর্গদেবী, সুরবালা, উগ্রচণ্ডা ভীমা।
শুধু বীরাঙ্গনা নয়, সেই মুক্ত কেশে,—
বিজলে রূপের ছটা ; জলদের কোলে
স্বর্ণময়ী ক্ষণপ্রভা, যথা সৌদামিনী।
ক্ষমা চাহি মহারাজ! চরণে তোমার,
প্রদানো অভয় ভিক্ষা, এই ভিক্ষা করি।
পরিহরি ভয়, লজ্জা, মান অপমান,
রাজোচিত মহিমার সম্ভ্রম সম্মান,
পরিহরি আজি দেব! তোমার সমীপে।
শুধু বীরাঙ্গনা নয়, পরমাসুন্দরী,—
তেমন সুন্দরী নারী না হেরি জগতে ;
মদন মোহিত হয় সে মোহিনী রূপে।
এলো চুলে খাঁড়া হাতে দাঁড়াইলা যবে—
সে বড় সুন্দরী নারী আগুলিয়া পথ,
আমাসবাকার আগে মহাদর্পভরে,—
কি বলিব মহারাজ! কাঁপিনু তরাসে।
দেবী চামুণ্ডার খাঁড়া মানবীর করে,
শোভিল, ঝকিল যেন, বাসন্তী গগনে—
ঝকি চলে ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরা চপলা।
কাটিয়াছে পঞ্চ মুণ্ড বাকী আছে কত,
আজি আরতির পূর্ব্বে হবে সমাধান।”

"বল কি সেনাপতি? স্ত্রীলোকের এত দূর দুঃসাহস?" সবিস্ময়ে রাজা বিজয়কেতুর এই সবিস্ময় প্রশ্ন।

"যদি স্বচক্ষে দর্শন করেন, তাহা হইলে প্রশ্ন করিতে হইবে না, উত্তর শুনিতে হইবে না, চক্ষে চক্ষে পরিচয়।"

"বটে?"

"হাঁ মহারাজ! সে সৌন্দর্য্যের, সে লাবণ্যের উপমা নাই।"

"বল কি?"

"সত্য মহারাজ!"

"তবে আজ আরতির পূর্ব্বে আমি স্বয়ং সেই পরমাসুন্দরী গর্ব্বিতা বীরাঙ্গনাকে দর্শন করিব।"

"ধন্য মানিলাম আমি পূরিল বাসনা,—
রাজভোগ যোগ্য বস্তু সেই বীরাঙ্গনা॥"

"না সেনাপতি! আমি সে কথা বলিতেছি না। ক্ষত্রিয় শোণিত যে হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, সে হৃদয় অকারণে কন্দর্প প্রতাপে প্রলোভিত হয় না। বীরাঙ্গনা আমাদের কুলের অলঙ্কার,—কুলের অহঙ্কার। মাথার চুল কাটিয়া দিয়া যাহারা এক দিন আমাদের পিতৃপুরুষের ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিতে দিয়াছিল, রণক্ষেত্রে যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, প্রাণশূন্য হইয়া ঢালে উঠিয়া ঘরে আসিও, এই উপদেশে যাহারা এক দিন গর্ভজাত সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল, তাহাদের গৌরব অসামান্য। ভাগ্যবলে আজ সন্ধ্যার পর—সন্ধ্যার পর কেন—বহুদিনের পর চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে সেই জাতির বীরাঙ্গনা আমি দর্শন করিব। সেই বীরাঙ্গনা আবার পরম রূপবতী।"

"হাঁ মহারাজ! আপনার এই শেষের কথাটাই যথার্থ।"

"ধিক তোমাকে! প্রলোভনে আমাকে ভুলাইতে চাও? জানিতাম, তুমি বীরপুরুষ; এখন জানিলাম, তুমি ক্ষুদ্রাশয়, নীচাশয়, কাপুরুষ।"

"না মহারাজ! আমি নীচাশয় নই। যদি একবার তাহাকে দেখেন, তাহা হইলে :—

দেখিবেন মহারাজ! রূপের আধার।
ইচ্ছা হবে বশীভূত হইতে তাহার!"

একজন দূত আসিয়া উপস্থিত।

"কি সংবাদ?"

"অপরাধ ক্ষমা হয়;—তরুতলে একটী কামিনী!"

"কামিনী?"

"মহারাজ!"

"কি প্রার্থনা?"

"রাজদর্শন।"

মুহূর্ত্তকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া রাজা দিবাকর বামপার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মন্ত্রিবর! এ কি প্রশ্ন! স্ত্রীলোক তরুতলে! সাক্ষাৎ করিতে চায়!"

মন্ত্রী কহিলেন, "ইহা আশ্চর্য্য কি মহারাজ! স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, রাজদর্শনে সকলেরই সমান অধিকার।"

"তাহা হইতে পারে, কিন্তু আমি এ দেশের রাজা নই,—এদেশের স্ত্রীলোকের আমার নিকটে কি প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন না থাকিলে কেহ কি আসিবার আশা করে মহারাজ?"

"তবে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

"এই শিবিরের কোন নির্জ্জন কক্ষে।"

"তবে আসিতে বল।"

দূতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া রাজমন্ত্রী আদেশ করিলেন, "যে কামিনী রাজদর্শন প্রার্থিনী, অভ্যর্থনাগৃহে তাহাকে আনয়ন কর।"

বার্ত্তাবহ চলিয়া গেল। রাজা অভ্যর্থনাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে রক্তবসনে অবগুণ্ঠিতা একটী যুবতী দূতঅনুপদে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইল। যথাযোগ্য সমাদরে রাজা তাহাকে দূরস্থ আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। রমণী অবনত মস্তকে রাজসম্মানে নমস্কার

করিলেন, কিন্তু অনুমতি পালন করিতে পারিলেন না। গৃহভিত্তিতে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুবতী অশ্রুমতী, অবগুণ্ঠন-বসনে বদনমণ্ডল আবৃত, রাজা তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। প্রশান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্যাণি! আমার নিকটে তোমার কি প্রয়োজন?"

অশ্রুমতী অবলা সসঙ্কোচে কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, "একটী ভিক্ষা।"

"বল।"

কথার উত্তর না দিয়া অঙ্গুলী হইতে একটা হিরণ্ময় অঙ্গুরী উন্মোচন-পূর্ব্বক কামিনী করতলে ধারণ করিলেন। ধীরে ধীরে রাজাসনের নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া সেই অঙ্গুরীটা রাজহস্তে প্রদান করিলেন।"

রাজা বিজয়কেতু গাত্রকম্পে, রোমাঞ্চিত কলেবরে এককালে বিস্ময়াপন্ন।

সুন্দরী কামিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজপদতলের ভূমি চুম্বন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া রাজা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝিলাম না। "এ অঙ্গুরী তোমাকে কে দিয়াছিল?"

"স্বর্গীয় পিতা।" ধীর মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "স্বর্গীয় পিতা।"

"তোমার পিতার নাম কি?"

"স্বর্গীয় উদয়সিংহ।"

রাজার শরীরে আবার রোমাঞ্চ হইল। চমকিতভাবে কম্পিত স্বরে দুইবার প্রশ্ন করিলেন, "তুমি চাও কি? তোমার প্রার্থনা কি?"

"একটী রাজপুত্রের জীবন। বিপদাপন্ন রাজপুত্র। মহারাজের রোষা-নলে দগ্ধপ্রাণ। সঙ্কটাপন্ন।"

"অঙ্গুরী প্রদান করিলে কেন?"

"ইহা ভিন্ন আর রক্ষার উপায় নাই।"

"কিরূপে জানিলে?"

"উপদেশ।"

"অঙ্গুরীতে কাহার নাম লেখা আছে, জান?"

"জানি।"—কত দিনের কত কথা মনে পড়িল।—চক্ষে নূতন জলধারা গড়াইল।—স্মরণ করিয়া—স্মরণ করিয়া মৃদুস্বরে কামিনী কহিলেন, "জানি।"

"কি নাম বল দেখি।"

"জগৎজয়ী জয়সিংহ।"

রাজা আবার শিহরিলেন। বিমগ্নভাবে আবার প্রশ্ন করিলেন, "এ অঙ্গুরী আমার হস্তে দিলে কেন? ইহার সহিত আমার কি সম্পর্ক?"

অশ্রুমতী যুবতী ব্যস্ত হস্তে বদনাবরণ উন্মুক্ত করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "দেখুন দেখি মহারাজ! অভাগিনীকে কি চিনিতে পারেন?"

উত্তর করিবেন কি, রূপ দেখিবাই রাজা বিজয়কেতু একবারে যেন জ্ঞানশূন্য।

সুমধুর করুণস্বরে যুবতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন দেখি মহারাজ! অভাগিনীকে কি চিনিতে পারেন? চুপ করিলেন কেন?"

রাজার চক্ষে জল পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুমতীর যুগল করপল্লব ধারণ করিয়া সস্নেহে শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক সকরুণ কণ্ঠে কহিলেন, "মা! স্নেহময়ি! কতদিন যে, তোরে হারাইয়াছিলাম, মনে পড়ে না। কিন্তু অপ্সরা! মা! অহরহ মূর্ত্তিরূপে মনে মনে তুই জাগিস্। আয় মা! একবার কোলে আয়!"

"সে কি মহারাজ! আপনার নাম মহারাজ বিজয়কেতু।"

"না মা! আমার নাম বিজয়কেতু নয়। আমিই সেই দেশত্যাগী হতভাগ্য উদয় সিংহ।—মা!—কেন ঐ অঙ্গুরী পাইয়াছিলে, তাহা তোমার মনে পড়ে?"

"পড়ে না, কিন্তু এই অঙ্গুরীর সঙ্গে একটা শ্লোক লেখা পত্র ছিল। সে পত্র এখনও আমার কাছে আছে। নিত্য নিত্য প্রাতঃস্নান করিয়া সেই পত্র আমি পাঠ করি।"

পুনরায় মস্তক চুম্বন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! অপ্সরা! সে পত্রে কি লেখা আছে?"

লেখা আছেঃ—

"লহ মা অপ্সরা! এই স্থবর্ণ অঙ্গুরী।
মহারাজ জয়সিংহ রাজ রাজেশ্বর,
দিয়াছিলা এই চিহ্ন পুরস্কার রূপে।
অভাগা উদয় সিংহ জন্মদাতা তব,
চলিল এ রাজ্য ছাড়ি, লহ মা অঙ্গুরী।
বিপদে পড়িবে যবে ইহার পরশে,
হইবে উদ্ধার, কভু রবে না বিপদ!
ঘোর বৈরী যদি কভু বিপাকে তোমারে—
প্রাণে সংহারিতে চায়, তথাপি কুমারি!
দয়া হবে তার চিতে ইহা দরশনে।
রক্ষাকালীরূপী এই রক্ষিকা অঙ্গুরী।"

"সস্নেহে কুমারীকে কোলে লইয়া নির্ঝরপ্রবাহে সেই স্থকোমল দেহ পুনঃপুন অভিষিক্ত করিয়া সস্নেহ বচনে মহারাজ কহিলেন, "মা! অপ্সরা! এ জন্মে আবার আমি যে এই চন্দ্রমুখখানি দেখিতে পাইব, এমন আশা মনে ছিল না। আশা আমাকে দেশে বিদেশে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিত, অপ্সরা বাঁচিয়া আছে। মায়াবিনী আশার সেই আশাবাক্যে ক্ষণে ক্ষণে আমার চক্ষে জল পড়িত, ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু শুষ্ক হইত, আশার আশাবাক্যে হৃদয় শীতল হইত, আবার ভুলিয়া যাইতাম।—আশা চপলা!"

একটু উদাস হাসি হাসিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "জান তুমি মহারাজ! আশা চপলা। সেই আশা নিত্য নিত্য আমারেও ঐরূপে প্রতারণা করে। কুহকিনী আশার মহিমা বুঝা মানুষের সাধ্য নয়; সে মহিমার মায়া দেবতারাও বুঝিতে পারেন না। আশা চপলা।"

বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া রাজা কহিলেন, "মা অপ্সরা! দশ বৎসর পরে আমি তোকে কোলে পাইলাম। আমি বিজয়কেতু নই। আমিই তোর স্বর্গীয় পিতা রাজা উদয়সিংহ।"

অপ্সরার চক্ষের জল এতক্ষণ এক স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল, এখন সেই চক্ষে শতস্রোত। ভূতলে জানু পাতিয়া অর্দ্ধ জ্ঞানে, অর্দ্ধ অজ্ঞানে পিতৃপদ মস্তকে ধারণ করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

গৃহ নিস্তব্ধ, রাজা নিস্তব্ধ, কুমারী অপ্সরা নিস্তব্ধ, প্রান্তরের বৃক্ষ-শাখায় পক্ষীশাবকেরাও নিস্তব্ধ। কেবল দুষ্ট পবন এক একবার শিবিরের গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপ্সরা! তুই কি মা ভিকারিণী? আমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিস্. কি তোর ভিক্ষা মা?"

"একটী প্রাণীর প্রাণ ভিক্ষা।"

"তথাস্তু।"

"তবে এখন আমি বিদায়।"

"কোথায়?"

"চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে।"

"তথাস্তু।"

পিতৃচরণে প্রণিপাত করিয়া অপ্সরাসুন্দরী বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন বেলা অনেক, সন্ধ্যার পর আরতি, তখন দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন না। মনে ভাবিতেছিল, ভূপেশচন্দ্র। ভূপেশচন্দ্র কোথায়, তাহাও তখন জানিতেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ চামুণ্ডাদেবীর পূজা করিতেন, অপ্সরাসুন্দরী অনাহারে তাঁহাদের গৃহে গৃহে গমন করিয়া প্রদোষ-ব্রতের নিমন্ত্রণ করিলেন। জীর্ণ কাষ্ঠসেতু পার হইয়া পিতৃভবনে একবার প্রবেশ করিলেন; ভাবিয়াছিলেন, সেখানে হয় ত ভূপেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন, আশা তাঁহাকে আশা দিয়াছিল, ভূপেশচন্দ্র আসিবে; কিন্তু রাজপ্রাসাদে ভূপেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না। শত্রুকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই সুপ্রশস্ত রাজপ্রাসাদে লুকাইয়া থাকিবার অনেক স্থান ছিল, একে একে কেন্দ্র, ছিদ্র, গহ্বরাদি সমস্ত গুপ্ত স্থান অন্বেষণ করিলেন, ভূপেশচন্দ্র নাই। দিনমণি মাতাল। একটু একটু করিয়া টলিতে টলিতে চলিতে চলিতে অস্তশৈলের শিখরে গিয়া সমস্ত রাত্রের মত শয়ন করিলেন। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ধ্যাসতী ধরাতলে

অবতীর্ণ। অপ্সরাসুন্দরী সমস্ত দিন আহার করিলেন না। অকপট সত্য ভালবাসা যেখানে, সেখানে কি আহারনিদ্রা মনে থাকে? নিদ্রা পিশাচী। ইহার হিংসা বড়। কাহার সঙ্গে হিংসা দেখায়? চিন্তার সঙ্গে। চিন্তার সঙ্গে অহরহ ঝগ্‌ড়া করে। নামটী কিন্তু ভাল, বিরামদায়িনী নিদ্রা। কিন্তু ঝগ্‌ড়ার সময় সে বিরামের বিন্দুমাত্র চিহ্ন থাকে না। চিন্তা বুঝি নিদ্রার সতীন? তাই বা কি করিয়া হয়! চিন্তা হইল কল্পনার কন্যা, আর নিদ্রা হইল শান্তিদায়িনী দেবদূতী। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বহুদূর অন্তর। এই উভয়ের মধ্যে জয় হয় কাহার? জয় পরাজয়ের কথা ঘরে ঘরে কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে জয় পরাজয় হয়, শান্তিধামে ত যুদ্ধ হয় না, হয় না ত কি? নিত্য নিত্য চিন্তার সঙ্গে নিদ্রার যুদ্ধ হয়। চিন্তার জয়, নিদ্রার পরাজয়। একটী ঋষিবাক্য আছে, নিদ্রাকে ছাড়িয়া সেই ঋষি চিন্তাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চিতা আর চিন্তা। এই উভয়ের মধ্যে চিন্তা গরীয়সী। কেন জান? চিতা কেবল নির্জীবকে দাহ করে, আর চিন্তা অহর্নিশি সজীবকে দগ্ধ করিয়া থাকে। সেই চিন্তানলে অপ্সরাসুন্দরী দগ্ধীভূতা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আরতির সময় প্রায় সমাগত। অপ্সরাসুন্দরী একাকিনী চামুণ্ডা-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে কেহই নাই। কেবল সেই পাষাণময়ী দেবী।

অপ্সরা উতলা। দেবালয়ে দীপ জ্বলিতেছে, নিমন্ত্রিত পুরোহিতেরা একে একে উপস্থিত হইতেছেন, মন্দিরের দ্বার অনাবৃত। অপ্সরা দেখিতেছেন, আকাশ, অপ্সরা দেখিতেছেন, নৃত্যকালী পাষাণময়ী দেবী, অপ্সরা দেখিতেছেন, প্রদীপের আলো, অপ্সরা দেখিতেছেন, ঘরে বাহিরে প্রকৃতির নৃত্য, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে আলো নাই, হৃদয়ে নৃত্য নাই, কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। এ ক্ষেত্রের কারণ প্রণয়ী-বিরহ।

আকাশের নক্ষত্রেরা হাসিতেছে, জলে কুমুদিনী হাসিতেছে, গাছে গাছে জোনাকি পোকারা হাসিতেছে, গৃহস্থগৃহে ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে নবীন প্রণয়ী নবদম্পতীর সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপেরা হাসিতেছে, কিন্তু অপ্সরার হৃদয় হাসিতেছে না। কেন জান? প্রণয়ী-বিরহ।

এক দুই তিন করিয়া রজনী চারি দণ্ডে উপস্থিত। ম্লান বদনে রুক্ষকেশে অবনত মস্তকে ভূপেশচন্দ্র মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অপ্‌সরাসুন্দরী যুগল বাহু বিস্তার করিয়া আহ্লাদে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন, আহ্লাদে পলকের জন্য যেন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, চৈতন্য পাইয়া লোক-লজ্জায় বাহু সঙ্কোচ করিলেন। গাছের পাখীরা অস্ফুট স্বরে তাহাদের কথায় পঞ্চমে ঝঙ্কার দিয়া গীত গাইয়া উঠিল। আমরা যদি পাখীর কথা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগৎকে বুঝাইয়া দিতাম, পাখীর গীতের অর্থ কি। আমরা যদি কবি হইতাম, জগৎকে বুঝাইয়া দিতাম, পাখী কি গীত গাইতেছে। অনুমানে বুঝা গেল, পাখী গাইতেছে-মূলতান।

গীত।

রাগিণী মূলতান—তাল আড়া ঠেকা।

ধরি ধরি মনে করি ধরিতে না পারি তায়।
আমি যারে বাঁধিয়াছি সে আমারে ছেড়ে যায়॥
হায় রে দারুণ বিধি, এই কি তোমার বিধি,
হৃদয়ের প্রেমনিধি যতনে কেন হারায়;—
যতনে ডাকি যাহারে, রাখিতে হৃদয়াগারে,
সেই মম প্রাণপাখী উড়ে উড়ে উড়ে যায়॥

পাখী বড় রসিকা। রসিকা সুন্দরীর মনের কথা টানিয়া মধুরস্বরে গীত গায়। সকলে নিস্তব্ধ, কিন্তু বনের পাখী সহজে কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। বনশাখী-শাখে তাহারা নিস্তব্ধ থাকিবে কেন? পাখী আবার গীত গাইতেছে। অর্থ বুঝা গেল না, আভাসে বুঝা গেল, বিরহী প্রেমিক নায়কের হৃদয়ের আক্ষেপ।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট—তাল একতালা।

এক বার আয় ভাই মধু খাই মধু নয়নে।
নয়নে মধুর ধারা ঝরে সঘনে।

তোমার মধুর হাসি, হেরিবারে ভালবাসি,
আশাতে দেখিতে আসি, আশা-চপলা ঃ—
বিধাতা বিমুখ মোরে, না পাই দেখিতে তোরে,
ভালবাসা ভুলে গেছি, তবু তুমি জাগ মনে ॥"

দুটী গীত একত্র করিয়া ভূপেশচন্দ্র আর অপ্সরাসুন্দরী ঠিক যেন প্রেমানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। চক্ষে চক্ষে অনেক কথা হইল। অবিশ্রান্ত চারিচক্ষে জলধারা বহিল, কিন্তু মনের কথা কেহই ফুটিতে পারিলেন না। কথা ছিল, আরতির পূর্ব্বে আক্রমণ হইবে, আরতির সময় বহিয়া গিয়াছে, বিপক্ষ সেনারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দর্শন দেয় নাই। তবে কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে? ভূপেশচন্দ্র কি সত্য সত্য কাপুরুষের মত তুচ্ছ জীবন লইয়া পলায়ন করিবে? না,—তাহা ত হইতে পারে না। বীরাঙ্গনা অপ্সরাসুন্দরীই বা বিনা যুদ্ধে, বিনা বাক্য বিনিময়ে প্রাণেশের প্রাণ রক্ষা করিয়া, প্রাণ মন সমর্পণ করিতে চাহিবেন কেন? অপ্সরাসুন্দরী কাতরা, চক্ষু জ্বলিতেছে, উন্মুক্ত কবরী পৃষ্ঠে, স্কন্ধে উরসে, ললাটে, কর্ণপার্শে, মৃদু বাতাসে তরঙ্গখেলা করিতেছে, মন উদাস। সেই উদাসভাবে দেবীর পদতলে যোড়করে উপবেশন করিয়া, আকাশপানে মুখ তুলিয়া ভক্তিভাবে ডাকিতেছেন, "দেবি! কৃপা কর, আরতির সময় অতীত হয়, ক্ষমা কর, অপরাধ আমার। চিরদাসী অপরাধিনী আমি, ঐ পাদ-পদ্মে চিত্ত সমর্পণ।

আমি মা চির কিঙ্করী ও পদ কমলে।
মাগি ভিক্ষা ভিক্ষা দান কর মা অভয়ে।
বদ্ধ আছি ও শ্রীপদে প্রতিজ্ঞা শৃঙ্খলে,
ভেঙে দাও সে শৃঙ্খল, উড়ে যাই বনে।"

দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। শত শত অশ্বারোহী, দ্রুত—বিদ্রুত গমনে দেবালয়ের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মন্দিরের দ্বার অরক্ষিতে বিনির্ম্মুক্ত। অশ্বপদধ্বনি থামিলে একজন রাজপুরুষ সর্ব্বাগ্রে মন্দিরে প্রবেশিলেন। কে তিনি? রাজা বিজয়কেতু। তিনি যিনিই হোন, শিবিরের পরিচয়ে আর

দেবালয়ের পরিচয়ে কিছু প্রভেদ আছে। কেন জান? শিবিরের পরিচয় কেবল রাজা জানেন, আর রাজকন্যা জানেন। দেবালয়ের পরিচয় দশ জনে জানিবে। সেই নিমিত্তই প্রথম প্রবেশকারী—রাজা বিজয়কেতু।

পশ্চাতে পশ্চাতে অনুবলেরা মন্দিরমধ্যে আসিয়া দর্শন দিল। মন্দিরে আর স্থান হয় না।—গত রাত্রে যাহারা ভূপেশচন্দ্রের প্রাণসংহারে কৃত-সংকল্প ছিল, তাহারা অগ্রে অপ্‌সরাসুন্দরীর, শেষে ভূপেশচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া ক্ষমা চাহিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া অপ্‌সরা কহিলেন, "কল্য রজনীতে আমি পাপী ছিলাম, আজ আমি পুণ্যবতী। আশীর্ব্বাদ করি, তোমারা সুখী হও। সংসারে আশা যাহা উপদেশ করে, মনুষ্য তাহার অন্যথা করিতে পারে না। পলকে পলকে নিয়তি আশা স্বপ্নকে ভুলাইয়া দিতে চান, কিন্তু আমি ত জানি, মায়াময় জীবসংসারে একমাত্র আশাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। আমি আশা করিয়াছিলাম, ভূপেশচন্দ্রকে আর এক বার দেখিব, আমি আশা করিয়াছিলাম, বিপক্ষহস্ত হইতে ভূপেশচন্দ্রকে রক্ষা করিব। আমি আশা করিয়াছিলাম, ভূপেশচন্দ্রকে হৃদয়রাজ্যের রাজা করিব। কিন্তু কখন? রাত্রে যখন শয়ন করিয়া থাকিতাম, গবাক্ষ-দ্বার যখন মুক্ত থাকিত, সেই দ্বারপথে পবনের সঙ্গে এক একবার আশা আসিয়া আমার কাণের কাছে, চক্ষের কাছে, বুকের কাছে, কি এক রকম বাতাস দিয়া চুপি চুপি কথা কহিত। ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারিতাম না। মনে মনে জানিতাম, আশা-চপলা।"

মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজিতে লাগিল, সপ্তদীপে সর্ব্বমঙ্গলা চামুণ্ডাদেবীর আরতি হইল, সকলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণিপাত করিলেন। কেবল এক-জন না। তিনি কে? রাজা বিজয়কেতু। তিনি প্রণাম করিলেন না কেন? অভিমানে। মানস ভক্তিশূন্য নহে, কিন্তু ভক্তিভাবে অভিমান।

আরতি সমাপ্ত হইল। বাদ্যযন্ত্রের সুস্বর থামিল। নূতন নামে পরিচিত রাজা বিজয়কেতু কুমারী অপ্‌সরাসুন্দরীকে নিকটে আহ্বান করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন, "মা! এই মহাদেবীর প্রসাদে আজ তোমার মনোরথ-ব্রত সুসিদ্ধ হইল।" কুমার ভূপেশচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া অপ্‌সরাসুন্দরীর হস্ত তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত করিয়া আশীর্ব্বচনে কহিলেন, "কুমার! আমার

এই যত্নলালিতা হারানিধি তোমারে সমর্পণ করিলাম। সাক্ষী মহাকাল, আর এই মহাদেবী চামুণ্ডা। সাক্ষী চন্দ্রসূর্য্য, সাক্ষী আকাশের নক্ষত্রমালা, সাক্ষী অগ্নিবায়ু। অদ্যাবধি ইনি তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। যত্নে রক্ষা করিও, যত্নে পালন করিও, যত্নে আপদবিপদে পরিত্রাণ করিও, এই আমার উপদেশবাক্য।"

পিতাকর্ত্তৃক জীবনের প্রিয়ধনে অর্পিতা হইয়া অপ্সরাসুন্দরী সহাস্য বদনে সতেজ নয়নে, সেনাদলের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি দেবসাক্ষাৎ, দেবীসাক্ষাৎ, পিতৃসাক্ষাৎ, পতি পরিগ্রহ করিলাম, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। তোমরা এখন তোমাদের পূর্ব্ব রজনীর প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পার।"

অগ্রবর্ত্তী সেনাপতি কহিলেন, "দেবি! তোমার মহিমা আমাদের জানা ছিল না। আমরা জানিতাম, ঐ রাজপুত্র রাজদ্রোহী; সেই জন্য গতরাত্রে আমরা অপরাধী হইয়াছিলাম। তুমি যে মহারাজ উদয় সিংহের কন্যা, যিনি দুর্দ্দৈববশে ছদ্মবেশে রাজা বিজয়কেতু নামে আমাদের প্রভু হইয়াছিলেন, তুমি যে তাঁহারই বংশবর্ত্তিকা, ইহা আমরা জানিতাম না। দেবি! গত রজনীতে তোমার হস্তে যে পঞ্চ সৈনিক নিপাতিত হইয়াছে, আজ রাত্রে আমরা তাহার প্রতিশোধ লইতে আসিতাম, কিন্তু দেবি! অভাবনীয়রূপে যে অপূর্ব্ব ঘটনার সম্মিলন, তাহাতে আমরা সহস্র সহস্র অপরাধী, অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, ক্ষমা।"

"ক্ষমা করিতে আমি জানি, কিন্তু একটী কথা আছে।"

"আজ্ঞে করুন।"

"সে কথা আমি জানি না।"

"কে জানেন?"

"তোমাদের শত্রু।"

"আমাদের শত্রু কে?"

"রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র।"

"ইঁহার সঙ্গে কস্মিন্ কালেও আমাদের শত্রুতা নাই। ইঁহাকে আমরা কস্মিন্ কালে দেখি নাই, চিনিও না।"

"দেখাশুনার কথা ছাড়িয়া দাও, অন্য কোন সূত্রে। ভাল করিয়া মনে কর দেখি, অন্য কোন সূত্র।"

"দেবি! কোন সূত্র ত মনে পড়ে না।"

"তোমার নাম কি?"

"বিক্রম সিংহ।"

একটু চিন্তা করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "হাঁ, ঠিক ঐ নাম।"

"এ নামে কি অপরাধ দেখি?"

"তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর।"

"মনে আমার কোন পাপ নাই।"

"কুমার ভূপেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর।"

"অপরিচিত।"

"তবে সেই দেবদারুবৃক্ষকে জিজ্ঞাসা কর।"

বিক্রম সিংহের বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। উদাস নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হস্তে হস্ত মর্দন করিয়া ললাটে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া তিনি অর্দ্ধ উক্তিতে কহিলেন, "আমি?—আমি কি পাপ করিয়াছি?"

"মনে করিয়া দেখ।"

"মনে হয় না।"

"কে একটা এলোকেশী রাক্ষসী?"

"মনে হয় না।"

"লোভ মনে হয়?"

আবার কাঁপিয়া বিক্রমসিংহ কহিলেন, "দেবি! লোক আমাকে ক্ষমা করুক, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

"তুমি না বলিতেছিলে, পরমাসুন্দরী?"

বিক্রমসিংহ মনে মনে ভাবিলেন, তত দূরে থাকিয়া সে কথা এ সুন্দরী কিরূপে শুনিলেন?

"চুপ করে রইলে যে?"

"আমি ত সে কথা বলি নাই।"

"গোপন কর কেন? মিথ্যা কথা বল কেন? রাজাকে লোভ

দেখাইয়াছিলে। যদি আমি মহারাজের কন্যা না হইতাম, বল দেখি, তাহা হইলে কি হইত ?”

“আমি ত সে কথা বলি নাই।”

“আবার মিথ্যা কথা ?”

ভয়ে জড়সড় হইয়া বিক্রমসিংহ কহিলেন, “সে আর একজন।”

“একজন কি আর একজন, তাহা আমি শুনিতে চাই না, কিন্তু গত রাত্রের যে প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহা অপূর্ণ থাকিবে না।”

“আর কেন দেবি! পায়ে ধরি, ক্ষমা কর।”

“বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতককে আমি ক্ষমা করিতে শিখি নাই। বীরপুরুষ তুমি, বীরপুরুষ। তোমরা কেন এই অবলার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দিবে? অস্ত্র লও, সম্মুখে আইস, বিবাহ হইয়াছে, এখন দুই বলে আমি বলী, সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধ কর।”

বিক্রমসিংহ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, “না মা! আগে আমরা জানিতাম না, সেই জন্য উপদ্রব হইয়াছিল। এখন আর অস্ত্র ধারণ করিতে পারিব না।”

রাজা উদয়সিংহের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অপসরাসুন্দরী কহিলেন, “মহারাজ। পিতা! গুরুদেব! এই কি তোমার সেনাপতি? এই কাপুরুষ শৃগাল কি তোমার রাজ্য রক্ষা করে? স্ত্রীজাতির অস্ত্রে ভয় পায়? আমি তোমার কন্যা, জানিতাম না, জানিয়াছি, কিন্তু আমি তোমার সেনাপতির মস্তকে পদার্পণ করিয়া এখনও—এখনও এই বয়সে সহস্র সহস্র বৈরীসংগ্রামে বিজয় লাভ করিতে পারি। সিংহরাজ্যে সিংহই থাকে। পিতা! এই শৃগাল কি তোমার সেনাপতি?”

“কেন মা তুমি অমন কথা বল? মঙ্গল-রজনীতে মঙ্গলকথা বলিতে হয়, মঙ্গলাচরণ করিতে হয়।”

বক্ষে করাঘাত করিয়া,—ললাটে করাঘাত করিয়া, অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, “সূর্য্যবংশের শান্তিস্থান চিতোর! রামরাজ্যের শেষচিহ্ন চিতোর! আঃ! পদ্মিনী সতি! সতী সরোজিনি! যবনের উপদ্রবে তোমরা জ্বলন্ত চিতানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছ! স্বর্গবাসিনি!

স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ বৃষ্টি কর। আমি অভাগিনী অপ্সরা তোমাদের কুলে এখনও বাঁচিয়া আছি। এক পাপিষ্ঠ শৃগাল আমার পিতৃরাজ্যের সেনাপতি! সে পাপিষ্ঠ আমার পিতার সম্মুখে বলে, আমি পরমাসুন্দরী! ভূপেশ! প্রস্তুত হও! ধরাতলে এ জীবন—এ কলঙ্কিত জীবন আর রাখিব না। পিতা! করুণাময় পিতা! অভাগিনী জানিত, পৃথিবীতে তুমি নাই,—ছিলে, তোমার অনাথিনী দুহিতা এত দিন এ সংবাদ জানিত না। অনেক কথা,—অনেক দুঃখের কথা বলিবার ছিল, এ জন্মে তাহা আর বলা হইল না, তুমি এখন শৃগাল সেনাপতির বাহুবলে রাজত্ব রক্ষা করিতে চাও! সে পাপিষ্ঠ শৃগাল তোমার কন্যাকে পরমাসুন্দরী বলিয়া তোমাকে প্রলোভন দেখায়! পিতা! গুরুদেব! বিদায় দাও, শৈশবে যে পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলাম, দশ বৎসর পরে সেই পাদপদ্ম আবার দেখিলাম, কিন্তু আর না,—আর আমি পৃথিবীতে থাকিব না। কেন বিবাহ হইল? ভূপেশ! কেন তোমারে আমি ভাল বাসিয়াছিলাম! আমি চলিলাম, স্বর্গে সতী জননীর কোলে জুড়াইতে চলিলাম। সাহস আছে? সাথী হইতে পার? যদি থাকে, প্রস্তুত হও! পদ্মিনী সতীর বংশবর্ত্তিকা এ পাপসংসারে আর থাকিবে না। পৃথিবি! তুমি কি মা কলঙ্কিনী? এত কলঙ্ক এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেছ? এত পাপের ভার এখনও বক্ষে রক্ষা করিতেছ? ডুবিয়া যাও! রসাতলে প্রবেশ কর! পৃথিবী হইতে পৃথিবী নাম বিলুপ্ত হোক! সমুদ্র! অগাধ জলনিধি! বিশ্বগ্রাসী রত্নাকর! তুমি কি এই পাপময়ী পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পার না? একবার গ্রাস করিয়াছিলে, জানি; বিশ্ববিধাতা ত্রিভুবনপিতা নারায়ণ একবার তোমার বুকে বটপত্রে ভাসিযাছিলেন। আবার কি তেমনি হইতে পারে না? ভাসাও! ডুবাও! কলঙ্কিনী পৃথিবীকে গ্রাস কর! আর সহ্য হয় না।"

অপ্সরাসুন্দরী যেন উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। মহারাজ উদয় সিংহ শান্ত করিতে পারিলেন না। দেবী তেজস্বিনী যেন শ্মশানবাসিনী শ্মশানকালীর ন্যায় ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বিক্রম সিংহ পায়ে পড়িলেন। পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর, দয়া কর, রক্ষা কর," বলিয়া বিক্রম সিংহ নৃত্যকালীর পায়ে পড়িলেন।

সে বেগ নিবারণ করে কে? উগ্রচণ্ডারূপিণী মুক্তকেশী অপ্সরাসুন্দরী পুনর্ব্বার খড়্গপাণি হইয়া রণবেশে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "বিক্রম সিংহ! আমি তোমাকে প্রাণে মারিব না। কাল তুমি আমার প্রাণেশ্বরের প্রাণ লইতে আসিয়াছিলে, জানি, ইচ্ছা করিলে এক পদাঘাতে আমি তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে পারিতাম, তাহাও আমি জানি, কিন্তু তুমি আত্মাবহ, সেই নিমিত্ত দ্বিতীয় আবর্ত্তির অভিলায় গত রাত্রে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, এখন তোমার উপায়? এখন যদি আমি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করি, তোমার রক্ষাকর্ত্তা কে? আমার জন্মদাতা পিতা মহারাজ উদয় সিংহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন না। আমি পৃথিবীতে থাকিব না, পৃথিবীতে যাঁহার সহিত চক্ষের মিলন হইয়াছে, কি যেন দেখিতেছি, কে যেন আমাকে কি দেখাইয়া যাইতেছে, ধারণা করিতে পারিতেছি না। চঞ্চলা চপলা লোকের চক্ষে ধাঁধা দেয়, মায়াদেবী লোকের চক্ষে ধাঁধা দেন, কিন্তু আমি যে কি মূর্ত্তি দেখিলাম, কি মূর্ত্তি পাইলাম, কি মূর্ত্তি হারাইলাম, বুঝি বুঝি করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমি যেন বোধ করি, সংসারের সকল লোকে ছদ্মবেশে খেলা করিতেছে, স্বপ্নদেবী আমার নেত্রসমীপে অনেক মূর্ত্তি আনিয়া দেখাইতেছেন, আমি না কি বাছিয়া লইতে জানি, অত মূর্ত্তির মধ্য হইতে একটী প্রাণের প্রতিমা আমি বাছিয়া লইয়াছি।"

"লোকে মনে করিতে পারে হাসির কথা, কিন্তু যাহার প্রাণ জ্বলে, হাসির কথায় তাহার প্রাণ আরো—আরো—আরো জলিয়া উঠে। কে কাহারে কি কথা বলিয়া আগুন নিবাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারে আমি চিনি না; যদি চিনিবার আকিঞ্চন থাকে, বিধাতার সৃষ্টিতে যদি পরকাল থাকে, ইহজন্মে ত না, সেই পরকালে তাঁহারে আমি চিনিব।"

"যিনি খেলা করিতেছেন, তিনি কে? যে নামে, যে পরিচয়ে তিনি কেন থাকুন না, আসিবেন, ঠিক জানিতেছি, ছদ্ম নাম, ছদ্ম বেশ, ছদ্ম পরিচয়। সম্পর্ক? পলকের মধ্যে আমি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিব। বালকেরা যেমন সরোবরের মৃণাল হইতে পদ্মফুল ছিঁড়িয়া খেলা করে, আমি তেমনি খেলা করিতে আসিয়াছি। দেখিতেছ না, এই ভূপেশচন্দ্র আমার হৃদয়-সরো-

বরের পদ্মফুল। এই পদ্মফুল ছিঁড়িয়া আমি রসাতলে প্রবেশ করিব। কিন্তু তোমাকে রক্ষা করিবে কে? বহুদিন পরে দেখিতে পাইলাম, অনেক দুঃখের কাহিনী তাহার কর্ণে আমার বলিবার ছিল; কিন্তু পারিলাম না। সময় হইল না। আমার অদৃষ্ট আমারে প্রতারণা করিতেছে। তুই দূর হ!"

বিক্রম সিংহ তটস্থ। উভয় হস্তে কপাল স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "অপরাধের কি ক্ষমা নাই দেবি?"

"আছে, কিন্তু তোমার যেরূপ অপরাধ, তাহার ক্ষমা স্বর্গেও নাই, পৃথিবীতেও নাই, নরকে।"

বিক্রম সিংহ নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া রাজা উদয় সিংহের চরণতলে নিপতিত হইলেন।

রাজা কহিলেন, "ক্ষমা অক্ষমা সমস্তই এখন আমার অসাধ্য। যে প্রিয় বস্তু হারাইয়া রাজস্থানে আমি বিজয়কেতু হইয়াছিলাম, সেই প্রিয় বস্তু,—সেই হারানিধি এখন আমার চক্ষের সমীপে। আমার যত কিছু কর্তৃত্ব, যত কিছু প্রভুত্ব, সমস্তই এখন অমরাসুন্দরীর হস্তে।"

"তবে কি আমি মরিব?"

"অকারণে অমরাসুন্দরী কাহাকেও মারে না।" কথা হইতেছে, এমন সময় অমরাসুন্দরী চামুণ্ডাদেবীর খড়্গখানি যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়া সকলকে কহিলেন, "তোমরা চুপ কর। সকলের কাছে বিদায় লইয়াছি, এখন তোমরা একটু সরিয়া দাঁড়াও, একটী জবাফুল আর একখানি দর্পণ আমার হাতে দাও, একবার মায়ের কাছে বিদায় লই।—

যাই মা ত্রিপুরেশ্বরি! অবনী হইতে।
বিদায় জনম শোধ! রাঙা পা দুখানি,
আর হেরিবে না দাসী ইহ মায়াধামে।
থাক তুমি রক্ষাকালি! থাক এ জগতে;—
যে জগতে পূর্ণ আছে দম্ভ অহঙ্কার;

আপনা আপনি বড়, হিংসাদ্বেষে রত।
ব্যাঘ্র সম নরকুলে নরে করে গ্রাস,—
বাঘেরা পারে না যাহা মানুষে তা পারে।
এমন নৃশংস পুরী পরিহার করি,
যত শীঘ্র যাই দেবি! ততই মঙ্গল।
বার বার শ্রীচরণে করি প্রণিপাত,
যারা যারা এ চক্ষের ছিল সুখপ্রদ,
তারা যেন সুখে থাকে কৃপায় তোমার।
রবে না এ ভবধামে অপ্সরাসুন্দরী,
রহে যদি, রবে শুধু জীবশূন্য নাম।
সে নামে যাহার দয়া, মমতা যাহার,
যার স্নেহ, যার মায়া, তাহার নয়নে—
বহিবে দু দিন অশ্রু, মায়ার প্রভাবে।
উচ্চারিবে রসনায় রোদনের সহ,—
অভাগী অপ্সরা নাম, দু দিনের তরে।
তার পর ভুলে যাবে, ফুরাইবে সব,
সমস্ত নীরব হবে। হয়ে থাকে যাহা,—
মায়াময় মরধামে, সৃষ্টিকালাবধি।
এই সত্য, এই থাকে, আর কিছু নয়,
সমস্তই মায়াময় সংসারের খেলা।
যাই আমি, যাই দেবি! জনমের মত,
এ জনমে দেখাশুনা হইবে না আর,—
তার সনে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, ভালবাসি যারে।

স্নেহভরে স্নেহ করি, স্নেহের পুতুলে;
পূজা করি যাঁহাদের হৃদিপদ্মদলে,
ভক্তিভাবে জন্মাবধি, মানসে, বচনে,
সকলেই মম চক্ষে হবে অদর্শন!
কোথা আমি রব, কোথা রহিবে তাহারা,—
কিছু মনে পড়িবে না, বিস্মৃতির জলে—
সমস্ত হইয়া যাবে চির বিসর্জ্জন!
যারে হেরি হাসিয়াছি প্রফুল্ল বদনে,
যার তরে কাঁদিয়াছি স্রোতস্বতী-তীরে,
ভাসিয়াছি প্রেমানন্দে যারে কোলে করি—
আনন্দ-সমুদ্র মাঝে। সে সকল ছবি—
বিম্বিত হবে না আর নয়নে আমার!
এই তো মায়ার খেলা, মায়াবতী সতি!
তবে আর মায়াধামে কি বা প্রয়োজন?
চলিল চরণদাসী নিত্যানন্দপুরে;—
থাকে যদি নিত্যানন্দ, কোন পরলোকে,—
সুখেতে ভুঞ্জিব তাহা অদৃশ্য শরীরে।
অদৃশ্য হৃদয়ে, মনে, অদৃশ্য অন্তরে।
দেহ পদছায়া দেবি! অন্তিম বিদায়!
পুনর্ব্বার পাদপদ্মে করি নমস্কার!"

সতী অপ্সরাসুন্দরী এই রূপে মহামায়ার স্তব করিলেন। যাঁহারা নিকটে ছিলেন, সকলেই স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর আর কোথাও কিছু নাই, আর কাহারও সহিত একটীও কথা হইল না, কোন্ পথে কোন্ দিক্ দিয়া অপ্সরাসুন্দরী সকলের নয়ন হইতে অদৃশ্য হইয়া

গেলেন, কোথায় গেলেন, কেহই কিছু দেখিতে পাইলেন না। সবিস্ময়ে আশ্চর্য্য মানিয়া বিস্মিত বদনে সকলেই তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ প্রবাহ।

সত্য না স্বপ্ন?

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
* * * * চঞ্চল করযুগশালী॥"

জয়দেব।

চামুণ্ডার মন্দির হইতে অপ্সরাসুন্দরী অদৃশ্য হইবার পর বহুদিন পরে যমুনাতীরের এক কুঞ্জকাননের একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে একটী সুন্দরী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। নিদ্রিতা কি জাগরিতা, ঠিক অনুভব হয় না। কাননে চন্দ্রের জ্যোতি পড়িয়াছে। বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া সেই সুশীতল জ্যোতি কাননতলে প্রবেশ করিতেছে। অন্ধকার বনে সেই চন্দ্রালোকে কুটীরখানি বেশ দেখা যাইতেছে। সুন্দরী যুবতী রাত্রিকালে কাননকুটীরে কেন? এ কথার উত্তর কে দিবে?

রমণীর ওষ্ঠাধর ধীরে ধীরে অল্প অল্প কাঁপিতেছে। ঘুমাইলে অনেকেরই ওষ্ঠাধর এইরূপে কম্পিত হয়। হয় সত্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছু বিচিত্র ভাব। রমণী আপনা আপনি কথা কহিতেছে। কি কথা? স্পষ্ট বুঝা গেল না, কিন্তু রমণী বলিতেছে, নিষ্ঠুর! তোমার কি এই ধর্ম্ম? এক দিন তুমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, যত দিন জীবন রহিবে, তত দিন ছাড়াছাড়ি হইবে না। এখন তোমার সেই ধর্ম্ম কোথায় রহিল? এখন সে প্রতিজ্ঞা তোমার কোথায় গেল? ধার্ম্মিক! এই

রূপেই কি তুমি প্রতিজ্ঞা পালন কর? রমণী বধ করিয়া তোমার কি ধর্ম্ম-গৌরব উজ্জ্বল হয়?

কথা কহিতে কহিতে কাননকুটীরবাসিনী সুন্দরী কামিনী সহসা যেন একবার নেত্র উন্মীলন করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। আকাশের চন্দ্রনক্ষত্র, কাননের বৃক্ষলতা পাছে তাহার নয়নের ও বদনের তৎকালের ভাব দেখিতে পায়, এই ভয়ে, এই সন্দেহে, যুগল হস্তে সমস্ত মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া ফেলিল।

"সেই নিশাকালে বিজন কাননমধ্যে নিভৃত কুটীরে কি দেখিয়া তাহার অঙ্গ শিহরিল, তখন তাহা বুঝিতে পারা গেল না। কিছু কি বিভীষিকা দেখিয়াছে? কোন ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখিয়া কি ভয় পাইয়াছে? রমণীর চক্ষু ও রসনা এ প্রশ্নের উত্তর দান না করিলে অপরে কি উত্তর দান করিবে?

এক মুহূর্ত্ত গেল, দুই তিন করিয়া চারি পাঁচ মুহূর্ত্ত অতীত। সমভাব। আরও পাঁচ ছয় মুহূর্ত্ত পরে রমণী আবার নয়ন বিকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার দীর্ঘ দীর্ঘ পক্ষ্মদলে পদ্মনেত্র দুটী ঢাকিয়া ফেলিল। ঢাকিয়া ফেলিল কি জন্য? সে যেন দেখিল, যাহাকে ভালবাসে, যাহাকে হৃদয় দান করিয়াছে, সেই পুরুষ যেন অপর একটী কামিনীর সহিত সেই কুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া সহাস্যমুখে নৃত্য করিতেছে। গলায় বনফুলের মালা, পরিধান শুভ্র বাস, উভয়েরই হস্তে এক একখানি দর্পণ। যুবকের কটি-দেশে একখানি তরবারি বিলম্বিত। এই দুই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই কুটীর-বাসিনী শিহরিয়া উঠিয়াছিল। প্রিয় বস্তুর অপ্রিয় ভাব দর্শন করিয়াই দুইবার নেত্র বিকাশ করিয়া দুইবার নিমীলন করিয়াছিল। কিন্তু ইহা কি সত্য না স্বপ্ন? রমণী সত্য সত্য নিদ্রা যাইতেছিল কি না, সত্য সত্য স্বপ্ন দেখিতেছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। বস্তুত জাগিয়াছিল, বস্তুত কুটীরদ্বারে নায়ক নায়িকার নৃত্য দর্শন করিতেছিল, সেটী সত্য কি না, তাহাও আমরা জানি না। আকাশে চন্দ্র ছিলেন, বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া যমুনাজলে তারাদলের সহিত চন্দ্র নৃত্য করিতেছিলেন, যমুনার নীল জলে নীল আকাশের ছায়া পড়িয়াছে, একটী চাঁদ সেই জলে খণ্ড খণ্ড হইয়া

উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত ঝকিতেছে, খণ্ড খণ্ড নক্ষত্রগুলি আরো শত শত খণ্ডে বিখণ্ডিত হইয়াছে, অপূর্ব্ব শোভা! কিন্তু আজ আমরা এই নিশা-কালে যমুনাতীরকুঞ্জে সে শোভা দর্শন করিতে উপস্থিত হই নাই। কুটীর-বাসিনী কামিনী জাগিয়াছিল কি ঘুমাইতেছিল, তাহার সাক্ষী চাই। দিনের বেলা আকাশে সূর্য্য সাক্ষী; রাত্রিকালে সনক্ষত্র সুধাকর সাক্ষী। সেই জন্য আকাশে আমরা চন্দ্র দেখিলাম, নক্ষত্র দেখিলাম, কালিন্দী-সলিলে তারা-পতির সহিত তারামালার ছায়া দেখিলাম, তাহারা সাক্ষী দিবে, কামিনী কি করিতেছিল। বিচারালয়ের পদ্ধতিমতে সে সাক্ষীগণকে আমরা শপথ করাইতে পারিলাম না; তাহারাও কথা কহিল না, যৌবানবন্দিনবিস ঠকিয়া গেল। কাননের বৃক্ষলতাকুলকে প্রশ্ন করা হইল, শপথ করান হইল, তাহারাও পবনের সঙ্কেতে এক একবার এদিক ওদিক মাথা নাড়িল, কথা কহিয়া উত্তর দিল না, সে মাথা নাড়ায় হাঁ কি না, ইহা বুঝিতে পারে, কাহার সাধ্য? পবনদেব বুঝি সাক্ষী ভাঙ্গাইয়া লন? পবন যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র সেই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া জরায়ু সন্তানকে ঊনপঞ্চাশ খণ্ডে ছেদন করেন, সেই নিমিত্ত এক পবন ঊনপঞ্চাশ পবন নামে প্রসিদ্ধ। দেবতার উপর পবনের রাগ আছে। চন্দ্রদেব আমাদের একটী দেবতা, দক্ষদুহিতা নক্ষত্রেরাও আমাদের দেবতা, ভগবান বায়ুদেব পূর্ব্ব আক্রোশে জলতলে চাঁদকে খণ্ড খণ্ড করিলেন, তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, জলকে কাঁপাইয়া ছোট ছোট নক্ষত্রগুলিকেও খণ্ড খণ্ড করিলেন, তাহারাও কথা কহিল না, কিন্তু গাছেরা পবনের কাছে কোন্ অপরাধে অপরাধী? সুললিত নিরীহ লতারাই বা কিসে অপরাধিনী? তাহারা সাক্ষ্য দিল না কেন? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অঞ্জনারঞ্জনের সাক্ষী ভাঙ্গান অভ্যাস আছে।

জগতের নরনারীকুলের ন্যায় কাননের পশুপক্ষীরাও নিশাকালে নিদ্রা যায়, কেবল যাহারা নিশাচর নিশাচরা, তাহারাই জাগিয়া থাকে। সাক্ষ্য দিবার জন্য সেই নিশাচর পশুপক্ষীকে আহ্বান করা হইল, তাহারা নিকটে আসিল না; দূরে দূরে কলরব করিয়া, কেহ কেহ ছুটিয়া ছুটিয়া, কেহ কেহ উড়িয়া উড়িয়া দূরে দূরে পলায়ন করিল। তবে এখন সাক্ষী

হয় কে? বনস্থলী?—তাহারা সাক্ষী হইবে কেন? তাহারা কাঁদিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে মস্তক অবনত করিতেছে, শিশির তাহাদিগের চক্ষের জল, সেই জল বিন্দু বিন্দু মাটীতে পড়িয়া মাটীতে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্ব দেখাইতেছে। যতক্ষণ ফুলে থাকে, পতনসময়ে দেখায়, সেই অশ্রুবিন্দুগুলি ঠিক এক একটী ছোট ছোট মুক্তা। বাঙ্গালাদেশের নোলকপরা কচি কচি মেয়ে। তাহারা সাক্ষী হইবে কেন? তাহারা জানেই বা কি? তবে এখন কে সাক্ষী হয়? ঐ সর্ব্বনাশী—ঐ সর্ব্বনাশী কলিন্দ নন্দিনী কালিন্দী। জোবানবন্দিনবীস উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যমুনা! এত রাত্রে নাচিয়া নাচিয়া কোথায় যাও? দাঁড়াও। রমণী জাগিতেছিল কি ঘুমাইতেছিল, বলিয়া যাও।" যমুনার সাধ্য কি যে, সে প্রশ্নের উত্তর করেন, দুরন্ত পবন তাঁহাকে কাঁপাইতেছেন,—তাঁহাকে নাচাইতেছেন, লহমে লহমে তরঙ্গিত করিতেছেন, তপননন্দিনী তরঙ্গিণী হিমালয়-নন্দিনী সুরধুনী গঙ্গার সহিত দ্রুতবেগে রক্ষার আশায়, আশ্রয় ভিক্ষায়, প্রিয় পতি সাগরের উদ্দেশে অবিশ্রান্ত দক্ষিণমুখে চলিতেছেন। পবন আমাদের সে সাক্ষীটীও বেহাত করিয়া দিয়াছেন। সাক্ষী মিলিল না। পাঠক মহাশয়কেও আমরা নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতে সমর্থ হইলাম না। কতক্ষণ কাটিয়া গেল, স্থূল তত্ত্বের মীমাংসা হইল না। সময় কাহারও হাতধরা নয়, দিবাও নয়, রাত্রিও নয়। সাঁ সাঁ করিয়া রাত্রি চলিয়া গেল। পূর্ব্বগগনে ধূম্রবসনা উষাসুন্দরী। পাখীরা কলরব করিল। ললিত রাগিণীতে প্রভাতী গীত ধরিল। অন্ধকারের বন্ধু আঁধারবর্ণ কাক উষাকে কর্কশস্বরে ধমক দিতে দিতে বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া গেল, নিশাচরেরা পলায়ন করিল। জলে কুমুদিনী মুদিতনেত্রা হইলেন, কমলিনী অল্প অল্প নেত্র বিকাশ করিয়া প্রাণপতি সমাগমের আশায় পবনপ্রতাপে অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিলেন। ঐ যায় ঐ যায় বলিয়া ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জন করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে যামিনী প্রভাত। পঞ্চমে ঝঙ্কার দিয়া কোকিল পাখী ক্ষণে ক্ষণে আমোদী,—ক্ষণে ক্ষণে নীরব।

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে, বসতি বনে বনমালী।"

জয়দেবের এই ভগ্ন পদাবলী প্রকৃত স্বভাবে উচ্চারণ করে, তেমন পাখী সেই যমুনাকুঞ্জে কি একটীও ছিল না? ছিল বই কি! সেই কুটীর-বাসিনী বিরহিণী কামিনী।

প্রভাতে কামিনী তৃণশয্যার উপর উঠিয়া বসিল। এলো চুল, চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ অবশ, পদ্মমুখখানি যেন কি বিষাদে পাণ্ডুবর্ণ। প্রভাতে পদ্ম কি কখনও পাণ্ডুবর্ণ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু এ পদ্ম পাণ্ডুবর্ণ। পদ্মফুল জলে থাকিলে প্রভাতে প্রফুল্ল, জলশূন্য ভূমিতে থাকিলে ম্লান, পাণ্ডু, বিশুষ্ক। সূর্য্য বড় প্রেমিক! তাঁহার প্রেমের মহিমা চমৎকার!

বিরহবিধুরা, বিসন্নবদনা, বনবাসিনী, চিন্তাকুলা বনবালা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। গলায় এক ছড়া বনফুলের মালা ছিল, অন্যমনস্কে, ঘৃণায়, তাচ্ছিল্যভাবে সেই মালাছড়াটী ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। কুঞ্জবাটিকার বৃক্ষেরা, লতারা, ফুলেরা, প্রভাতসমীরে কম্পিত হইতে-ছিল; বনবাসিনী মৃদুপদে একে একে তাহাদের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, ম্লান বদনে, কহিতে লাগিল, "বল তোমরা, যাহাকে দেখিতেছিলাম, সে চিত্তচোর আমার কোথায় গেল? যাহাকে আমি তাহার সঙ্গিনী দেখিতেছিলাম, সে মায়াবিনী কোথায় গেল? সে কি কোন মানবী না রাক্ষসী? বল তোমরা, এতক্ষণ যাহা আমি দেখিতে-ছিলাম, তাহা কি স্বপ্ন না সত্য?"

কেহই উত্তর দিল না। প্রভাকর ক্ষণকাল সুবর্ণবর্ণে সুরঞ্জিত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে রজতবর্ণ ধারণ করিলেন, বড় ছিলেন, ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন, কিরণানল ক্রমশই অসহ্য। এই এক আশ্চর্য্য বিশ্বরহস্য! যাহারা বড়, স্বভাবত তাহাদেরই তেজ অধিক; কিন্তু জগচ্চক্ষু সূর্য্যদেব প্রভাতে বড় থাকেন, অস্ত যাইবার পূর্ব্বে বড় হন, কিন্তু তখন তাঁহার কিছুমাত্র তেজ থাকে না। কেবল দেখা যায়, রক্তবর্ণ স্বর্ণপ্রভ স্বর্ণ-থাল। যখন রূপান্তরে ছোট হন, তখন তাঁহার তেজ বাড়ে। জগৎ-বাসী জীব তখন তাঁহার তেজ সহ্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়। প্রকৃতির এ বিপর্য্যয় কি নিমিত্ত?

মীমাংসার সময় নাই, বেলা বাড়িতেছে। বনবাসিনী কামিনী

ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইল। বহির্গত হইয়া কোন্ দিকে গেল, দিগ্‌নির্ণয় হইল না। রাত্রে জাগিয়াছিল কি ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় এক প্রকার উত্তর পাইবার আশা ছিল, তাহার অকস্মাৎ প্রস্থানে সে আশারও বিসর্জ্জন হইয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ প্রবাহ।

প্রাণে আর কাজ কি?

প্রাণে প্রাণে যারে আমি ভালবাসিতাম।
দুখে সুখে যার তরে সুখী হইতাম॥
সে যদি ছাড়িয়া গেল, তবে কেন আর।
ডাকিবে প্রাণের পাখী হৃদয়ে আমার?
সত্য সত্য এই সত্য করিলাম পণ।
ত্যজিব ত্যজিব আজি এ ছার জীবন॥

আর্য্যরত্ন।

বেলা দুই প্রহর অতীত। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড উত্তাপপ্রতাপে বিশ্বসংসার বিদগ্ধ করিতেছেন। জীবজন্তুর কথা কি, নিরীহ বৃক্ষপত্রগুলিও ম্রিয়মাণ হইয়া নতশিরে ছায়াদেবীর শীতল চরণ ধারণ করিতে যেন ধরাতলে নামিতেছে। ছায়াদেবীর চরণ ধারণ করিলে তাহাদের কি উপকার হইবে? ছায়া ত নির্জ্জীব, সে কি কখনও কাহাকেও আশ্রয় দিতে পারে? সে কি কখনও কাহাকেও অভয়দান করিতে পারে? পারে না বটে, কিন্তু সূর্য্যের প্রতাপ হইতে সূর্য্যতাপিত—সূর্য্যপীড়িত জীবকুলকে, বস্তুরাজীকে সুশীতল করিতে পারে। কেন জান? কিসে ছায়ার এত দূর

ক্ষমতা? ছায়াদেবী সূর্য্যদেবের পত্নী। পত্নীর উপরোধ অনুরোধ গ্রাহ্য না করেন, এমন লোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতি বিরল। দেবলোক, নাগলোক, নরলোক, পশুলোক, পক্ষীলোক, বৃক্ষলোক, সর্ব্ব লোকেরাই পত্নীর আজ্ঞাকারী দাস। সেই তত্ত্বটী সত্য জানিয়াই বৃক্ষপত্রেরা ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে নতশির হইতেছে।

কিছুই ফল হইল না। যিনি প্রতাপান্বিত, তিনি অবয়বে ছোট হইলেও কোন অনুরোধে প্রতাপে খর্ব্ব হইতে চাহেন না। বীরপুরুষদিগের চরিত্র স্মরণ করুন, পৃথিবীর ইতিহাসে বীরচরিত পাঠ করুন, অমরাবতী হইতে রসাতল পর্য্যন্ত অন্বেষণ করুন, দেখিবেন, বীরেন্দ্রেরা প্রণয়ের দাস, প্রণয়ের কিঙ্কর, চিরানুগত, চির আজ্ঞাবহ; কিন্তু যখন যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হয়, সম্মুখসংগ্রামে যখন বিপক্ষপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, প্রণয়ের অনুরোধ তখন সমুদ্রস্রোতে ভাসিয়া যায়। শেষ দিবসে পতিপ্রাণা, প্রমীলা সতী ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধযাত্রায় নিষেধ করিয়াছিলেন, শেষ দিবসে রক্ষোরাণী মন্দোদরী লঙ্কেশ্বরের রণযাত্রায় বাধা দিয়াছিলেন। শেষ দিবসে বানরেশ্বরী তারা বানরপতি বালীরাজকে ভ্রাতৃযুদ্ধে গমন করিতে বারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছিল? যে ফল হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও সেই ফল। মহাপ্রতাপান্বিত তপনদেব ছায়ার অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন না। যতক্ষণ সাধ্য, উপকারের ইচ্ছাতেই হোক্, অথবা অপকারের অভিসন্ধিতেই হোক্, যতক্ষণ সাধ্য, পৃথিবীকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া যথাযোগ্য সময়ে,—

"চিরদিন কখনো সমান না যায়।"

এই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্যই যেন, অস্তশৈলের সুশীতল আশ্রমে আপনি গিয়া রাত্রের মত জুড়াইলেন। কিন্তু রাত্রে যাহারা পোড়ে, দিনে তত পোড়াতেও তাহারা একটু শীতল ছিল, সূর্য্যের অস্তগমনে রাত্রে তাহারা আরো বেশী পুড়িতে লাগিল।

রাত্রি চারি দণ্ড। একটী বিরহিণী কামিনী একটী বৃহৎ অট্টালিকার নির্জ্জন কক্ষের এক গবাক্ষে বসিয়া অশ্রুধারে ভাসিতেছেন, চিন্তানলে দহি-

তেছেন, রাত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহা কি স্বপ্ন না সত্য ? সেই দুর্জ্জয় ভাবনা ভাবিতেছেন, এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। দৃষ্টি নাই, অনুভব নাই, ভ্রূক্ষেপ মাত্রই নাই।

দাসী কহিল, "দেবি।"

চমকিতা হইয়া দেবী কহিলেন, —"বিশ্বাসঘাতক।"

কিঙ্করী আবার কহিল, "দেবি!"

দেবীর চমক ভাঙ্গিল না।

দাসী তৃতীয় বার ডাকিল, "দেবি।"

বিদ্যুতের মত দেবীর চক্ষু দাসীর দিকে বিনিক্ষিপ্ত। উদাস বিভ্রান্ত নয়নে বহুক্ষণ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া উদাসস্বরে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসময়ে তুমি কেন এখানে ?"

"শরীর কি অসুস্থ আছে ?"

"আছে, তোর কি ?"

"তোমারে অসুস্থ দেখিলে আমার প্রাণে ব্যথা হয়।"

গবাক্ষবাসিনী পুনর্ব্বার সেই কিঙ্করীর দিকে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, "এই অনধিকার প্রবেশের জন্য আমি তোমাকে শাস্তি দিব।"

"শিরোধার্য্য।"

"কি শাস্তি জান ?"

"না।"

"দূর হ!—তুই দূর হ।"

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু মৃদু হাসি হাসিয়া দাসী কহিল, "আমি সেইখান হইতে আসিতেছি।"

আবার উদাস। আবার উদাসস্বরে প্রশ্ন হইল, "কি সেখানে ?"

দাসী উত্তর করিল, "আমার বলিবার সাধ্য নাই, স্বচক্ষে না দেখিলে প্রত্যয় হইবে না।"

"তবে বুঝি সেই স্বপ্ন ?"

"স্বপ্নের কথা আমি কিরূপে জানিব ?"

"বুঝিয়াছি!"

"যদি বুঝিয়া থাক, শীঘ্র আমার সঙ্গে এসো।"

"বুঝিয়াছি। স্বপ্নই সত্য।"

"তাহা ত আমি জানি না, কিন্তু বিষম বিভ্রাট! দেখিয়াই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। শীঘ্র চল।"

"চল।"

নগরপ্রান্তে একটী উপবন। উপবনমধ্যে একটী অট্টালিকা, চারি পাশে ঝিল, চারি দিকে চারিটী পাথরের সেতু, সেতুর মুখে মুখে দেবদারু বৃক্ষ; বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীধরা জাল, নীচে এক একটা পাথরের পুতুল, একদিকে সিংহ মুখ উচুঁ করিয়া, লাঙ্গুল ফুলাইয়া শুইয়া আছে; অন্য দিকে একটা অশ্ব সম্মুখের দুই পা তুলিয়া সেই সিংহকে যেন পদাঘাত করিতে ধাইতেছে। পারে ধারে অনেক ঝাউ গাছ, একটা ঝাউবৃক্ষতলে পাথরের বেদীর উপর গৌতমের প্রতিমূর্ত্তি। কোন দিকে পাথরের গণেশ, কোন দিকে দুর্গা, কোন দিকে রামসীতা, কোন দিকে সদাশিব, চতুর্দ্দিকে লামা, মধ্যস্থলে অট্টালিকা।

অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিঙ্করী সহচরী বনমোহিনী দেখিল, কাননকুটীরেও যাহা, এই অট্টালিকাতেও তাহা। এখন ত আর নিদ্রা নাই, এখন ত আর স্বপ্ন নাই, তবে আর সংশয় রাখি কেন? যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, মনেও যাহা ভাবি নাই, চক্ষে তাহা দেখিলাম। তবে আর কেন? জগতের সমস্ত বস্তুই অচিরস্থায়ী। তবে প্রণয় চির-স্থায়ী হইবে কেন? আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আমাকে বাসে, কিন্তু ক দিন? যত দিন আমি তাহাকে হৃদয়ে ভাবনা করিয়াছিলাম,—চক্ষে দেখি আর না দেখি, তত দিন সে আমার ছিল। এখন পরের,—সত্যই সে এখন পরের।

গৃহে একটী যুবা, সঙ্গে একটী যুবতী।—গত রজনীর স্বপ্নপদার্থ।

প্রবেশকারিণীকে দর্শন করিয়া উপবনবিহারী সেই যুবা আপন নবীন সহচরী নবনায়িকার কণ্ঠে বামহস্ত পরিবেষ্টন করিয়া বিদ্রূপ হাসি হাসিতে হাসিতে বিদ্রূপস্বরে সম্মুখবর্ত্তিনী যুবতীকে কহিলেন, "কে তুমি

শ্যামাসুন্দরি? আমাদের এই নবীন মহানন্দে বাধা দিতে আসিয়াছ, নবীনপ্রণয়ে বিঘ্ন করিতে উদয় হইয়াছ। কে তুমি শ্যামাসুন্দরি?”

আগন্তুক নায়িকা আর কথা কহিতে পারিলেন না। পটে যেমন পুতুল আঁকা থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে নির্নিমেষ নয়নে প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া, প্রায় এক দণ্ড কাল নিশ্চলা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবীন প্রেমিকা সহচরী নবীন প্রেমিক হাস্যামোদকৌতুকে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্যে ভঙ্গ দিয়া প্রেমিকাকে সম্বোধন করিয়া অভাগিনী বিরহিণীর দিকে তর্জ্জনী সঙ্কেতে সকৌতুকে কহিলেন, “দেখিতেছ প্রাণেশ্বরি! ঐ যে উদাসিনী নারী, একটা ধাঁধা! অনেক মায়াবিদ্যা জানে, আমাকে ভুলাইবার জন্য নূতন সাজে সাজিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আমি ঠিক দেখিতেছি, ঠিক সেই ধাঁধা। তোমরা কামাখ্যা জান? সেখানে অনেক মায়াবিনী কুহকিনী ডাকিনী থাকে। তারা মানুষকে ধাঁধা করে, গাছচালা মন্ত্রবলে বিদেশী নরগণকে চালিয়া লইয়া গিয়া গোলাম করে। এ মায়াবিনী সেই দলেরই একজন! উঃ! ভগবান আমাকে কি বিপদ হইতেই রক্ষা করিয়াছেন! এই মায়াবিনী আমাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য অনেক—অনেক—অনেক কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যদেবীকে নমস্কার, ভাগ্যক্রমে সেই জাল ছিঁড়িয়া আমি পলায়ন করিয়াছি। মহালক্ষ্মী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, সেই পুণ্যেই আমার নিষ্কৃতি। পাপীয়সি! রাক্ষসি! পিশাচি! তুই দূর হ!—তুই দূর হ!”

কথা কহিবার অবসরে উপবনের নব নায়িকা সক্রোধে ঈর্ষাবিদ্বেষে দুঃখিনী বিরহিণীর কেশাকর্ষণ করিয়া উরুদেশে এক পদাঘাত করিল।

ছল ছল চক্ষে নায়কের মুখপানে চাহিয়া বিরহিণী কহিলেন, “জীবিতেশ্বর!—উঃ! এখনও আমি তোমাকে বলি জীবিতেশ্বর! তোমার সম্মুখে আমার এই অপমান! বুঝিয়াছি, তুমি পরের!—গত রাত্রে বুঝিয়াছি, এ রাত্রেও বুঝিলাম, তুমি পরের!—তবু—তবু প্রাণেশ্বর—”

সজল নয়নে স্তম্ভিত কণ্ঠে বারবার এই কথা বলিতে বলিতে বিরহিণী সে স্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। সঙ্গে সংবাদদায়িনী হিতৈষিণী সহচরী।

আপন কক্ষে উপস্থিত হইয়া অবমানিনী কামিনী কিঙ্করীকে বিদায় করিয়া দিলেন। দরজা, জানালা, সমস্ত অবরোধ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র কৌচের উপর শয়ন করিলেন। মনে নিদারুণ চিন্তা! পাষণ্ড! এত প্রতারণা যদি মনে ছিল, প্রথম দর্শনাবধি তবে তত আশা দিয়াছিলে কেন? আমি অবলা, কুলবালা, কিছুই জানিতাম না, অকপট জানিয়া তোমারে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলাম। নিষ্ঠুর! তোমার মনে এই ছিল? তোমার মনে এতদূর কপটতা? আমি রমণী, আমি যদি মরি, বিধাতার বিশ্বসংসারের কিছুই ক্ষতি হইবে না, যদি তুমি মর, অনেকের অনেক ক্ষতি হইবে। জানি তা, কিন্তু আমার এত অপমান কি জন্য? আমি ভালবাসি,—বাসিতাম,—এখনও বাসি,—তুমি ভালবাস না,—জানিতাম না,—এখনও জানি না; কিন্তু প্রাণেশ্বর—(ছি!ছি!) এখনও তোমাকে প্রাণেশ্বর বলিতে ইচ্ছা হয় কেন? সেই সব পূর্ব্বকথা মনে পড়ে; কিন্তু হা নিষ্ঠুর! তুমি আমাকে চিনিলে না, আমি আর পৃথিবীতে থাকিব না!

স্বগতবাক্যে এই সকল চিন্তা করিতে করিতে বিষাদিনী উঠিয়া গৃহের যত বস্ত্র, যত কাগজপত্র, ব্যস্তহস্তে একত্র রাশীকৃত করিলেন। লইয়া বুঝি কোথাও পলাইবেন? তা কেন? দ্বার গবাক্ষ, সকলই অবরুদ্ধ। আগুন ধরাইয়া দিলেন, ধূমে ধূমাকার। সে ধূমে নিশ্বাস নিক্ষেপ করা মানুষের অসাধ্য। অভাগিনী শয়ন করিয়া আছেন, নিশ্বাস পড়িতেছে, কিন্তু বহুকষ্টে।—তখন হৃদয়ে চিন্তা; হৃদয়েশ্বর!—জীবিতেশ্বর!—প্রাণেশ্বর!—আমি চলিলাম, জানিয়া চলিলাম, তুমি পরের, সুখী হও, অভাগিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া নবীন প্রণয়রাজ্যে তুমি রাজা হও, শুনিয়া আমি মরি। এখন—এখনও—মৃত্যুকালে এখনও ডাকিতেছি—প্রাণেশ্বর। তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি জানি না। তুমি পরের হইয়াছ, তাহাও আমি চক্ষে দেখিয়া আসিলাম। যাহার হইয়াছ, তাহার পদাঘাত সহ্য করিলাম! কিন্তু যাই—প্রাণেশ্বর!—কোথায় তুমি? দেখ এসে,—জন্মের শোধ যাই! কিন্তু তোমারে আমি ভুলিব না।

ধূম গৃহে ব্যাপ্ত হইল। রন্ধ্রে, ছিদ্রে, ধূম নির্গমের পথ বিরল, তখনও জ্ঞান আছে, বিষাদিনী ভাবিতেছেন, কি করিলাম! বিষ খাইলাম না কেন!

আগুনে ঝাঁপ দিলাম না কেন! জলে ডুবিয়া মরিলাম না কেন! বাঙ্গালা দেশে যেমন করে, তেমনি করিয়া গলায় দড়ী দিলাম না কেন! এ কি যন্ত্রণা! ধূমানল!—তুষানল। প্রাণেশ্বর!—এখনও প্রাণ আছে, এখনও একবার এসে দেখে যাও, আমি তোমারে কতদূর ভালবাসি।

বিরহিণী নায়িকা বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় আপনা আপনি মৃদুভাবে কহিলেন, যাহারে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম, সে পরের হইল, স্বচক্ষে দেখিলাম, আমার সেই প্রাণসর্ব্বস্বধন পরের হইল। তবে আর পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার সাধ কি!

কে কাহাকে কি বিতরণ করে? যে সকল বস্তুর দাম আছে, তাহারই দান বিতরণ হয়। তুমি বড়মানুষ, শালক্রমাল বিতরণ করিতে পার, ঘোড়া-হাতী বিতরণ করিতে পার, শাড়ীশাড়ী বিতরণ করিতে পার, গাভীবৎস বিতরণ করিতে পার, ঘড়াগাড়ু থালগ্লাস বিতরণ করিতে পার, তেল সন্দেশ-মাষকড়াই বিতরণ করিতে পার; এমন কি, ভূমিসম্পত্তি পর্য্যন্ত দান করিতে পার। যাহার দাম আছে, তাহারই দানবিতরণ হয়, যে সামগ্রী বেদামী, যাহার মূল্য নাই, তাহা কেহ দান করিতে পারে না, বিতরণ করিতেও পারে না। আমি দুঃখিনী অভাগিনী, আমার একটী সামগ্রী ছিল, তাহার মূল্য ছিল না, হৃদয়কন্দরে সেই সামগ্রী লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, কে তাহা হরণ করিল! হায় হায়! হৃদয়নিধি আমার হৃদয় শূন্য করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। হৃদয়পিঞ্জরের পাখী আমার হৃদয়পিঞ্জর শূন্য রাখিয়া কোথায় উড়িয়া গেল। আমার হৃদয়-সখা কাহার হইল? আর ত কথা কহিতে পারি না!—হা জীবিতেশ্বর!

গৃহ ঘোর ধূমে পরিপূর্ণ। বিলাপিনীর কণ্ঠরোধ। গাছে দাঁড়ে পিঞ্জরে পোষা পাখী ছিল, ধূমপ্রবাহে রুদ্ধশ্বাস হইয়া সেগুলি মরিয়া গেল।

হঠাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে দ্বার ভগ্ন করিয়া এক জন লোক একটা মশাল-হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই সমস্ত দ্বার গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিল, যে সকল জ্বলনশীল পদার্থ হইতে ধূম বিনির্গত হইতেছিল, ত্রস্ত হস্তে সেই সকল পদার্থ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দূরে ইতস্ততঃ বিনিক্ষেপ করিল।

কামিনী চৈতন্যশূন্য। বদনে, নয়নে, মস্তকে অনবরত বারি সিঞ্চন করিয়া নূতন প্রবেশকারী ক্রমে ক্রমে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। মূর্চ্ছিতা রমণী ক্রমে ক্রমে সম্বিৎ প্রাপ্ত হইয়া অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক অৰ্দ্ধবিকম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "আমি কোথায়? যে শান্তিনিকেতনে জীবলোকের কোন চিন্তা থাকে না, কোন আশা থাকে না, কোন নিরাশ দুর্ভাবনার সঞ্চার মাত্র থাকে না, আমি সেই চিরশান্তি-প্রদায়িনী নিশ্চিন্ত শান্তিপুরীতে প্রবেশ করিতেছিলাম। আহা! কি রমণীয় মনোহর পথ! ধারে ধারে কত মনোহর গাছ! গাছে গাছে কত মনোহর পাখী! পাখীতে পাখীতে কি মনোহর মধুর স্বর! আহা কি সুধাময়, শান্তিময়, বিজন, বিশ্বমনোহর পন্থা। সে পন্থা হইতে কে আমারে ফিরাইয়া আনিল! সে আমার মিত্র না শত্রু? যদি মিত্র হয়, ইহ জন্মে আর আমি তাহাকে মিত্র বলিব না,—সে আমার শান্তিবিনাশী মহা অরি, মহা বৈরী।

কামিনী উঠিয়া বসিলেন। এলো চুল বাতাসে দুলিতে লাগিল। ঘোর আরক্ত চক্ষু চতুর্দ্দিকে যেন সুদর্শনচক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। লোকটা সাঁ করিয়া পশ্চাতে দশ হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। বিষাদিনী নিকটে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আপন মনে অনেকক্ষণ প্রলাপকথা কহিয়া আপনা আপনি নিস্তব্ধ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। যে সকল পক্ষী রাত্রি কালে গীত গায়, দূর বৃক্ষশাখে তাহারা আপনাদের সুরে নিশা-সঙ্গীতের আলাপ করিতেছে। ইচ্ছাদাস মানুষ সেই সকল সুরের প্রতিধ্বনি করিয়া কত প্রকার ভাবার্থ কল্পনা করিতেছে। বিষাদিনী উদাসভাবে একবার হাসিয়া উঠিলেন। হাসির সঙ্গে অকস্মাৎ স্বর ফুটিল। প্রথমে কহিলেন, যাহা শুনিয়াছিলাম, যাহা শুনিতেছিলাম, যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা দেখিতেছিলাম, যে দুঃখে মরিতে আসিয়াছিলাম, তাহা কি স্বপ্ন না সত্য? যদি সত্য হয়, প্রাণে আর প্রয়োজন কি? দ্বিতীয় বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আত্মগত বাক্যে কহিতে লাগিলেনঃ—

ধরাতলে ছিল, যারা তারা কেন আকাশে?
জলে ফোটে কমলিনী, কাঁপে কেন বাতাসে?

যে ভুলেছে পর প্রেমে, সে কেন রে আমারে,
কাঁপাইছে মহাকম্পে? চিনি না ত তাহারে॥
ধারি না কাহারো ধার, তবে কেন সঘনে,—
শাসাইছে, ভাসাইছে, গ্রাসিবারে জীবনে॥
কোথায় ভাসিয়া যাব? যে পথেতে এসেছি।
হায় হায়! কুলাঙ্গনা, অকূলেতে ভেসেছি॥
সে কূলে ত কূল নাই, তবে কোথা যাইব?
কোথা গেলে প্রাণধনে, অন্বেষিয়া পাইব?
যাব না কোথাও আর, এই খানে মরিব।
ধরিবার হয় যদি, ঘরে বসে ধরিব॥

অন্যমনস্কভাবে এই কয়েকটী বাক্য উচ্চারণ করিয়া মনে মনে কত কি চিন্তা করিয়া, কি ছিল, কি গেল, চক্ষের কাছে কি যেন আসিল, আবার কি যেন লুকাইয়া গেল, ভাবিয়া ভাবিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বিরহিণী আবার কহিলেন—

বাঁচিবার সাধ নাই, বাঁচিব না আর।
কি সাধে বাঁচিব ভবে? ভব অন্ধকার॥
এক মণি হৃদাকাশে আছিল উজ্জ্বল।
অকস্মাৎ নিবে গেল জ্বলন্ত অনল॥
এই কি কপালে ছিল! নাহি জানিতাম।
তা হলে কি সে নিঠুরে ভালবাসিতাম॥
হায় রে দারুণ বিধি! এ কি বিড়ম্বনা।
বাঁচিব কাহার তরে? আর বাঁচিব না॥
স্বপনে দেখেছি যাহা নিকুঞ্জ কাননে।
ভুলি নাই ভুলি নাই, সর্ব্ব আছে মনে॥

প্রত্যক্ষ করেছি যাহা রম্য উপবনে ।
জ্বলন্ত চিতার সম জাগিতেছে মনে ॥
তখন ত নিদ্রা নয়, পূর্ণ সচেতন ।
দিশি দিশি হেরিলাম রম্য উপবন ॥
হেরিলাম অট্টালিকা বিহারের স্থান ।
হেরিলাম তারে, যারে ভালবাসে প্রাণ ॥
আর কারে হেরিলাম ? কহিবারে নারি ।
দংশিছে সহস্র বিছা ! আমি কুলনারী ॥
বেশ্যা বুঝি সে নায়িকা ? নহিলে কি হয়—
তত লজ্জাহীনা বালা ? বেশ্যাই নিশ্চয় ॥
হয় হোক্, সেই থাক্, আমার কি ক্ষতি ।
কায়মনোবাক্যে আমি সতীকন্যা সতী ॥
কিন্তু এক দুঃখ মনে, ভালবাসি যারে ।
বিনা দোষে সেই প্রিয় ত্যজিল আমারে ॥
সে দিন যে ধন ছিল হৃদয়ের ধন ।
আজি আমি কাঁদি, তারে বলি হারাধন ॥
কারে সঁপিলাম সেই হৃদয়ের নিধি ।
ধিক্ শতধিক তোরে নিদারুণ বিধি ॥
আমি কি সঁপেছি তায় ? মম ভাগ্যদোষে ।
রোষে তোষে হারানিধি আছে পরিতোষে ॥
যা হবার হয়ে গেছে তবে কেন মন ।
থেকে থেকে কেঁদে ওঠে হয় উচাটন ॥
মন না কি জড় বস্তু ? শাস্ত্রেতে বলায় ।
আমার মানস তাহা মানিতে না চায় ॥

জড় যদি হবে মন তবে কেন মোরে—
জ্বালায় এমন কোরে অন্তরে অন্তরে ?
নয়নদর্পণে আমি নিহারি যাহায় ।
চরণে ঠেলিয়া সেই পলাইয়া যায় ॥
তার কি দর্পণ নাই ? নাহি কি নয়ন ?
দাসী বলে আমারে কি করে না দর্শন ?
দর্পণে কি ছায়া নাই ? এ বড় কৌতুক ।
তার ভাগ্যে সুখ লেখা, মম ভাগ্যে দুখ ॥
শাস্ত্রে বলে সুখ দুঃখ ভোগ করে মন ।
তাহার যেমন মন, আমারো তেমন ॥
আগে জানিতাম তাই, কপালে আমার,
[illegible] হইবে নিত্য বিরহ বিকার ॥
মনের দুঃখে [illegible] কাঁদিব না বোলে ।
[illegible] গেছে চোলে ॥
আমার মন গতি [illegible] অস্থির ।
তবে কেন প্রিয়তারে ভালবাসে ধীর ॥
ধীর সেই প্রিয়ধন, অধীরা ললনা ।
জানে না কখন মনে চাতুরী ছলনা ;—
জানে না যে, তারে কেন এত প্রবঞ্চনা ?
ভালবাসা কথা মাত্র, কেবল বঞ্চনা !!

আবার ক্ষণেকের জন্য সেই সুন্দরী একটু অন্যমনস্ক হইলেন । মরিবার জন্য গৃহ ধূমপূর্ণ করিয়া নিশ্বাসবোধক উপদেবতাকে যে রমণী আহ্বান করিতেছিলেন, এখন তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে ।

যদি জ্ঞান হইয়াছে, তবে কথা কহিতে কহিতে থামিয়া গেলেন কেন? হৃদয়ের জ্বালা, হৃদয়ের যন্ত্রণা, হৃদয়ের বেদনা।

চৈতন্য হইল। চৈতন্যবতী বিরহিণী দাবদগ্ধা কুরঙ্গিণীর ন্যায় বিত্রাসিতভাবে ইতস্তত চঞ্চল দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

তুমি হে স্মরেরি সখা, বিদিত ভুবন।
ত্বরায় করিয়া দেহ চিতারি সাজন॥
হারাইয়ে প্রাণপতি, বাঁচিয়ে রহিল রতি,
এ কথা আমার প্রাণে সবে না কখন॥

ঠিক্ কথা। বিরহিণী যে স্বরে বিলাপ করিলেন, অকপট প্রণয়ে তাহাই স্বভাবসঙ্গত। কিন্তু কে তুমি নিষ্ঠুর লম্পট! সরলা অবলার হৃদয় দগ্ধ কর? এ কথার উত্তর কে দেয়? ঘরে একজন মানুষ আছে। কেন আছে? কি অভিপ্রায়ে আছে? বিরহিণী তাহা জানেন না। বসনাঞ্চলে চক্ষুজল মার্জ্জন করিতেছিলেন, আবার কাঁদিয়া উঠিলেন।

"দূর হ পাপিষ্ঠ, দুষ্ট, চিনিয়াছি তোরে!
গোপনে করিয়া চুরি [illegible] মন;
পলাইয়া যাও দূরে [illegible];—
অপরে অপর চিত্ত কর [illegible]।
ধন্যবাদ করি তোরে! মাগি পরিহার!
কারে বলে ভালবাসা, কিছু নাহি জান,
তবে কেন এসেছিলে ভালবাসিবারে?
ধিক ভালবাসা তোর পাপিষ্ঠ দুর্জন!
নারীঘাতী নীচাশয়, বিশ্বাসঘাতক!
ভুলে গেছ বুঝি দেখে বকুলের মালা

তুই না বলিয়াছিলি তিন মাস আগে,
তিন দিন গন্ধ থাকে বকুলের ফুলে ?
কে পাড়ে বকুল ফুল বৃক্ষ আরোহিয়া ?
ঝরে পড়ে ফুলদল বাতাসে প্রভাতে।
কুড়াইয়ে লয় যত গৃহস্থের বালা।
মালা গাঁথে, গলে দেয়, হাসি হাসি মুখে।
তুই কি জানিস তার মহিমা পামর!
দূর হ লম্পট দস্যু! নাহি চাহি তোরে!
তোর চেয়ে ভালবাসি মধুমক্ষিকারে।
যদিও সে ফুলে ফুলে করে মধু পান,
তবুও সে মনে জানে পবিত্র প্রণয়।
ভালবাসি আমি সেই ভ্রমরনিকরে,
পদ্মফুলে যারা সদা করে মধু পান।
কৃষ্ণবর্ণ কলেবর, ঝঙ্কারিত রব,
যে রবে সবার হয় কর্ণ ঝালাপালা,
সে রব যাহার মুখে, তারে ভালবাসি।
কেন জান ? জানে তারা বিশুদ্ধ প্রণয়।
প্রণয়বিদ্বেষী পাপী কাপুরুষ তুমি!
মনে কি তা পড়ে তোর ? প্রথম যামিনী,
নাহি জানি নাম, ধাম, কোন পরিচয়,
বিবাহ করিব বলে কর অঙ্গীকার,
আমিও সে অঙ্গীকারে দিয়াছিনু সায়,
মতিভ্রম হয়েছিল! মমগ্রহ দোষে!

সে দিন কি দিন ছিল, কহ প্রাণেশ্বর!
(ধিক্ মোরে, আজো তোরে প্রাণেশ্বর বলি!)
অবলা সরলা বালা, তোরে অকপটে—
বাসিতাম ভাল; কিন্তু ফুরাইল সব।
এত যে নিষ্ঠুর তুই, যদি জানিতাম,
তবে কি রে ভালবাসি? পাপিষ্ঠ পামর!
যা চলি, যেখানে তোর ভালবাসা আছে;—
বিদাইয়া জন্মশোধ মানসমন্দিরে,
অভাগীরে ভাসাইয়ে অকূল সাগরে!
ভাসিবে অভাগী দাসী ভাসিবে সাহসে,—
চির অভাগার বন্ধু দুখসিন্ধুনীরে!"

যে লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধূম নির্ব্বাণ করিয়াছিল, সেই লোক অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে রমণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিস্ফারিত নয়নে সেই মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিষাদিনী কামিনী যেন পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় ক্ষণকাল এক কালে নিশ্চলা। চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল, তারকা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, পলক পড়ে না। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাহার জন্য জীবন পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন,—কেবল কৃতসঙ্কল্প নয়, প্রাণবায়ু বিনির্গমের অধিক বিলম্ব ছিল না, যাহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছিলেন, সেই মূর্ত্তি সম্মুখে। তাহাকে দেখিয়া নিশ্চলা হইলেন কেন? মুখে একটীও বাক্য নাই কেন? এমন হইয়াই থাকে। যাঁহারা এ ভোগ ভুগিয়াছেন, তাঁহারা কখনই বলিতে পারিবেন না, এ ভাব অস্বাভাবিক। নিশ্চলা বটে, কিন্তু মূর্ত্তি অতি তেজস্বিনী।

ক্ষণকাল পরেই মৌন ভঙ্গ। সেইরূপ সতেজ সমুজ্জ্বল নয়নে নয়নসমীপবর্ত্তী নায়কের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া সতেজ গম্ভীর স্বরে বিরহিণী কহিলেন, "আবার এখানে? নিষ্ঠুর! কে তোমাকে এখানে আহ্বান

করিযাছে? সুখে মরিতেছিলাম, মরিতে দিলে না! সুখশান্তি নাশক! কেন আসিয়া বাধা দিলে? মনে ভাবিতেছ, আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ; হয় ত সেই জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হইব; কিন্তু না তা! জীবনে আমার বাসনা নাই। জীবন রক্ষা করিয়া তুমি বরং আমার বৈরীর কার্য্য করিলে, বৈরীর নিকটে কৃতজ্ঞ? না,—কখনই না। সম্মুখ হইতে দূর হও!" আপন বক্ষে করাঘাত করিয়া তেজস্বিনী একটু থামিয়া আবার কহিলেন, "যাহার জন্য তত দূর আকিঞ্চন,—হা অদৃষ্ট! সেই কৃতঘ্ন পামর আমারে মরিতে দিল না! প্রবঞ্চনা কবিয়া হৃদয়ের সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়া চক্ষে চক্ষে পলায়ন! সূর্য্য সাক্ষী করিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে দুঃসাহসিক ডাকাইতি! নারীঘাতী ডাকাত; সম্মুখ হইতে দূর হও!"

কম্পিত কলেবরে বিকম্পিত স্বরে প্রবেশকারী কহিল, "আমি ত কিছু বলি নাই।"

"দূর হও।"

"আমি ত কিছু করি নাই!"

"এখনও বলিতেছি, দূর হও!"

"আমার অপরাধ কি?"

"অপরাধ? পাপিষ্ঠ! দস্যু! নারীহন্তা! বিশ্বাসঘাতক! অপরাধ? আকাশের নক্ষত্র গণনা করা যায়, বৃষ্টির বারিধারা গণনা করা যায়, সমুদ্রের বালী গণনা করা যায়, কিন্তু রে কৃতঘ্ন নীচাত্মা! পামর! তোর অপরাধ গণনা করা যায় না। তুই যে আমারে বঞ্চনা করিয়া অপরকে ভালবাসা অর্পণ কবিয়াছিস, সেটা আমি অপরাধ বলিয়া ধরি না, তুই যে তাহার সাক্ষাতে আমারই চক্ষের উপর আমার শত শত নিন্দা করিয়া আমারে চাহিস না বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিস্, সেটাও আমি অপরাধ বলিয়া ধরি না;—কেন জানিস্? প্রণয়ে তোর অধিকার নাই। ভালবাসা কাহাকে বলে, তুই তার বিন্দুমাত্রও জানিস্ না। প্রণয় পরিত্যাগে তোর মত গর্দ্দভের,—তোর মত দাঁড়কাকের বিন্দুমাত্র অপরাধ হইতে পারে না, তবে——তবে তুই যে আমার শান্তিধামে মহাপ্রস্থানের প্রতিরোধক, তুই যে আমার সুখময় মরণসময় বাধা দিলি, এই তোর

অনির্ব্বচনীয় অগণনীয় অপরাধ। এখনও সময় আছে, আমার সঙ্কল্প অটল, অচল ;—অটল পর্ব্বতের মত অটল। তুই দূর হ!”

“আমায় ক্ষমা কর।”

“ক্ষমা নাই। ত্রিভুবনে তোর ক্ষমা নাই। তোর পাতকের,—মহা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত নাই।”

প্রবেশকারী থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। করজোড়ে জড়িত স্বরে কহিতে লাগিল, “প্রাণময়ি! প্রণয়িনি! প্রাণেশ্বরি! আমি তোমাকে—”

যেন বিদ্যুতের মত চমকিতা হইয়া তেজগর্ব্বিতা তেজস্বিনী আরক্ত চক্ষে কহিলেন, “পামর! এত অহঙ্কার তোর? প্রণয়িনী?—কে তোর প্রণয়িনী? তোর পাষাণ হৃদয়ে প্রণয়ের কি তিল মাত্র স্থান আছে? নরাধম! তুই ময়ূরপুচ্ছাবৃত দাঁড়কাক। আমি তোরে চিনেছি। প্রথম দর্শনে তুই আমারে শিখীরূপে প্রতারণা করেছিলি, মনে আছে। আপনাকে তুই রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলি। ভুলি নাই, মনে আছে। আমি ভাবিয়াছিলাম, সত্য সত্যই ময়ূর, সত্য সত্যই রাজকুমার। আমি রমণী, আমি অবলা, অত শত বুঝি না, ঘোরফেরের ধার ধারি না। চাতুরী ছলনা জানি না, হৃদয়ে আমার কপটতা নাই। হৃদয় আমার জগৎ-সংসারকে বিশ্বাস করিতে চায়, কিন্তু তুই পাষণ্ড, পিশাচ, নরাধম! অবলার সঙ্গে প্রতারণা? আমি তোরে চিনেছি। তোর সুহৃদেরা এখন তীক্ষ্ণ চঞ্চু প্রহারে সেই ধার করা পুচ্ছগুলি ছিঁড়িয়া লইয়াছে, এখন তুই যে কাক, সেই কাক। সম্মুখ হইতে দূর হ!”

“মিনতি করি, চরণে ধরি, দয়া করিয়া ক্ষমা কর। আমার কোন অপরাধ নাই। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম।”

“পরীক্ষা?”—যেন বজ্রনিনাদে তেজস্বিনী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, কহিলেন, “পরীক্ষা? তোর আবার পরীক্ষা কিসের? আমি পাষাণী।—হাঁ, আমি পাষাণী। আমার এই পাষাণ হৃদয়ে মায়াদয়া আছে।”

একটু আশ্বাস পাইয়া, মুখ ফিরাইয়া একটু হাস্য করিয়া, বহুতিরস্কৃত নায়ক সাহসের স্বরে কহিল, “হাঁ, সত্যই তুমি পাষাণী। কিন্তু পাষাণে